আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল
ও
গণ-বিক্ষোভ

লাডলী মোহন রায়চৌধুরী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

AZAD HIND FAUJER
COURT MARSHAL O GANA BIKHOV

প্রথম প্রকাশ :
কলিকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জনের আশায় ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে লিপ্ত হয়েছিল। এই অভিযান প্রথম দিকে অনেকটা সফল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। যুদ্ধে জাপান সহ ফ্যাসি শক্তির পরাজয় ঘটে এবং সেই সঙ্গে পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারাও ইংরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর জয়োদ্ধত ইংরাজ সরকার যুদ্ধবন্দী আই. এন. এ সৈনিকদের সামরিক আদালতে বিচার করে দেশপ্রেমের তথাকথিত অপরাধের দায়ে তাদের শাস্তি বিধান করতে উদ্যত হয়। কিন্তু বিচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে এবং বিশেষ করে সামরিক আদালতের রায় ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে যে তুমুল গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল তার ফলে পরাক্রান্ত ইংরাজ সরকারকেও শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে হয়েছিল। শুধু যে আজাদ হিন্দ সেনাদের মুক্তি দাবি করেই আন্দোলন হয়েছিল তা নয়। একই সময়ে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহও ইংরাজ সরকারকে রীতিমত বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। এই সব বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলন এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারত শেষকালে স্বাধীনতা লাভ করে।

সুভাষচন্দ্রের প্রাক জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে এই ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার এবং বন্দী সেনাদের মুক্তির দাবিতে যে বিপুল গণ-আন্দোলন হয়েছিল সেই বিষয়ে বাংলায় লেখা নির্ভরযোগ্য বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সরকারের গোপন নথি সমূহ দেখার ব্যাপারে নানারকম বাধা-নিষেধের দরুন বই লেখার জন্য প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদানগুলিও সহজলভ্য হয়নি। তবুও আমি যতটা পেয়েছি বিলাতের ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহশালার নথি এবং অন্যান্য আকর গ্রন্থ সমূহের উপাদান, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সরকারী ফাইলে সন্নিবেশিত তথ্যাদি ব্যবহার করে বইটিকে ঐতিহাসিক বিচারে নির্ভরযোগ্য করে লেখার চেষ্টা করেছি।

লেখালেখির কাজে আমাকে যাঁরা সর্বদা প্রেরণা দিতেন— আমার স্বর্গত মা ও বাবাকে আজকে বই ছাপানোর অবকাশে প্রণতি জানাই। শ্রীমতী ছবি রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী নৈরঞ্জনা ভট্টাচার্য আমাকে লেখার কাজে অনেক ভাবে

সাহায্য করেছেন, তাদের দু'জনের কাছেই আমি ঋণী। জন্টির অবোধ দুরন্তপনাও আমার কাছে এক রকম প্রেরণারই শামিল। 'দেজ'-এর অনুজপ্রতিম শ্রীসুধাংশুশেখর দে-র কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। সে ছাড়া আমার বই এত যত্ন করে আর কেউ ছাপাতো না।

লাডলী মোহন রায়চৌধুরী

চঞ্চলেন্দু সরকার
অনুজপ্রতিমেষু—

এই লেখকের অন্য একটি বই

ইতিহাস নানাবিধ

সূচিপত্র

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার গড়ে ওঠার কাহিনী

১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর (সোমবার) ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন দিল্লীর লাল কেল্লার সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার শুরু হয়েছিল। এই ঘটনা পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় মানসে একটি প্রচন্ড অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। বিচার শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই বন্দীদের সমর্থনে গোটা ভারতব্যাপী অসংখ্য মিটিং মিছিল এবং জনসমাবেশের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফৌজি সেনাদের নিঃশর্ত মুক্তিদানের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার এই আবেদনে কর্ণপাত না করায় জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে দেশের অনেক জায়গাতেই আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি রীতিমত সঙ্গিন আকার ধারণ করে। ২১ নভেম্বর ১৯৪৫-এ আই-এন-এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার ধর্মতলা-ডালহাউসি এলাকায় ছাত্রদের এক বিশাল মিছিল পথ দিয়ে যাবার সময় পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায় এবং তার ফলে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলাইচন্দ্র মিত্র সহ পাঁচজন লোক নিহত হয় এবং আরো প্রায় পঞ্চাশ জন লোক গুরুতর ভাবে আঘাত পায়। ঐদিন অমৃতসরেও ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশ নির্বিচারে বেত ও লাঠি চালিয়ে বহু ছাত্রকে মারাত্মক ভাবে আঘাত করে। ১২ই নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের সমর্থনে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লখনৌতে মহিলা খালসা কলেজের সম্মুখে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর লাঠি চালায় এবং তার ফলে কয়েকজন অল্পবয়স্ক বালিকা গুরুতর ভাবে জখম হয়। বছরের একেবারে শেষ দিকে ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিনলেক লেখেন সামনের বসন্তকালে ভারতে সংগঠিত বিপ্লবের জন্য সরকারকে তৈরি থাকতে হবে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে এমন এক তীব্র গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে যা বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকেও ছাপিয়ে যাবে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের আর এক বীর সেনানী রশিদ আলির বিচারের রায় বের হওয়া মাত্র কলকাতায় আরো ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়। ঐ মাসের ১১ এবং ১২ তারিখে কলকাতা ও শহরতলীতে হিন্দু ও মুসলমান জনতা মিলিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে দেয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আয়োজিত বিপুল সমাবেশ থেকে আগত একটি মিছিল সুরাবর্দী ও গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্তের

নেতৃত্বে ডালহাউসি স্কোয়ারের ১৪৪ ধারা অঞ্চল পেরিয়ে এগিয়ে গেল। পুলিশ কমিশনার এক গোপন রিপোর্টে সরকারের প্রতি সতর্ক বার্তা দিয়ে লিখলেন "এ বিক্ষোভে সবচেয়ে বিপজ্জনক সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি —এদের লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব"।

এই স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব, বিদ্রোহ ও গণবিক্ষোভের মেজাজ দেখেই বোঝা গিয়েছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অগণিত ভারতবাসীর মনে একটি পরম গৌরব ও শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে ছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার যখন শিবিরত্যাগী, সুবিধাবাদী সাধারণ ভাড়াটে সৈনিকদের মত আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনাদেরও কোর্ট মার্শাল করতে উদ্যত হয়েছিল তখন দেশবাসী স্বভাবতই সরকারের সেই উদ্ধত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল। ব্রিটিশ সরকারের আজাদ হিন্দ ফৌজকে দেশদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। এই অভিযোগ খন্ডন করে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ন্যায়ের দাবী' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে (৬ই নভেম্বর ১৯৪৫) লেখা হয় :

> "নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট কবলমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অধিবাসী মিত্রপক্ষের সাহায্য লইয়াছে। মিত্রপক্ষ তাহাদিগকে 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং আজ যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে যদি ন্যায়নীতি এবং সমরাদর্শের কোন অমর্যাদা না হয় তবে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে সসম্মানে মুক্তি দিলেই বা তাহা হইবে কেন ? এই বাহিনীর লোকেরা কি ইউরোপে দেশপ্রেমিকগণের সমান অধিকার লাভের দাবী করিতে পারে না ? ইউরোপের অধিবাসী উপরোক্ত লোকেরা যেমন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরাও তেমনি আত্ম-কর্তৃত্ব লাভের জন্যই ভারত অভিযান করিয়াছিল কিংবা অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক। তাহা হইলে এক যাত্রায় পৃথক ফল হইবে কেন ?"

অর্থাৎ পরাধীন ভারতবাসী আজাদ হিন্দ ফৌজকে এ-দেশের মুক্তি সেনানী হিসাবে এক অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। আর তাই ফৌজের বিচার প্রহসন তাদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু কি-ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ এই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) একেবারের গোড়ার দিকের ইতিহাসের পূর্বানুসৃতি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব

এসিয়ার যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঘটনাক্রম সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। কিন্তু এই কাহিনী শুরু করার আগে আলোচনার মুখবন্ধ হিসাবে কয়েকটি জরুরী তথ্য সর্বাগ্রে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনা পর্বের ইতিহাস ও ঘটনাচক্র এতই জটিল যে এই বিষয়ে অনেকের মনেই অনেক রকম বিভ্রান্তিকর ধারণা লক্ষ্য করা যায়। এই রকম বিভ্রান্তিকর ধারণা. দূর করবার জন্যই কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য পরিবেশন করা দরকার।

প্রথমত, অনেকেই মনে করেন যে আই-এন-এ অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু এই ধারণা বড় জোর অংশত সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। আসলে সুভাষচন্দ্রের অনেক আগেই এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানী সৈন্যের আক্রমণে উত্তর মালয় অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করলে তখনই সর্বপ্রথম ইংরাজ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সৈনিকদের সমবায়ে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরের পতনের পর এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ আরও স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। অবশেষে ১৪নং পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নের সেনাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নেতৃত্বে প্রায় চল্লিশ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা হয়। অতঃপর আরও পঁচিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী এই বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

কিন্তু মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ফৌজ গঠিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই বাহিনী নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। অবশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের গতিবিধি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে জাপানীদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য উপায়ান্তর না দেখে মোহন সিং বছরের শেষ দিক নাগাদ গোটা আজাদ হিন্দ বাহিনীকেই ভেঙে দেন এবং এই ঘটনার প্রায় সমসময়ে তিনি নিজেও জাপানীদের হাতে বন্দী হন। ফলে এত দিনের পরিশ্রমের ফসল হিসাবে যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে গড়ে তোলা হয়েছিল মাত্র চার মাসের মধ্যেই তা একরকম অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ফৌজ ভেঙ্গে যাবার অব্যবহিত পরে দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়াতে বসবাসকারী কয়েকজন অনাবাসী ভারতীয় আবারও একে গড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মুখপাত্র হিসাবে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে ভারতবাসীদের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক সংগঠন স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেই টোকিওর এক সম্মেলনে (২৮ —

৩০ মার্চ ১৯৪২) সুভাষচন্দ্র বসুকে আজাদ হিন্দ ফৌজের হাল ধরবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণ যখন প্রেরিত হয়েছিল তখন সুভাষচন্দ্র নাৎসী সরকারের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য জার্মানীতে সাংগঠনিক কাজে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। ওদিকে ৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই জাপান অক্ষ শক্তির দোসর হিসাবে যে-ভাবে ঝড়ের গতিতে ব্রিটিশ অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার এলাকাগুলি একের পর এক দখল করে নিয়েছিল তার ফলে সুভাষচন্দ্র জার্মানীর পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়াতেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্র স্থাপন করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি গোপনে জার্মানী ত্যাগ করে টোকিও হয়ে সিঙ্গাপুরে এসে হাজির হন (২ জুলাই ১৯৪৩)। সিঙ্গাপুরে আসার পর তিনি রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণ অনুযায়ী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই সময়ে তাঁর নেতৃত্বে ইতিপূর্বে ভেঙ্গে দেওয়া আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাক্রমের নিরপেক্ষ বিচারে মোহন সিংকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের আদি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করতে হয়। কিন্তু মোহন সিং প্রতিষ্ঠিত বাহিনী অধিক কাল স্থায়ী হয়নি। বস্তুত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামে যে-আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী সর্বজন বিদিত সেই বাহিনী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল। সহজ কথায় মোহন সিং যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচিত হন তাহলে সুভাষচন্দ্রকেই সেই বাহিনীর প্রাণপুরুষ বলে গণ্য করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনা ও গঠন প্রক্রিয়ায় সাধারণত মোহন সিং, প্রীতম সিং, ফুজিয়ারা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম প্রধান্য পেয়ে থাকে। কিন্তু এই বাহিনী গড়ে তোলার কাজে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং তাঁর অনন্য কীর্তি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের কথা অনেকেরই অজানা। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয়দের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ প্রধানত রাসবিহারী বসুর প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। রাসবিহারী নিজেও একজন ধুরন্ধর বিপ্লবী হিসাবে অতি অল্প বয়স থেকেই স্বদেশে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম যৌবনে ইনি যুগান্তর দলের গোঁদালপাড়া গোষ্ঠীর বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লব আন্দোলনের কাজে জড়িয়ে পড়েন। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন ব্যানার্জী (স্বামী নিরালম্ব), বসন্ত বিশ্বাস, আমীরচাঁদ, যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), আবধবিহারী প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে বড় লাট হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রার উপর বোমা

ফেলার ঘটনার সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯১৪) সুবাদে এবং সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে ইংরাজের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু লাহোর, বেনারস, অমৃতসর প্রভৃতি যে-সব জায়গায় পুলিশ তাঁকে ধাওয়া করে সেই সব স্থান থেকে তিনি আগেভাগেই খবর পেয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। অবশেষে পুলিশের হাত এড়ানোর জন্য তিনি প্রমথনাথ ঠাকুরের পাশপোর্ট নিয়ে এবং পিতৃদত্ত নাম ভাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে জাপানে এসে হাজির হন (জুন/১৯১৫)। এখানে আসার পর তিনি জনৈকা জাপ মহিলার পাণিগ্রহণ করে বিবাহসূত্রে জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং এখানেই তিনি আমৃত্যু (২১ জানুয়ারী ১৯৪৫) বসবাস করেন।

কিন্তু জাপানে স্থায়িত্ব লাভ করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মুক্তি চিন্তা তাঁর মন থেকে কখনও অপসৃত হয়নি। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করবার জন্যে তিনি সেই দূর বিদেশেই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন (১৯২৪)।

লীগ গঠন করা ছাড়াও রাসবিহারী অপরাপর আরও কয়েকটি গঠনমূলক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করার পর তিনি জাপ সরকারকে আপন জন্মভূমির মুক্তি প্রচেষ্টার কর্মে সাহায্য দেওয়ার জন্য সবিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জাপ-ভারত সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তিনি সর্বপ্রথম জাপানে ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডসিপ এ্যাসোসিয়েসন নামে একটি সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। ইউরোপে যুদ্ধ বাধার পরিস্থিতি বিচার করে তিনি ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য জাপানের ভূখন্ডে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি জাপানেও ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের একটি শাখা স্থাপন করেছিলেন। এই লীগে যে-সকল স্বেচ্ছাসেবী সদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল জাপানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তাদের পরবর্তী দুই বছর সময়ের মধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপারে জরুরী পরামর্শ করার জন্য রাসবিহারী সম্ভবত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও পত্রালাপ করার চেষ্টা করেছিলেন (২৫ জানুয়ারী ১৯৩৮)। কিন্তু ইংরাজের গোয়েন্দা পুলিশের হাত এড়িয়ে সেই চিঠি সুভাষচন্দ্রের কাছে আদৌ পৌঁছাতে পারেনি।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় (ডিসেম্বার ১৯৪১) তখন রাসবিহারী জাপ সরকারকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করবার জন্য সে-দেশের বিখ্যাত ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির নেতা বিপ্লবী মিৎসুরু তোয়ামা মারফৎ জাপ সরকারকে অনুরোধ

জানান। রাসবিহারীর এই আবেদনে সাড়া দিয়ে জাপ সরকার রাসবিহারী সহ পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য টোকিওর সান্নো হোটেলে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন (২৮-৩০ মার্চ ১৯৪২)। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে জাপান ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে কিভাবে সাহায্য করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে জাপান অধিকৃত এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ইতিপূর্বে যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ গঠিত হয়েছিল সেটিকে আরও সংগঠিত আকারে গড়ে তুলতে হবে। এই সংগঠিত লীগের উদ্যোগে অতঃপর ব্যাঙ্ককে একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করে সেই সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাপ ভারত সহযোগিতার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ করা হবে।

টোকিও সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে জাপান ভারতবর্ষকে সাহায্য দান করবার ব্যাপারে অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের মধ্যস্থতার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এই কারণে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সূচনা পর্বে লীগ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্য কিছুকাল পরে অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যায়ে মোহন সিং-এর সঙ্গে জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি গোপন বোঝা-পড়া অনুযায়ী লীগের প্রাধান্য খর্ব করে মোহন সিংকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের নীতি নির্ধারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। এর ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজে কালক্রমে অবশ্যম্ভাবী ভাবে ভাঙনও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের এই রকম অবাঞ্ছিত পরিবর্তন হওয়ার আগে, অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন হওয়ার প্রথম পর্বে একে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ দায়িত্ব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগকেই দেওয়া হয়েছিল।

টোকিও সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যাঙ্ককে অনতিবিলম্বে একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল (১৫-২৩ জুন ১৯৪২)। এই সম্মেলনে বর্মা মালয়, থাইল্যান্ড, ইন্দো-চায়না, ফিলিপাইন, জাপান, চীন, বোর্ণিও, জাভা, সুমাত্রা, হংকং এবং আন্দামানে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্য থেকে ১০০জন বাছাই করা প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে মোহন সিং-ও যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে লীগের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ রাসবিহারীকেই লীগের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে মোহন সিং-এর প্রস্তাব মত প্রায় ৪০ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এবং ২৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সমবায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা হয়েছিল। অতঃপর এই ফৌজের ব্যয়ভার কি-ভাবে নির্বাহ করা হবে এবং

একে কি-ভাবেই বা নিয়ন্ত্রণ করা হবে ইত্যাদি নানা আনুষঙ্গিক বিষয় স্থির করবার জন্য সম্মেলন থেকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্যাপ্টেন মোহন সিংকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ফৌজের সদস্য সংগ্রহ, রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছিল। সিদ্ধান্তে এ-কথাও বলা হয়েছিল যে জাপ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিভিন্ন সমরোপকরণ দিয়ে যাতে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেন সে-বিষয়ে কেবলমাত্র লীগই জাপ-সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবেন। আরও স্থির হয় যে জাপ সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজকে লীগের পরামর্শ অনুযায়ী নানাভাবে সাহায্য করলেও এই বাহিনীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব একমাত্র ভারতীয়দের উপরেই বর্তাবে। অর্থাৎ সাহায্যদানের অছিলায় জাপান তথা অন্য কোন বিদেশী শক্তি যাতে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কুক্ষিগত করতে না পারে সেই ব্যাপারে প্রথম থেকেই যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে গৃহীত প্রথম সিদ্ধান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগকেই দেওয়া হয়েছিল। সম্মেলনে গৃহীত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে স্থির হয় যে এই দায়িত্ব পালন করবার জন্য লীগের ভিতরেই একটি স্থায়ী কর্ম পরিষদ (Council of Action) গঠন করা হবে। এই পরিষদে রাসবিহারী ও মোহন সিং সমেত মোট চার জন সদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল। রাসবিহারীকে কর্মপরিষদের সভাপতি হিসাবেও নির্বাচিত করা হয়েছিল। এখানে বলা দরকার যে আজাদ হিন্দ ফৌজের নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ নামক একটি অসামরিক সংগঠনের কর্মপরিষদের উপর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি বিশেষ রকম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম শুরু করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের মত একটি সামরিক বাহিনী গঠন করা হলেও এই বাহিনীর পরিচালন ভার অসামরিক কর্তৃপক্ষের উপরেই ন্যস্ত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল। অবশ্য এই রকম বন্দোবস্তের ফলে মোহন সিং-এর মত উচ্চশাসম্পন্ন ব্যক্তি আদৌ খুশি হতে পারেন নি। মোহন সিং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ বা তার অন্তর্গত কর্মপরিষদকে পাশ কাটিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব আপন হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন। এই রকম ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণ করবার জন্য তিনি জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি গোপন বোঝা পড়াও করে নিয়েছিলেন এবং এই বোঝাপড়ার প্রতিদান হিসাবে তিনি জাপ সরকারের চাহিদা মত আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ বা

কর্মপরিষদের সঙ্গে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা না করেই নানা স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। বস্তুত জাপানও কালক্রমে মোহন সিং-এর মতই ফৌজের উপর লীগের খবরদারী করার ক্ষমতা হ্রাস করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি কর্মপরিষদ বা লীগের তত্ত্বাবধানে থাকে তাহলে তাকে জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে যথোপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত করা যাবে না, কেননা লীগের মত একটি অসামরিক সংগঠন জঙ্গী জাপ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে তুষ্ট করবার জন্য কিছুতেই স্বীকৃত হবে না। অপর পক্ষে জাপান বুঝতে পেরেছিল যে মোহন সিং ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করবার জন্য জাপানের জঙ্গী কর্তৃপক্ষকে খুশি করে চলতে দ্বিধা করবেন না। এই জন্য মোহন সিং সহজেই জাপ সরকারের সঙ্গে হাত মিলাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে মোহন সিং-এর পক্ষেও জাপ কর্তৃপক্ষের সকল দাবী সব সময়েই পূরণ করা সম্ভব ছিল না, কেননা তাতে করে মোহন সিং নিজেই জাপ কর্তৃপক্ষের ক্রীড়নক হিসাবে পরিণত হতেন। অবস্থা এই রকম ঘোরালো আকার ধারণ করলে মোহন সিং এক সময় তাঁর ভুল বুঝতে পেরে জাপ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয় তিনি সেই সময় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের কর্ম পরিষদকেও সরাসরি ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই রকম জটিল পরিস্থিতির ফলে মোহন সিং, জাপ কর্তৃপক্ষ এবং লীগ ও কর্মপরিষদের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেন। ফৌজ ভেঙে যাওয়ার অল্প কিছু দিন পরে জাপ কর্তৃপক্ষ মোহন সিংকে কারাবদ্ধ করেছিলেন।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগকে সংগঠিত করার আদি পর্বে রাসবিহারীকে বহুলাংশে জাপানের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। রাসবিহারী যে-সময়ে জাপানের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন তখন জাপানের জঙ্গী মানসিকতা বিশ্ব সমক্ষে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়েছিল। জাপানের জঙ্গী বিদেশমন্ত্রী ইয়োসুকো মাৎসুওকো অবশ্য তাঁর জঙ্গী মনোভাব গোপন রাখবার জন্য জাপান ও দক্ষিণ-পুর্ব এসিয়ার পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক উন্নয়ন এলাকা (Co-prosperity sphere) গড়ে তুলবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে এই রকম তথাকথিত সহযোগিতা ভিত্তিক উন্নয়ন এলাকার কথা প্রচার করা হলেও এর আসল উদ্দেশ্য যে ব্রিটিশ অধিকৃত অরক্ষিত ভারতীয় এলাকা সুযোগ বুঝে জাপানের জন্য গ্রাস করে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয় সে-কথাও সকলেই বুঝে গিয়েছিলেন।[২] বস্তুত জার্মানীও কিন্তু অনেক আগে থেকেই জাপানকে সিঙ্গাপুর আক্রমণ করবার জন্য প্ররোচিত করে চলেছিল। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের সমর্থন ও সাহায্যদান

যে সাধুবুদ্ধি প্রণোদিত নয় এ-কথা কারও অবিদিত ছিল না। এই কারণেই পূর্ব ভারতে বসবাসকারী অনেক দেশপ্রেমিক ভারতীয় জাপানের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় সামিল হতে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু জাপানের এই রকম আগ্রাসী মনোভাবের ইংগিত পাওয়া সত্ত্বেও রাসবিহারী একরকম বাধ্য হয়েই জাপানের সঙ্গে হাত মিলাতে স্বীকৃত হয়েছিলেন কেননা এ-ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিল না। মনে রাখতে হবে জাপ-ভারত সম্পর্ক নির্ণয়ে রাসবিহারী যাঁর মতামতের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন তাঁর সেই আশ্রয়দাতা ও রাজনৈতিক গুরু মিৎসুরু তোয়ামা বয়সের চাপে জাপানের রাজনীতির জগত থেকে তাঁর পুরোনো প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশই হারানোর মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং রাসবিহারী তাঁর কাছ থেকে আপন প্রত্যাশা মত সাহায্য লাভ করতে পারেন নি। অথচ জন্মভূমিকে স্বাধীন করার তাগিদ রাসবিহারীর মনে এতটাই দুর্মর হয়ে উঠেছিল যে এ-ব্যাপারে সাবধানে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য অধিক সময় ব্যয় করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাসবিহারী সম্ভবত এ-কথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে পূর্ব এসিয়ার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির হাল ধরা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই কাজের পক্ষে তাঁর বিবেচনায় যিনি সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি সেই সুভাষচন্দ্রকে তিনি ১৯৩৮ সাল থেকেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে-রকম পরিস্থিতি তাতে ভারতবর্ষের পক্ষে দৃশ্যত একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে আর কালক্ষেপ করা চলে না। সুতরাং সব দিক ভেবে রাসবিহারী জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করার অবাঞ্ছিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিদেশের মাটিতেই প্রথম গঠন করা হয়েছিল এবং বিদেশ থেকেই এর অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। বস্তুত সুভাষচন্দ্র, রাসবিহারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের একাংশ জার্মানী, জাপান প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্রসমূহকে ভারতবর্ষের মুক্তি প্রচেষ্টায় সামিল করার জন্য বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষ ভাগ থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছিলেন। যে দুইটি বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে এই ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যেতে পারত বলে সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন তারা হল সোভিয়েট রাশিয়া ও জার্মানী। ১৯৩৯-৪০ নাগাদ অন্তত তিনজনের কাছে সুভাষচন্দ্র এই বিষয়ে গোপনে পরামর্শও করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস সংসদীয় দলের সদস্য কমিউনিস্ট পন্থী নীহারেন্দু দত্তমজুমদারকে স্বয়ং গোপনে রাশিয়াতে উপস্থিত হয়ে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্য অনুরোধও জানিয়েছিলেন। কিন্তু নীহারেন্দু দত্তমজুমদার সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবটিকে বিশেষ আমল দেননি।[৩] ১৯৪০ সালে

বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র শরৎ বসুর মাধ্যমে ফরওয়ার্ড ব্লকের মিঁয়া আকবর শাহকেও অনুরূপ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[৪] কিন্তু আকবর শাহ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হওয়া সত্ত্বেও এই কাজের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রেরই গ্রহণ করা উচিত হবে বলে পরামর্শ দেন। অতঃপর সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অপর এক সদস্য নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তীকে অনুরোধ করেন যে তিনি যেন প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্য যোগাযোগ করেন এবং সেখান থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়া গেলে তিনি যেন জার্মানীর দ্বারস্থ হন। কিন্তু নানা কারণে নরেন্দ্র নারায়ণকেও এই কাজে উপযুক্ত ভাবে লাগানো যায়নি।[৫] বস্তুত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সুভাষচন্দ্র প্রথমোক্ত রাষ্ট্রকেই পরাধীন দেশের বন্ধু হিসাবে লাভ করতে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। ভৌগোলিক দিক থেকে রাশিয়া ও ভারতবর্ষ কাছাকাছি হওয়ায় সমরনীতির বিচারে জার্মানীর চাইতে রাশিয়ার উপর অধিকতর নির্ভর করাই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা সত্ত্বেও রাশিয়া এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। আসলে যুদ্ধকালীন সঙ্গিন পরিস্থিতির মধ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়ে রাশিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ইংল্যান্ডের বিদ্বেষভাজন হতে চায়নি। এই কারণে কাবুল থেকে মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্র পশ্চিমাঞ্চলে পাড়ি দেওয়ার পথে যখন মস্কোতে কিছুদিন অতিবাহিত করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন তখন মস্কো অতি বিনীত ভাবে তাঁর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।[৬] শুধু তা-ই নয় সুভাষচন্দ্র যে ইটালীর পাশপোর্ট নিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও মস্কোরই একটি হোটেলে বাস করেছিলেন এই খবরটিও রাশিয়া ব্রিটিশের ভয়ে খুবই সযত্নে গোপন করে রেখেছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মুক্তি প্রচেষ্টায় রাশিয়ার কাছ থেকে যে কোনরকম সাহায্য পাওয়া যাবে না এ-কথা সুভাষচন্দ্র অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভালমত বুঝে গিয়েছিলেন। তাই হিটলারের জার্মানীর দিকেই তিনি শেষ পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছিলেন।

অবশ্য জার্মানী ছাড়া সুভাষচন্দ্র এসিয়াতে জাপানকেও তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচীর দোসর হিসাবে লাভ করার চেষ্টা করতে পারতেন। রাসবিহারী এবং তাঁর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ মারফৎ সুভাষচন্দ্র অবশ্য পরবর্তীকালে জাপানের সাহায্য গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু ৪০এর দশকের গোড়ার দিকে এবং বিশেষ করে তিনি যখন ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগ করেছিলেন তখন জাপানের সাহায্য নেওয়ার কথা তাঁর মনে বিশেষভাবে উদয় হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে জাপানের রাজনীতির হালচাল তখনও অবধি পরিষ্কার মত বোঝা যায়নি। অবশ্য ১৯৩৫ সালে জাপানের লেফট্যানেন্ট-কমোডোর তোতা

ইশিমারু-র লেখা Japan Must Fight Britan শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর জাপানে রাজনীতির গতি যে কোন্ খাতে প্রবাহিত হবে সে বিষয়ে সাধারণভাবে একটা ধারণা করে নেওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু জাপানের বিদেশ নীতি যে সঠিক কি হতে পারে সে বিষয়ে অক্ষ শক্তিবর্গ নিজেরাই সবিশেষ সন্দিহান ছিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে হিটলার জাপানকে পূর্বাঞ্চলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করার জন্য ক্রমাগত প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জাপান নানা অছিলায় এই বিষয়ে তার স্পষ্ট মতামত জানাতে দেরী করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত হিটলারও জাপানের গতিবিধি বোঝার আশা ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জাপানের উপর কূটনীতির স্তরে কোনরকম ভরসা করা সম্ভব ছিল না। আর জাপ রাজনীতির প্রবণতা মাত্র লক্ষ্য করে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঙ্গতও ছিল না। সুতরাং ব্রিটেনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কী হবে তা না জেনে সুভাষচন্দ্রও এই ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নিতে চাননি।

জাপান না হয় বাদ গেল। কিন্তু জার্মানীকেই কি নিশ্চিত ভাবে দোসর হিসাবে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন ? এই ব্যাপারে ইতিহাসের সাক্ষ্য খুবই স্পষ্ট। সত্য বটে যে নাৎসী দলের ডঃ লোথার ফ্র্যাঙ্ক সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে সুভাষচন্দ্রের মনে এই ধারণা সৃষ্ট হয়েছিল যে জার্মানী হয়ত ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টায় সাহায্য করলেও করতে পারে। কিন্তু এই ধারণা যে নিতান্তই ভ্রান্ত তা ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে নাৎসীদলের মুখপত্র Volkischer Beobachter -এ যে সংবাদ বেরিয়েছিল তাতেই সন্দেহাতীতভাবে ভাবে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই সংবাদে লেখা হয়েছিল যে "ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্মানীর আগ্রহ বোধ করার কোন কারণ নেই।"[৭] তাছাড়া নাৎসীদের জাতি বিদ্বেষ এবং আর্য মহিমার উদ্ভট মতাদর্শের কথাও ভুললে চলবে না। যুদ্ধ বাধা কিংবা নাৎসীদের ইহুদি বিনাশ যজ্ঞ শুরু হওয়ার আগে অবধি হয়ত জার্মানীর এই উন্মাদ মতাদর্শের কথা সবিশেষ প্রচারিত হয়নি। কিন্তু ইউরোপের জাতি সমূহের তুলনায় এসিয়ার জাতিগুলি যে নিকৃষ্ট এবং তাদের পক্ষে ইউরোপের দাসত্ব করাই যে শ্রেয় এবং স্বাভাবিক হিটলার এই মনোভাব কখনও গোপন রাখার চেষ্টা করেন নি। শোনা যায় যে হিটলার নাকি কোন এক প্রসঙ্গে এই রকম মন্তব্য করেছিলেন যে "সব কিছু সত্ত্বেও একজন জার্মান হিসাবে আমি মনে করি যে ভারতের পক্ষে অন্য কোন জাতি অপেক্ষা ব্রিটিশের প্রভুত্বই স্বীকার করা ভাল"[৮]।

জার্মানী যে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে কোনরকম সাহায্য করবে না সে-কথা সুভাষচন্দ্র নিজেও বার্লিনে পৌঁছানোর পর কয়েক দিনের মধ্যেই ভাল ভাবে বুঝে গিয়েছিলেন। আসলে হিটলারের সমর নীতিতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার কোন পরিকল্পনাই ছিল না এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ ছিল না। তবে ইংল্যান্ডকে যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে জার্মানীর সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে বাধ্য করানোর জন্য হিটলার একসময় আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সে পরিকল্পনাও নানা কারণে পরিত্যক্ত হওয়ার পর হিটলার শুধুই ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালিয়ে এবং নানারকম নাশকতামূলক কাজে ইন্ধন দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আর হিটলার কেবল এই সব কাজেই সুভাষচন্দ্রের সাহায্য চেয়েছিলেন। তাই বার্লিনে পৌঁছানোর পর সুভাষচন্দ্র যখন নাৎসী সরকারের কাছে পেশ করা তাঁর "Plan for co-operation between the Axis Powers and India." (অক্ষ শক্তি ও ভারতবর্ষের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাব, তাং ৯ই এপ্রিল ১৯৪১) শীর্ষক স্মারকপত্রে ইউরোপে একটি স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে সেই সরকারের তরফে অক্ষ শক্তির সঙ্গে চুক্তি স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন নাৎসী সরকার সেই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ার কারণ এই যে হিটলার ব্রিটিশকে ভয় দেখানোর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কাজে সুভাষচন্দ্রের সাহায্যপ্রত্যাশী হলেও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ভাঙন ধরানোর জন্য বা ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখার জন্য তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না।

সুভাষচন্দ্র যে নাৎসী জার্মানীর এই অভিসন্ধির কথা জানতে পারেন নি, তা নয়। তিনি এটা জেনেছিলেন বলেই জার্মানীর পঞ্চম বাহিনী হিসাবে শুধু নাশকতামূলক কাজেই জার্মানীকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। বস্তুত হিটলারের আরও অনেক কূট পরিকল্পনার খবর সুভাষচন্দ্র পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। যেমন হিটলারের 'অপারেশান বার্বারোসা' তথা রাশিয়া অভিযানের (২২ জুন ১৯৪১) কথাও তিনি জানতেন এবং এ-ক্ষেত্রেও জার্মানী যে একটা ভুল পদক্ষেপ নিতে চলেছে সে কথা পরাক্রান্ত নাৎসী সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। জার্মান বিদেশ দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারী ডঃ ভোরম্যানকে (Dr. Woermann) তিনি ৫ই জুলাই ১৯৪১ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন যে "পূর্বাঞ্চলের এই নোতুন পরিস্থিতির ফলে আমার দেশের জনমত স্পষ্টতই আপনার সরকারের বিরুদ্ধে যাবে"। এই

প্রসঙ্গে তিনি এ-কথাও জানিয়েছিলেন যে রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতবর্ষের অগণিত সাধারণ মানুষের চোখে জার্মানীই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে জার্মানী যদি কখনও ভারতের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে ভারতবাসী তাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করা তো দূরস্থান তারা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেবে।[৯]

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কোন পরামর্শই নাৎসী জার্মানীকে টলাতে পারেনি। আর তাই শেষ পর্যন্ত অবসন্ন চিত্তে তিনি বাদগাস্টাইনে বিশ্রাম নিতে চলে যান। অবশ্য সেখান থেকে জার্মান সরকার তাঁর কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার আশায় আবারও তাঁকে ডেকে পাঠান। সুভাষচন্দ্র তখন এই সহযোগিতার বিনিময়ে জার্মান সরকারের কাছ থেকে নয়টি প্রতিশ্রুতি আদায় করার জন্য চেষ্টা করেন। এইগুলির মধ্যে অন্তত পাঁচটি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে বলে জার্মান সরকারের তরফে অল্প কিছু দিন বাদেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল। আর তখন থেকেই জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের মূল কর্ম তৎপরতা শুরু হয়েছিল। ১৯৪১ সালে অক্টোবর মাসের পরে ঘটনার এই রকম পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল।

জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র কি-ভাবে কাজ শুরু করেছিলেন সেই কাহিনী বিবৃত করার আগে তিনি কিভাবে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে সে-দেশে এসে উপস্থিত হলেন সে বিষয়ে দু-একটি কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় দশ মাস পরে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে গ্রেপ্তার করে (২ জুলাই ১৯৪০) এবং পরে স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখেন (২৬ নভেম্বার ১৯৪০)। বন্দী অবস্থায় প্রায় দুই মাস অতিবাহিত করার পর তিনি ছদ্মবেশে ব্রিটিশ পুলিশের প্রহরা এড়িয়ে (১৭ জানুয়ারী ১৯৪১) মোটর যোগে বিহারের গোমো পর্যন্ত এসে সেখান থেকে ট্রেনে পেশোয়ার হয়ে ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে কাবুল থেকে একটি ইটালিয়ান পাশপোর্ট নিয়ে রাশিয়ার মধ্য দিয়ে আকাশপথে বার্লিনে এসে পৌঁছান (৩ এপ্রিল ১৯৪১)। বার্লিনে এসে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাঁকে কিছু দিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার রোমেও গিয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বিফল চিত্তে বাদগাস্টাইনেও কিছু দিন অতিবাহিত করেন। বছরের শেষ দিকে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে তিনি নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। শর্তগুলি ছিল এই যে ভারত ও জার্মানীর মধ্যে সব রকম লেন-দেনের ক্ষেত্রে ভারতকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার জন্য ইউরোপের মাটিতে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত এবং সুভাষচন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন একটি ভারতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীও গঠন করতে দিতে হবে। এ-ছাড়া ইউরোপে একটি আজাদ

হিন্দ কেন্দ্রও গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে জার্মান বেতার কেন্দ্রগুলিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য প্রচার করতে দিতে হবে।

জার্মান সরকার অল্প কিছু রদ-বদল করে উপরোক্ত শর্তগুলি মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন। সরকারের নিকট থেকে সম্মতি লাভ করার পর প্রথমেই প্রস্তাবিত আজাদ হিন্দ কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হল (২ নভেম্বার ১৯৪১)। এই কেন্দ্রটি গঠন করার সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। এই রকম দুইটি প্রস্তাবের একটিতে সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' নামে অভিহিত করার কথা বলা হয়েছিল। অপর প্রস্তাবে 'জনগণমন' শীর্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীতটিকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে ইউরোপে ভারতীয় পরিচালন ব্যবস্থায় এবং ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত একটি জাতীয় সেনা বাহিনী তথা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু নাৎসী সরকার সৈন্য বাহিনী গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হলেও তার একটি পরিবর্তিত নামকরণের জন্য জিদ করেছিলেন। ফলে যে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল তার নাম আজাদ হিন্দ ফৌজ না রেখে 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ান' করা হল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বিদেশে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজটি বড় সহজে সমাধা করা যায়নি। সুভাষচন্দ্র প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের জার্মানীতে ফিরিয়ে এনে তাদের মধ্যেই সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই কাজে গোড়ার দিকে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ প্রভুর সঙ্গে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করতে রাজি হয়নি এবং সুভাষচন্দ্র যখন তাদের শিবিরে উপস্থিত হয়ে এই ব্যাপারে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন তখন তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করে রাজভক্তির চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করে দলে টানতে সমর্থ হন।[১০] এই প্রচেষ্টার ফলে সুভাষচন্দ্র সংগঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর ৯৫০ নং রেজিমেন্টকে শেষ পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। আই-এন-এ'র বিচারের সময় এই ৯৫০নং রেজিমেন্টকেই কর্তৃপক্ষ হিটলার অনুপ্রাণিত পঞ্চম বাহিনী (Hitler inspired Fifth Columnist) বা সংক্ষেপে H.I.F. বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ইন্ডিয়ান লিজিয়নে সৈন্য সংগ্রহের জন্য সুভাষচন্দ্র যখন চেষ্টা করছিলেন তখন তিনি এ-কথা স্পষ্ট করেই ঘোষণা করেছিলেন যে এই বাহিনীকে কোনমতেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। এই বিষয়ে প্যারিসবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট প্রমোদ সেনগুপ্তের সঙ্গে যখন তাঁর খোলাখুলি কথাবার্তা হয়েছিল সেই সময় তিনি তাঁকে

উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। প্রমোদ সেনগুপ্তও সুভাষচন্দ্রের এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করে স্বয়ং কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন।[১১]

ইউরোপে ভারতের সামরিক বাহিনী গঠন করার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নাৎসী সরকারের যে বোঝাপড়া হয়েছিল তদনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় কর্তৃত্বাধীন একটি বাহিনী গঠন করার জন্য তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে নাৎসী সরকারের মতলব খুব ভাল ছিল না। নাৎসী সরকার মনে করেছিল যে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব মত এই বাহিনীর আজাদ হিন্দ ফৌজ নামকরণ হলে হয়ত একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমরবাহিনীর মর্যাদা দেওয়া হয়ে যাবে। এটা আদৌ নাৎসী সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। আর তাই সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব পালটে দিয়ে এটিকে 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ান' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় বাহিনী গঠন হয়ে যাবার পর এটিকে জার্মানীর রাষ্ট্রপ্রধান হিটলারের নামে আনুগত্যের শপথ নেওয়ানোর জন্য নাৎসী সরকার চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এই চাপ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় তিনি এমনভাবে শপথবাক্যের বয়ান রচনা করেছিলেন যাতে করে হিটলারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও ইন্ডিয়ান লিজিয়ান প্রকৃত প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে পারে। এই শপথ বাক্যের পাশাপাশি তিনি ইন্ডিয়ান লিজিয়ানের সৈনিকদের নিকট একটি পালটা শপথ করে অঙ্গীকার করলেন যে তিনি ভারতবর্ষকে পরাধীনতা মুক্ত করার জন্য এই বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবেন। অর্থাৎ হিটলারের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করেও এই বাহিনী যে ভারতকে পরাধীনতামুক্ত করবার জন্য কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্র নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হবে সে-কথা প্রকারান্তরে জার্মান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১২] এই রকম দ্ব্যর্থক শপথবাণীর যে আদৌ কোন গুরুত্ব থাকতে পারে এ-কথা নাৎসী সরকারের মোটেও মনে হয়নি। তাই এই প্রস্তাবে তারা আপত্তি জানায়নি। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে শপথবাক্যের বয়ানে যে শর্তাধীন আনুগত্যের কথা সুকৌশলে ব্যক্ত করা হয়েছে আসলে তা নিতান্তই অর্থহীন। কেননা শপথ বাক্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের উপরে অর্পণ করা হলেও তার ফলে হিটলারের প্রতি সংগ্রামী বাহিনীর আনুগত্য ছিন্ন করার কোন কথা ছিল না।

নাৎসী সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রকে ভারতের স্বাধীনতা ব্যাপারে প্রচারের জন্য জার্মান বেতার কেন্দ্রও ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার প্রায় একই সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস থেকে আজাদ হিন্দ রেডিওর সম্প্রচার শুরু

করা হল। প্রথম দিন সুভাষচন্দ্রের ভাষণ সম্প্রচারিত হয়েছিল। তখন আজাদ হিন্দ রেডিওর জন্য মাত্র ৪৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে এই রকম প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডার অপরিসীম মূল্য অনুধাবন করে নাৎসী সরকার অচিরেই ট্র্যান্সমিসনের সময় বাড়িয়ে তিনঘণ্টা করেছিল। এই কেন্দ্র থেকে ইংরাজী, ফার্সী এবং পুস্তু ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বেতার প্রোগ্রাম প্রচার করা হত। আজাদ হিন্দ রেডিও ছাড়াও আজাদ মুসলিম রেডিও ও ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও নামে আরও দুটি আলাদা বেতার প্রচার কেন্দ্র অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল। হল্যাণ্ডের হুজেন নামক স্থানের শক্তিশালী ট্র্যান্সমিসান কেন্দ্র থেকে এই সব বেতার প্রোগ্রামগুলি এমন ভাবে প্রচার করা হোত যে ভারতবর্ষ থেকে এই প্রোগ্রামগুলি শুনলে মনে হোত যে ভারতবর্ষ বা তার নিকটবর্তী কোন সীমান্ত এলাকা থেকে এগুলি প্রচার করা হচ্ছে। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের সামরিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে শত্রু পক্ষের মনে সহজেই ত্রাস ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল।

৪১সালের শেষ দিকে ঘটনাপ্রবাহ যে-রকম দ্রুত গতিতে আবর্তিত হচ্ছিল তাতে প্রাথমিক ভাবে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কিছুটা আশার সঞ্চার হলেও অল্প কিছুদিন বাদেই বোঝা গিয়েছিল যে জার্মানী তথা ইউরোপে বসে তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারবেন না। আসলে যে-জার্মানী তথা অক্ষশক্তির উপর ভরসা করে সুভাষচন্দ্র লড়াইতে নেমেছিলেন তাদের নিজেদের মধ্যেই সমরনীতির কূটকৌশল নির্মাণে নানারকম মত বিরোধ ছিল। জাপান চেয়েছিল যে জার্মানী ইংরাজদের বিরুদ্ধে আশু আক্রমণ শুরু করবে যাতে জাপান পূর্বাঞ্চলে অবাধে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করার আগে এই ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করেছিল। এমতাবস্থায় জার্মানী ও জাপান এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সুভাষচন্দ্র সঠিক কোন্ পক্ষের কাছ থেকে আশু সাহায্য পাবেন সে বিষয়ে রীতিমত অনিশ্চয়তা রয়েই গিয়েছিল। জার্মানী থেকে অনেক রকম মূল্যবান সাহায্য পাওয়া গেলেও হিটলার কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন সময়েই মন খোলসা করে তাঁর নীতি ব্যক্ত করছিলেন না। সুভাষচন্দ্র তাঁকে বারংবার জার্মানীর পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হিটলার এ বিষয়ে কোন রকম উচ্চবাচ্য করেন নি। পরে অবশ্য তিনি এই ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করে বলেছিলেন যে র্জামানী যে-সময় ভারত সীমানা থেকে বহু দূরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং যেখান থেকে ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছাতে জার্মানীর অন্তত আরও দু-এক বছর সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল সেই সময়ে জার্মানীর পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করার মানে ছিল না। আসলে

হিটলার বোঝাতে চেয়েছিলেন যে জার্মানী যদি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে সম্মত হয় তাহলে ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য তাকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু দায়িত্বও নিতে হত। কিন্তু জার্মান সৈন্য তখন ভারতবর্ষ থেকে এতটাই দূরে অবস্থিত ছিল যে জার্মানীর পক্ষে ভারতের জন্য কোন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। আর সেই কারণেই তিনি সুভাষচন্দ্রকে খুশি করার জন্য ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে জার্মানীকে দায়িত্বজ্ঞানহীন রূপে প্রতিপন্ন করতে চাননি। কিন্তু হিটলারের এবম্বিধ ব্যাখ্যা নির্বিচারে মেনে নিয়েও এ-কথা বলা যায় যে প্রাচ্যের পরাধীন জাতিগুলি সম্বন্ধে তিনি কখনই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। এদের সম্পর্কে তিনি আত্মজীবনী গ্রন্থে নানারকম উন্নাসিক এবং অপমানকর উক্তিও লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সব চেয়ে বড় কথা অনেক আশা নিয়ে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও (১৯৪১) পরের বছর শরৎ কালের মধ্যেই লাল ফৌজের রক্ষণাত্মক আক্রমণের মুখে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় জার্মানীর কাছ থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাশা করার মত আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

জার্মানীর যখন এই অবস্থা তখন সুদূর প্রাচ্যে জাপান থেকে অভাবনীয় ভাবে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের উদ্যোগে অনাবাসী ভারতীয়রা কেমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য প্রথমে টোকিও (মার্চ ১৯৪২) এবং পরে ব্যাঙ্ককে (জুন ১৯৪২) একটি সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন সে কাহিনী আগেই বিবৃত করা হয়েছে। ব্যাঙ্কক সম্মেলনের বেশ কয়েক মাস আগে পূর্ব এসিয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠনপর্বের একজন প্রধান উৎসাহী পুরুষ প্রীতম সিং-ও জাপ সেনা প্রধান কর্ণেল তামুরা-র সঙ্গে ৪১ সালের শেষ দিকে কিছু আলাপ আলোচনা হয়। এই আলোচনায় স্থির হয় যে জাপান ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের মাধ্যমে জার্মান প্রবাসী সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব এসিয়ায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য বার্তা পাঠাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী টোকিও থেকে বার্লিনস্থিত জাপান দূতাবাসের হিরোসি ওসিমা-কে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে জাপান মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যোগদান করায় (ডিসেম্বর ১৯৪১) সুভাষচন্দ্রও জাপানের সাহায্য লাভের আশায় সত্বর পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তাই হিটলারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার বৈঠকের সময় (২৯ মে ১৯৪২) সুভাষচন্দ্র তাঁকে পূর্বাঞ্চলে যাত্রা করার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ফুয়েরারকে অনুরোধ জানান। হিটলার সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেও জার্মানী ত্যাগ করতে তাঁর আরও কয়েক মাস সময় লেগেছিল। অবশেষে ফ্র্যাংকেনবুর্গস্থিত

ইন্ডিয়ান লিজিয়নের প্রতিষ্ঠাতা আবিদ হাসানকে সঙ্গী করে একটি জার্মান ইউ বোটে তিনি জার্মানী ত্যাগ করে গোপনে পূর্বাঞ্চলের উদ্দেশে যাত্রা করেন (৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩)। জলপথের এই দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে একটি জাপানী ডুবোজাহাজের যাত্রী হয়ে অবশেষে টোকিওতে এসে পৌঁছান (১৬ মে ১৯৪৩)। সুভাষচন্দ্র টোকিওতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভীষ্ট সিদ্ধ করার জন্য সুভাষচন্দ্র জার্মানীর কাছ থেকে বিশেষ রকম উল্লেখযোগ্য কোন সহায়তা লাভ করেন নি। নাৎসী সরকার সুভাষচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করার ঝুঁকি নিতে চায় নি। পরাধীন ভারতের জন্য ইউরোপের মাটিতে জার্মানীর প্রতি অনুগত ইন্ডিয়ান লিজিয়ন গঠন করার জন্য সম্মতি দিলেও নাৎসী সরকার সুভাষচন্দ্রকে সে-দেশে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করতে দিতেও অস্বীকৃত হয়েছিল। আসলে ফ্যাসিস্ট সরকার তার আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুভাষচন্দ্রকে কেবল প্রোপাগান্ডা ও ব্রিটিশ সমর শক্তির গোপন খবর সংগ্রহ করার কাজেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ এবং আই. এন. এ-র সঙ্গে জাপানের যে বোঝাপড়া হয়েছিল তার থেকে বোঝা যায় যে জাপানও ভারবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটেনের ভারতীয় উপনিবেশে ভাঙন ধরিয়ে সে-দেশ আত্মসাৎ করাই ছিল জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে জাপান আজাদ হিন্দ ফৌজকে তার আপন বাহিনীর লেজুড় হিসাবেই প্রধানত ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এই একই কারণে সে আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠনপর্বে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিল যার ফলে মোহন সিং ফৌজকে ভেঙে দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। সব দিক বিবেচনা করে এ-কথা অবশ্যই মানতে হয় যে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে জার্মানী ও জাপানকে দৃশ্যত যত বড় মিত্র বলেই মনে হোক না-কেন আসলে তারা উভয়েই ভারতকে আপনার আগ্রাসী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক সুভাষচন্দ্রের এই রাজনৈতিক সমঝোতা ফরাসী বুদ্ধিজীবী রমঁ্যা রোলাঁকে যার পর নাই ব্যথিত করেছিল। হিটলারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার বৈঠকের (২৯ মে ১৯৪২) কথা উল্লেখ করে রোলাঁ তাঁর ডায়েরীতে লেখেন যে সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে আলোচনার সময় একবার মস্কো, একবার বার্লিন আবার পরক্ষণেই টোকিওর দিকে ঝুঁকছিলেন। গতানুগতিক বাঙালী বাবুদের মত তিনিও ছিলেন নিতান্ত

রগচটা ও আবেগসর্বস্ব মানুষ—রাজনীতির কাজে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা তাঁর ধাতে ছিল না। সাধারণ বাঙালীর মত তিনিও ঈর্ষা, ক্রোধ এবং অহমিকা বোধের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।[১৩]

শান্তিবাদী রম্যাঁ রোঁলার পক্ষে ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহের সঙ্গে যে-কোন রকমের সহযোগিতা একটি নিতান্ত রকমের ঘৃণ্য কর্ম বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। অতীতে তিনি রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনী প্রীতি লক্ষ্য করেও তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ফ্যাসি বিদ্বেষের প্রচণ্ডতায় তিনি মুক্তিকামী পরাধীন জাতির চিত্তবিক্ষোভ এবং মানসিক অস্থিরতার কথা মোটেও বুঝতে পারেন নি। রোলাঁ্যা বুঝতে পারেন নি যে দু'শো বছর ধরে পরাধীনতার জ্বালায় ক্ষিপ্ত একটি জাতি কেমনভাবে দিশাহারা হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষশক্তির মৈত্রী স্থাপনের ঘটনাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করে তিনি শুধু রাজনীতির আপতিক ঘটনার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে হিটলারের টোটালেটেরিয়ান রাষ্ট্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সমঝোতা নিতান্তই এহ বাহ্য—এর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের দাসত্ব মোচন। এখানে সুভাষচন্দ্রের সমরনীতির ন্যায়ধর্ম বা এথিক্স বিচার করা যতটা জরুরী ততটাই তার যৌক্তিকতা এবং অবশ্যম্ভাবিতাও বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে অক্ষশক্তির ভেক ধারণে যদি সুভাষচন্দ্র বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে ঐ একই ধরনের বিপত্তির শিকার হয়েছিলেন বার্মার বা-ম এবং ফিলিপাইনের এক কালের সর্বোচ্চ ন্যায়াধীশ জোস. পি. লরেল। সব চেয়ে বড় কথা আপন স্বদেশকে জার্মানদের পদানত হতে দেখে ক্ষিপ্ত প্রায় রোলাঁ্যা নাৎসীদের টোটালেটেরিয়ান মতাদর্শেব বিরুদ্ধে মুখর হলেও তাঁর মাতৃভূমি ফ্রান্স কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে ইতস্তত করেনি। আর হিটলার—সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি যেভাবে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন এক হিসাবে তা-ও এক ধরনের অযৌক্তিক জাতি বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাৎসুদা ছদ্মনামে সুভাষচন্দ্র পূর্ব পরিকল্পনা মত ১৯৪৩ সালের ১৬ই মে তারিখে জাপানের রাজধানী টোকিওতে এসে উপনীত হন। টোকিওতে পৌঁছেই তিনি বেতার ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ব ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। অতঃপর ছয় সপ্তাহ বাদে তিনি সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছান (২ জুলাই ১৯৪৩) এবং এখানে সমবেত বিপুল জনতা কর্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। এর ঠিক দু দিন বাদে (৪ঠা জুলাই ১৯৪৩) ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সভাপতি রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে তাঁর সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া

থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সুভাষচন্দ্র এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে পূর্ব এসিয়াতে বসবাসকারী ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসীর পক্ষে সমাবেশে উপস্থিত অন্যূন পাঁচ হাজার ভারতীয় সোল্লাসে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। অতঃপর সভাস্থ সকলে সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' নামে অভিনন্দিত করার পর তিনি সমবেত জনতার কাছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের কর্মপরিষদকে (Council of Action) স্বাধীন ভারত অস্থায়ী সরকার (Provisional Government of Free India) হিসাবে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি আই. এন. এ-কে ভারতবর্ষ অভিমুখে পরিচালিত করার সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করেন। পরের দিন বিশ্ব সমক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হল। অতঃপর ২৫ আগস্ট ১৯৪৩ তারিখে সুভাষচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই সময়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে সুবিখ্যাত 'দিল্লী চলো' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে সর্বাত্মক প্রস্তুতির (total moblization) জন্য আহ্বান জানান।

কিন্তু ঘটনা পরম্পরা উপরে যে-ভাবে দ্রুত বর্ণনা করা হল বাস্তব পরিস্থিতি ততটা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হতে পারেনি। বস্তুত আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সূচনা পর্ব থেকেই নানারকম অন্তর্বিরোধ, ব্যক্তিগত উচ্চাশা, ষড়যন্ত্র ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা এই বাহিনীর ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল। এই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ তথ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে সেই কাহিনীর জের টেনে আরও দু-একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে নেওয়া দরকার।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের প্রস্তুতিপর্বে জাপানী সেনাপ্রধান সুজিয়ামা, তামুরা, ফুজিয়ারা এবং ভারতীয় সেনানায়ক মোহন সিং ও অনাবাসী অপর এক ভারতীয় প্রীতম সিং প্রমুখের অবদানের কথা সর্বজন বিদিত। পূর্বোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথা বলা হয়েছে যে জাপ আক্রমণের মুখে সিঙ্গাপুরের পতন হলে ইংরাজ সৈন্যগণ ভারতীয়দের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার পর তারা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জেনারেল ফুজিয়ারা এই সকল আত্মসমর্পণকারী ভারতীয়দের বিশ্বাসঘাতক ইংরাজদের পক্ষ ত্যাগ করে একটি স্বতন্ত্র বাহিনীতে সংগঠিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন যাতে তারা জাপানের মত বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতাক্রমে ইংরাজদের বিরুদ্ধে আপন দেশের শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হতে পারে। ফুজিয়ারার প্রস্তাবে মোহন সিং সম্মত হলে জাপানের তরফে সকল রকম সহযোগিতামূলক প্রতিশ্রুতি দানের পর আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈনিকদের মোহন সিং-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এর পরে প্রথমে টোকিও ও পরে ব্যাঙ্কক সম্মেলনে (১৯৪২) গৃহীত কয়েকটি

প্রস্তাব ও সুপারিশ অনুযায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে পূর্ব এসিয়াতে বসবাসকারী ভারতীয়দের রাজনৈতিক সংগঠন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগকে এই ফৌজের তত্ত্বাবধায়ক ও সংগঠক হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। ফৌজকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ দান করার পূর্ণ দায়িত্ব লীগের চারজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত একটি কর্ম পরিষদ বা Council of Action-এর উপর অর্পিত হয়েছিল। আর ফুজিয়ারার ইচ্ছা অনুযায়ী মোহন সিংকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন প্রক্রিয়ায় মোহন সিং-এর অবদান সম্পর্কে অনেকের মনে অনেক রকম অতিরঞ্জিত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নানা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে মোহন সিং একজন অতীব সুবিধাবাদী লোক। ফৌজের প্রতিটি সদস্যকে তিনি নিজের নামে আনুগত্যের শপথ করিয়ে গোটা বাহিনীকে নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূর্ণ করবার যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এবং এ-জন্য তিনি জাপানের সঙ্গে একটি গোপন ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়েছিলেন। এস. সি. গুহ নামে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের একজন প্রবীণ সদস্য মোহন সিং-এর এই সব অভিসন্ধি ও গোপন ষড়যন্ত্রের কথা আগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আই. এন. এ. ইতিহাস কমিটি'-র কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন যে মোহন সিং ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উপায় হিসাবে জাপানকে খুশি করার জন্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ এবং তার কর্ম পরিষদের অনুমোদন না নিয়েই জাপানের পরমার্শ মত আই. এন. এ. তথা ভারতবর্ষের স্বার্থবিরোধী অনেক রকম অবাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি কাউন্সিলের অনুমতি না নিয়ে আই. এন. এ. ইনটেলিজেন্স বিভাগের অন্তত ৪০০ ব্যক্তিকে কেবল জাপানকে তুষ্ট করার জন্যই বর্মাতে পাঠিয়েছিলেন। এ-ছাড়া প্রায় ৮০০ সেনা সমন্বিত আরও একটি পুরো ব্যাটেলিয়ানকেও তিনি একই উদ্দেশ্যে একই স্থানে প্রেরণ করেন। গুহ তাঁর বিবৃতির শেষভাগে স্পষ্টই জানিয়েছেন যে "He (মানে মোহন সিং) was definitely dealing secretly with the Japanese military."[১৪]

কিন্তু জাপানী কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রেখে আপন উদ্দেশ্য হাসিল করার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে মোহন সিং জাপ কর্তৃপক্ষের কাছে মদত পেয়ে নিজের প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। এই বাড়তি প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে মোহন সিং তাঁর অনুগত বাহিনীর সেনা সংখ্য ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছিলেন। এর ফলে জাপ কর্তৃপক্ষ রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। মোহন সিং যতদিন আই. এন. এ-র সৈন্য সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রেখে জাপানের চাহিদা মত তাঁর বাহিনীকে নিয়োজিত করতে স্বীকৃত ছিলেন

ততদিন মোহন সিং-এর তরফে লীগ ও কর্মপরিষদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মত বেআইনী কার্যকলাপে জাপান কোনরকম আপত্তি জানায় নি। কিন্তু এই বার মোহন সিং কর্তৃক সৈন্য সংখ্যা ভীতিজনক ভাবে বাড়িয়ে তোলার উদ্যোগ লক্ষ্য করে জাপান তাঁর ক্ষমতা সংকোচন করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় পক্ষে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। মোহন সিং এই সঙ্কটের সময় সুবিধা বুঝে লীগ ও কর্মপরিষদের দিকে আবারও ঝুঁকে পড়েন। তিনি আই. এন. এ. সম্পর্কে জাপ নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানবার জন্য দাবী করেন। একই সঙ্গে তিনি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ ও তার কর্মপরিষদকেও তাঁর দাবী অনুযায়ী জাপ সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু লীগের সভাপতি রাসবিহারী বসু ভারতীয়দের পক্ষে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে মোহন সিং-এর হঠকারী প্রস্তাব অনুযায়ী জাপ সরকারের সঙ্গে সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সমীচীন মনে করেন নি। বিশেষ করে মোহন সিং যে লীগকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন এ-কথা জানার পর তাঁর উপরে রাসবিহারীর আর আস্থা স্থাপন করা সম্ভবও ছিল না। এমতাবস্থায় জাপ সরকার বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ কারও কাছ থেকেই কোন সমর্থন পাওয়ার আশা না দেখে মোহন সিং তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ সদ্যোসৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজকেই ভেঙে দেন। অবশ্য মোহন সিং কর্তৃক এই রকম চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে এই রকম একপক্ষের হঠকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভেঙে দেওয়ার ফলে অনেকেই অসন্তুষ্ট এবং আশাহত হয়েছিলেন এবং এঁদের মিলিত চেষ্টায় কিছুদিন বাদে ফৌজকে পুনরুজ্জীবিত করাও সম্ভব হয়েছিল। সে যা-ই হোক এ-কথা ঠিক যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাথমিক গঠন পর্বের ইতিহাস আদৌ আশাব্যঞ্জক ছিল না। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এই বাহিনীকে ১৯৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বার তারিখে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র চার মাস বাদে ঐ বছরেরই ডিসেম্বার মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভেঙে দেওয়া হল। এই রকম অভাবনীয় সঙ্কট ছাড়াও আরও একটি নোতুন ধরনের জটিলতা এই সময়ে দেখা দিয়েছিল এবং অনুমান হয় যে এই সংকট সৃষ্টিতে জাপানের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানেচ্ছু বহু সংখ্যক যুবক যাদের শারীরিক অযোগ্যতা, সেনা ছাউনি এবং শিক্ষার্থী শিবিরে স্থানাভাব ইত্যাদি নানা কারণে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি তারা কারও কোন নির্দেশের তোয়াক্কা না করে সহসা একটি 'ইয়ুথ লীগ' গঠন করে এবং নিজেরাই গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে দাবী জানায়। এই সব স্বঘোষিত নেতারা রাসবিহারী এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার

চালাতে শুরু করে এবং এ-সবের ফলে রাসবিহারী যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবে একটা চূড়ান্ত রকমের বিশৃঙ্খলার দাপটে সব কিছু ভেঙে পরার উপক্রম হয়েছিল।

কিন্তু সব কিছু যথার্থই ভেঙে পড়েনি। আগেই বলা হয়েছে যে মোহন সিং কর্মপরিষদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেআইনীভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভেঙে দেবার জন্য সৈন্যদের কাছে নির্দেশ রেখে যান। কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর (২৯ ডিসেম্বার ১৯৪২) কর্মপরিষদের সভাপতি হিসাবে রাসবিহারী এই ফৌজকে অধিকাংশের ইচ্ছানুযায়ী জীইয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তাই নয় তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ফৌজের সৈনিকদের মনোবল ও শৃঙ্খলা বোধ ফিরিয়ে আনার জন্য একটি প্রশাসনিক কমিটিও (Committee of Administration) গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি হন জগন্নাথ রাও ভোঁসলে। কমিটির অপর তিন সদস্যের নাম মহম্মদ জামান কিয়ানি, কর্ণেল লোকনাথন এবং মেজর প্রকাশ চাঁদ। কমিটি গঠিত হওয়ার পর এবং সংগঠন সংক্রান্ত আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরে জাপানী দূত ওসিমা মারফৎ জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের কাছে খবর পাঠানো হয় যাতে তিনি সত্বর পূর্ব এসিয়াতে উপস্থিত হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। ওদিকে সুভাষচন্দ্রকে খবর পাঠানোর কিছুদিন পরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ টেরিটোরিয়াল কমিটির প্রতিনিধিদের একত্র করে ব্যাঙ্ককে আরও একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল (এপ্রিল ১৯৪৩)। এই সম্মেলনে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পূর্ব এসিয়াতে সংগঠনের কাজ দেখা শোনার কাজে রাসবিহারীকে বিগত কয়েক মাস যাবৎ প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল এবং এই কারণে তিনি ক্রমশই অবসন্ন হয়ে পরেছিলেন। তাছাড়া মোহন সিং এবং পূর্বে উল্লেখিত ভুঁইফোড় ইয়ুথ লীগ প্রভৃতির নাশকতামূলক কাজের দরুণ সংগঠনের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করার মত পরিশ্রম করার শক্তি ও নেতৃত্বগুণও রাসবিহারীর ছিল না এবং এ ব্যাপারে তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পদমর্যাদার প্রতি আসক্তিহীন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মত রাসবিহারী স্বেচ্ছায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সভাপতির পদ থেকে সরে এসে সুভাষচন্দ্রকেই নেতৃপদে বরণ করেন। এইভাবে সুভাষচন্দ্র নেতৃত্বভার গ্রহণ করবার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকাণ্ডের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে ২৫ আগস্ট ১৯৪৩ তারিখে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে ফৌজের সদস্যদের

ট্রেনিং দেওয়ানোর জন্য বন্দোবস্ত করতে এবং অন্যান্য কতকগুলি জরুরী আনুষঙ্গিক বিষয় স্থির করার জন্য কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়। অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের পক্ষ থেকে তিনি সিঙ্গাপুরের ক্যাথে হলে সমবেত জনতাকে সাক্ষী রেখে স্বাধীন ভারত অস্থায়ী সরকার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন (২১ অক্টোবর ১৯৪৩)। এই ঘোষণাটি জারি করার সময় সুভাষচন্দ্র বলেন ঃ

> "স্বাধীনতা আজ সমাসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য হল একটি অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠন করা এবং সে গভর্নমেন্টের পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক নেতা আজ কারাগারে বন্দী, জনসাধারণও আজ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।[১৫] এই অবস্থায় ভারতে অস্থায়ী গভর্নমেন্ট করা বা সে গভর্নমেন্টের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই পূর্ব এসিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কর্তব্য হল স্বদেশ ও বিদেশের সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সমর্থন নিয়ে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠন করা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা।...ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশ এবং তার মিত্রদের বিতাড়িত করবার জন্য অস্থায়ী গভর্নমেন্টকে সংগ্রাম চালাতে হবে। তারপর অস্থায়ী গভর্নমেন্টের কর্তব্য হবে স্বাধীন ভারতে জনগণের ইচ্ছা অনুসারে এবং তাদের আস্থাভাজন একটি স্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন হয়ে দেশ শাসন করা...ভগবানের নামে ও অতীত যুগে যাঁরা ভারতীয় জনগণকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের নামে এবং যে সকল পরলোকগত বীর আমাদের নিকট বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁদের নামেও আমরা ভারতীয় জনসাধারণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করবার জন্য আমরা তাদের এবং তাদের মিত্রদের আহ্বান করছি। শত্রু যতদিন না ভারতভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং যতদিন না ভারতবাসী আবার স্বাধীন হয়, ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম সাহস, অধ্যাবসায় এবং চরম জয়ে আস্থা রক্ষা করে চালিয়ে যেতে হবে।"

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের তরফে ২১ অক্টোবারের উপরোক্ত

ঘোষণাটিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরা হলেন সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী), ক্যাপ্টেন শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন (মহিলা সংগঠন), এস. এ. আইয়ার (বিজ্ঞাপন ও প্রচার), (লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী (অর্থ), এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার পক্ষে লেঃ কর্ণেল আজিজ আহমেদ, লেঃ কর্ণেল এন. এম ভগত, লেঃ কর্ণেল এম. জেড, কিয়ানি, লেঃ কর্ণেল এ. ডি. লোকনাথন, লেঃ কর্ণেল এহসান কাদের এবং লেঃ কর্ণেল শাহ নওয়াজ। এঁরা ছাড়া এ. এম. সহায় (মন্ত্রী পদমর্যাদাপ্রাপ্ত সচিব), রাসবিহারী বসু (সর্বপ্রধান উপদেষ্টা), এ. এন. সরকার (আইন বিষয়ক উপদেষ্টা) এবং ছয়জন সাধারণ উপদেষ্টাও (যথা করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইয়ালাপ্পা, জে. থিভি এবং সর্দার ঈশোর সিং) উপরোক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করেন। ঘোষণাটি জারি করার দুই দিন পরে অর্থাৎ ২৩ তারিখে অস্থায়ী সরকারের একটি ক্যাবিনেট মিটিঙের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রিটেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাটি স্বয়ং সুভাষচন্দ্রই রেডিওতে পাঠ করেন এবং সান ফ্রান্সিসকো বেতার মারফত সেটি বিশ্ব সমক্ষে সম্প্রচার করা হয়।

অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার পরে বিশ্বজুড়ে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। পৃথিবীর নয়টি রাষ্ট্র অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দান করে। এই রাষ্ট্রগুলি হল জাপান, জার্মানী, ইটালি, ক্রোশিয়া, বর্মা থাইল্যান্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপাইন এবং মাঞ্চুরিয়া। বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে এই স্বীকৃতি লাভ আন্তর্জাতিক আইনের প্রেক্ষাপটে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার বা কোর্ট মার্শাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন ফৌজের পক্ষ থেকে এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অপর একটি স্বাধীন সরকারের সেনা বাহিনীকে ইংরাজের আদালতে বিচারের জন্য উপস্থাপিত করা অবৈধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন ও গঠনপর্বের ইতিহাস সম্পর্কে উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বৃত্তান্ত ইংরাজ সরকার কর্তৃক প্রচার করা হয়েছিল। দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শালের সময় ব্রিটিশ সরকারের তরফে ভারতের এ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার এন. পি. ইঞ্জিনীয়ার এই ইতিহাস বিবৃত করেন। এ্যাডভোকেট-জেনারেল সিঙ্গাপুরের পতন (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২) ও নিকটবর্তী ফারার পার্কে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের (১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২) ঘটনা উল্লেখ করে

কেমনভাবে ১লা সেপ্টেম্বার ১৯৪২ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয়েছিল সে কাহিনী বিবৃত করেন। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই নিশম রোড শিবিরের কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ প্রায় শ তিনেক যুদ্ধবন্দী সেনা অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন যে তাঁদের মধ্যে নানারকম বিভেদ সত্ত্বেও যেহেতু তাঁরা সকলেই পরাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক সেই কারণে তাঁদের মোহন সিং-এর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। শাহ নওয়াজ উপস্থিত সেনা অফিসারদের সকলকেই বাদবাকী যুদ্ধবন্দীদের কাছে তাঁর আবেদন পৌঁছে দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল আরও বলেন যে এই সকল যুদ্ধবন্দীরা যে শাহ নওয়াজের বক্তৃতার সারবত্তা অনুধাবন করে সকলেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল তা নয়। বস্তুত তাদের মধ্যে অনেকেই ফৌজের কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাঁদের উপরে বন্দী-শিবিরে যে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল তা এড়ানোর জন্য বাধ্য হয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা ফৌজে প্রথম দফায় যোগ দিতে অস্বীকার করে তাদের সিঙ্গাপুরের বিদাদরি, শেলেতার এবং ক্রাঞ্জি নামক তিনটি বন্দী শিবিরে (concentration camp) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ওদের বেশীর ভাগ সময়ই কিছু খেতে দেওয়া হত না এবং কখনও কখনও খাবারের নামে অখাদ্য খেতেও বাধ্য করা হত। শিবিরে অসুস্থ বন্দীদের জন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে পিঁপড়ে ভরা খালি মাটিতে বন্দীদের শুতে হত। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বন্দীদের প্রায়শই দু'ইঞ্চি মোটা এবং পাঁচ ফুট লম্বা লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে প্রহাব করা হত যাতে তারা সবাই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বাধ্য হয়। এ্যাডভোকেট জেনারেল ক্রাঞ্জি শিবিরের বন্দীদের উপর অত্যাচারের কয়েকটি ঘটনার উদাহরণ দেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের কোন এক দিনে ৫/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জমাদার ফতে খান এবং সুবাদার শিঙ্গারা সিং নামে দুই ব্যক্তি প্রায় পনের জন সশস্ত্র শিখ সৈন্য নিয়ে ক্রাঞ্জি শিবিরে উপস্থিত হয়। সেখানে সমবেত প্রায় ৩০০ জন মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বলার পর তারা সেই অনুরোধ মানতে অস্বীকৃত হয়। তখন তাদের উপর গুলি চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে অকুস্থলেই হত্যা করা হয়। এর পর আরও তিন জন আই. এন. এ.অফিসার তিনজন জাপ সামরিক অফিসার সমভিব্যহারে বন্দীদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের এই মর্মে শাসান যে জাপ কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত তাদের সকলকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে হুকুম করা হচ্ছে। এই হুকুমের পরেও যারা অবিচলিত ছিল তাদের সকলকেই সেনা শিবিরে আটক রেখে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ঐ বছরের সেপ্টেম্বার মাস নাগাদ

বিদাদরি শিবিরেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে বন্দী গুর্খা সেনাদল আই. এন. এ.-তে যোগ দিতে না চাওয়ায় তাদের মধ্যে কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এবং আরও বেশ কয়েকজনকে বেয়নেট খুঁচিয়ে জখম করা হয়েছিল। হাসপাতালে বেয়নেট দ্বারা আহত কয়েকজন শয্যাশায়ী এবং চিকিৎসাধীন সৈন্যকেও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়ানোর জন্য ভয় দেখানো হয়েছিল।

বছরের শেষ দিকে জাপ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার দরুন মোহন সিং যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেন তখন এই ফৌজের অনেক সৈন্যও তাদের আই. এন. এ. ব্যাজ খুলে ফেলেছিল। এই অবস্থান্তর লক্ষ্য করে আই. এন. এ কর্তৃপক্ষ তখন সৈন্যদের একটি প্রশ্নোত্তরের (Questionnaire) ফর্ম পূরণ করার মাধ্যমে তাঁরা আই. এন. এ-র সৈনিক হিসাবে থাকতে চান কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাদের ১৯৪৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের আগেই একটি ছাপানো প্রচারপত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আগস্ট (৪২) আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনা বিচার করে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকদের আই. এন. এ-তে যোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু এই উচিত কাজটি যে-সব সৈনিক করতে চাইবেন না তাদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব জাপানের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছিল।

অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এন. পি. এঞ্জিনীয়ার আরও বলেন যে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাস নাগাদ শাহ নওয়াজ আবারও নবোদ্যমে যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে আই. এন. এ.-র জন্য সৈন্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। শাহ নওয়াজ সেই সময় পোর্ট ডিক্সনের শিবিরে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধবন্দীদের এই বলে বোঝান যে জাপানের শিবিরে বন্দী হয়ে থাকলে তাদের অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হবে। কিন্তু আই. এন. এ-তে যোগ দিলে তারা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে থাকতে পারবে। এপ্রিল মাস নাগাদ পোর্ট সুইটেনহ্যামের শিবিরে উপস্থিত হয়ে শাহ নওয়াজ একইভাবে সেখানকার সৈন্যদেরও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু এই দুই জায়গার কোনখানেই তিনি সৈন্যদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পাননি।

শাহ নওয়াজের মত লেঃ গুরুবক্স সিং ধীলন এবং মেজর ধারাও আজাদ হিন্দ ফৌজে সৈন্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছিলেন। মেজর ধারা সৈন্যদের দেশাত্মবোধ উসকে দিয়ে বলেছিলেন যে এই ফৌজ দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়েই লড়াই করবে। ভারতে জাপ সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে লড়াই করার সময় যদি জাপানীদের

তরফ থেকে কোন বেচাল কাজ লক্ষ্য করা যায় তাহলে প্রয়োজন মত আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপ সৈন্যদেরও বাধা দিতে ইতস্তত করবে না। লেঃ ধীলন যে-সব সৈনিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে ভীত হয়েছিলেন তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে যদি কোন দিন যুদ্ধে ইংরাজরা জয়লাভ করে তাহলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ সৈনিকদের ভীত হবার কোন কারণ নেই। কারণ সামরিক আইন অনুসারে যে-সব উর্ধ্বতর অফিসাররা এই সব অধঃস্তন সৈনিকদের দল ভাঙিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে প্রণোদিত বা প্ররোচিত করেছেন তাঁদের উপরেই সব কিছুর দায়িত্ব ন্যস্ত হবে। এ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে এইভাবে অত্যাচার করে, ভয় দেখিয়ে এবং আই. এন. এ-র বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে মোহ বিস্তার করে অনেক লোককে আজাদ হিন্দ ফৌজে ভরতি করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর সাধারণ সেপাইরা তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি সর্বপ্রকার আনুগত্য স্বীকারে অভ্যস্ত। তাই এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে অনেকেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল।

কোর্ট মার্শালের সময় সওয়াল-জবাব প্রসঙ্গে অ্যাডভোকেট-জেনারেল সৈনিকদের উপর কীভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগও পেশ করেছিলেন। তিনি বলেন যে প্রাক্তন ইন্ডিয়ান আর্মির অন্তত চার জন সদস্যকে (যারা পরে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগও দিয়েছিল) নানা অজুহাতে লেঃ ধীলন হত্যা করেছিলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডে ২/১০ বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন প্রেমকুমার সেগল তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখে এই চারজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে একটি ট্রেঞ্চে এনে হাজির করা হয়েছিল। সেখানে ধীলন এই চারজন সৈনিককে আজাদ হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দোষীদের মধ্যে একজন আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। অতঃপর ধীলনের নির্দেশে হেদায়েতুল্লা এবং কালুরাম নামে দুজন সৈনিক বন্দীদের উপর রাইফেল থেকে গুলি বর্ষণ করে। গুলি খাওয়ার পর অপরাধী চারজনই ট্রেঞ্চের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। কিন্তু এ-ভাবে আধমরা অবস্থায় তাদের ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না বিবেচনা করে শের সিং নামে অপর এক সেপাইকে আহত প্রত্যেক জনকে এক এক করে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। শের সিং অনতিবিলম্বে এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। ফলে বন্দী চার সেনা নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়।

ধীলন এবং সেগল ছাড়াও শাহ নওয়াজের বিরুদ্ধেও একইভাবে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছিল। অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে নিজেদের মর্জিমত আজাদ হিন্দ ফৌজকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য শাহ নওয়াজ যুদ্ধবন্দীদের নানাভাবে নিপীড়ণ করেন। তিনি স্বয়ং মহম্মদ হুসেন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্যও প্ররোচনা সৃষ্টি করেছিলেন।

এ্যাডভোকেট-জেনারেলের বিবৃতি পাঠ করলে বোঝা যায় যে রাজনৈতিক এবং আইনী অভিযোগ ছাড়াও ব্রিটিশ সরকার আই. এন.এ-র বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়হীনতার তিনটি প্রধান অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এক, আই. এন. এ. কর্তৃপক্ষ আত্মসমর্পণকারী ইন্ডিয়ান আর্মির যুদ্ধবন্দীদের অনেকের উপর নানাভাবে মানসিক ও দৈহিক নিপীড়ণ চালিয়েছিল। দুই, সামরিক শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেমের অজুহাতে সৈনিককে বিশ্বাসঘাতকতার অপ্রমাণিত এবং মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করে হত্যা করা হয়েছিল। তিন এবং সর্বশেষে, যুদ্ধবন্দীদের অনেককেই ব্যক্তিগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয় দেখিয়ে এবং নানাভাবে মিথ্যা প্রলোভনে ভুলিয়ে আই. এন. এ-তে ভরতি করা হয়েছিল। সরকার পক্ষ তাঁদের অভিযোগ সমূহ প্রমাণ করবার জন্য অনেককেই সাক্ষী হিসাবে কোর্ট মার্শালের সময় হাজির করিয়েছিল। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফে সওয়ালকারী ভুলাভাই দেশাই এই সকল সাক্ষীদের জেরা (cross-examination) করার সময় সরকার পক্ষের অভিযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করা যায়নি। স্যার নোসেরওয়ান এঞ্জিনীয়ার যুদ্ধবন্দীদের উপর দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ক্যাপ্টেন ধীরগালকার, সুবেদার-মেজর বাবুরাম, জমাদার আলতাফ রজ্জাক প্রমুখ সাক্ষীদের হাজির করান। কিন্তু ভুলাভাই দেশাই-এর জেরার মুখে এঁরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে আই. এন. এ-তে যোগ দেওয়া বা না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত যুদ্ধবন্দীদের আপন স্বাধীন ইচ্ছার উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল এবং এই ব্যাপারে তাঁদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। সরকার পক্ষের তেরো নম্বর সাক্ষী জমাদার মহম্মদ হায়াৎ বন্দীদের উপর দুর্ব্যবহার সম্পর্কে নানারকম সাক্ষ্য পেশ করার পরেও এ-কথা স্বীকার করেছিল যে আই. এন. এ.-তে যারা যোগ দিয়েছিল এবং যারা যোগদান করেনি এই উভয় শ্রেণীর বন্দীকেই শিবিরে একই ধরনের খাদ্য পরিবেশন করা হত। অর্থাৎ ফৌজে যোগদানে অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদের না খাইয়ে রাখা বা নিকৃষ্ট মানের খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করার কোন প্রশ্নই ছিল না। সতেরো নম্বর সরকার পক্ষের সাক্ষী দিলাশারাম এমনভাবে তাঁর বয়ান পেশ করেছিলেন যে তাঁকে একজন অভিযুক্ত পক্ষের সাক্ষী বা ডিফেন্স উইটনেস বলেই মনে হয়েছিল। তিনি স্মৃতি থেকে শাহ নওয়াজের বক্তৃতা প্রায় হুবহু উদ্ধৃত

করে বলেছিলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিককে নারী জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষের মাটিতে পৌঁছে ফৌজের সেনাদের যে যুদ্ধক্ষেত্রে জাপ সেনাদের অগ্রবাহিনী হিসাবেই লড়াই করতে হবে সে কথাও তাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছিল। দিলাশা রাম বলেন যে জাপানীরা ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে কোন বাড়তি সুযোগ নিলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চেষ্টা করলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা যাতে সেই চেষ্টা প্রতিহত করেন সে-কথা শাহ নওয়াজ তাঁর বক্তৃতায় বারে বারেই সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুত শাহ নওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর নীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে সব শেষে জোর দিয়ে এই কথাই বলেছিলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপ সরকারকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য লড়াইয়ে সামিল হয়নি—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই তার একমেবাদ্বিতীয়ম্ লক্ষ্য। সাক্ষ্য দান শেষ করে দিলাশা রাম বলেন যে শাহ নওয়াজের বক্তৃতার মহৎ আদর্শ, দেশপ্রেম এবং প্রেরণাশক্তিই যুদ্ধবন্দী ভারতীয়দের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ২/৯ জাঠ রেজিমেন্টের সিপাহী শহিদুল্লা খানকেও সরকার পক্ষ সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করান। কিন্তু এই ব্যক্তিও দিলাশা রামের মত অপ্রত্যাশিতভাবে সরকার পক্ষের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন। অভিযুক্ত পক্ষের কৌসুঁলিদের জেরার জবাবে তিনি সরাসরি স্বীকার করেন যে সরকার পক্ষের শেখানো মত এমন অনেক কথা তিনি কোর্টে বলেছেন যেগুলি আদপেও সত্য নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল রীতিমত অতিরঞ্জিত।

কোর্ট মার্শালের বিচারকদের কাছে আই. এন. এ-র তিনজন বিশিষ্ট সেনাপ্রধানের বিবৃতি পেশ করা হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তি হলেন শাহ নওয়াজ, প্রেম সেগল এবং গুরু বক্স সিং ধীলন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে আনীত সরকারী অভিযোগ সমূহের অসারতা প্রমাণ করবার জন্য এঁদের বিবৃতিগুলি খুঁটিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। উল্লেখিত তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিই আদালতকে এ-কথা বারংবার মনে করিয়ে দেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত একটি জাতীয় সেনাবাহিনী এবং যেহেতু এই অস্থায়ী সরকারের স্বাধীন সত্তা বিশ্বের আরও কয়েকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সেই হেতু আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী প্রতিটি সৈনিক আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বেলিজারেন্ট (belligerent) মর্যাদা পাবার অধিকারী এবং সেই কারণে তাঁদের আইন মোতাবেক ব্রিটিশের আদালতে বিচার করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। লেঃ ধীলন আরও স্পষ্ট ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন যে যুদ্ধ চলা কালে কোন তথাকথিত অপরাধমূলক কাজ যদি তিনি করেও থাকেন তাহলে সেই অপরাধের জন্য তাঁকে ইংরাজের তৈরী করা Indian Army Act

অনুযায়ী ব্রিটিশের আদালতে বিচার করা আইনসম্মত হবে না। কারণ তিনি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসাবে আপন সামরিক কর্তব্য পালনের জন্যই তথাকথিত সেই সব অপরাধকর্মগুলি করতে বাধ্য ছিলেন। শুধু যে আইন মোতাবেক তাঁদের যুদ্ধপরাধী শিবিরত্যাগী সৈনিক বলে অভিযুক্ত করা যায় না তা-ই নয়, আই. এন. এ-র উল্লেখিত তিনজন সেনা প্রধান তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত হত্যা এবং হত্যাকান্ডে সহযোগিতা করা ও ভয় দেখিয়ে কিংবা দৈহিক নিপীড়ন করে ফৌজে সেনা সংগ্রহ করা ইত্যাদি যাবতীয় অভিযোগও একে একে অস্বীকার করেন। শাহনওয়াজ বলেন যে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই সকলের কাছে স্পষ্ট ভাবে এ কথা বলে দেন যে ভারবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য যারা চরম দুঃখ-কষ্ট এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত একমাত্র তারাই কেবল ফৌজে যোগ দিতে পারবে। যাদের এত সহ্যশক্তি নেই তারা স্বচ্ছন্দে ফৌজে যোগ না দিয়ে থাকতে পারবেন। শাহ নওয়াজ এ-কথাও বলেন যে ফৌজে সৈন্য সংগ্রহ করার সময় তিনি তাদের দরকার হলে জাপানীদের বিরুদ্ধেও লড়তে হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই রকম চেতাবনী ঘোষণা করার অর্থই হল এই যে তাঁরা কেউ-ই লোক ভুলিয়ে বা তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান নি। ফলে ফৌজে কেবল স্বেচ্ছাকর্মীদেরই নিযুক্ত করা হয়েছিল। মহম্মদ হোসেনের হত্যা প্রসঙ্গে শাহ নওয়াজ বলেন যে এই ব্যক্তিটিকে প্রাণদন্ড দেওয়া বা তাকে গুলি করে মারার কোন নির্দেশই তিনি দেন নি। আসলে হোসেন এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে বিচারার্থে তাঁর কাছে এক দিন হাজির করা হয়েছিল এবং তখন তিনি তাকে এই বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন যে তার কৃতকর্ম এতটাই জঘন্য ধরনের যে সে-জন্য মৃত্যুদন্ডই তার যোগ্য শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ঐ দিন তার বিচার না করে তাকে অন্য আর একদিন তাঁর কাছে হাজির করানোর জন্য তিনি হুকুম দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সম্ভবত ঘটনাচক্রের দ্রুত পরিবর্তনের জন্য তাকে আর কোন দিনই তাঁর সামনে হাজির করা যায়নি। সুতরাং সরকার কর্তৃক আনীত হোসেনকে হত্যা করার অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। শাহ নওয়াজের মত ক্যাপ্টেন সেগলও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত চার জনকে হত্যাপরাধের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। সেগল বলেন যে এ-কথা অবশ্য সত্য যে উল্লেখিত চার ব্যক্তিকে এবং আরও কয়েক জনকে তিনি সেনাবাহিনীর রীতি অনুযায়ী প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেন। কিন্তু এরা অনুশোচনা প্রকাশ করে ক্ষমা ভিক্ষা করায় সবাই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। তবে ফৌজের আর কোন সৈনিক পাছে তাদের দেখাদেখি একই রকম দুষ্কর্ম করতে উৎসাহিত হয় সেইজন্য তাদের

দণ্ডমুক্তির ঘটনাটি প্রচার না করে দণ্ডাজ্ঞার খবরটিই ফলাও করে জাহির করা হয়েছিল। ইংরাজ সরকার ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই না করে এই রকম বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের উপর নির্ভর করে তাঁদের দুরভিসন্ধিমূলক ভাবে অভিযুক্ত করেছেন। এ-সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা হল এই যে উল্লেখিত চার ব্যক্তির কাউকেই হত্যা করা হয়নি। সেগলের অভিমত ক্যাপ্টেন ধীলনের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছিল। ধীলন বলেন যে ঠিক যেই দিন তিনি কয়েকজন ব্যক্তির উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে তাদের হত্যা করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই দিন তিনি অকুস্থলে আদপেই উপস্থিত ছিলেন না। ঐ দিন তিনি চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে তাদের কারওকে হত্যা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ধীলন বলেন যে আসলে এই চার ব্যক্তি কোন এক সময় অসদাচরণের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা সত্যই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করে ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং হত্যাপরাধের অভিযোগটি নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। ধীলন সরকারের অভিযোগগুলি যে কতদূর অলীক এবং অসত্য ছিল সে বিষয়ে তাঁর বিবৃতিতে আরও কয়েকটি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেন। তিনি বলেন যে সরকারী কৌসুঁলি এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে আই. এন. এ-তে যোগদানে অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদের উপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য ফৌজি কর্তৃপক্ষ নাকি তাদের বন্দী শিবির বা কনসেনট্রেসান ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা পরিচালিত কোন কনসেনট্রেসান ক্যাম্পের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর ফৌজের বন্দী শিবির বা ডিটেনসান ক্যাম্পগুলিতে কেবল শাস্তিপ্রাপ্ত ফৌজি সেনাদেরই বন্দী করে রাখা হত। সব চেয়ে বড় কথা আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃপক্ষ নীতিগত ভাবে তাদের ডিটেনসান ক্যাম্পে চালান করা কোন সৈনিককে ফৌজে গ্রহণ করেনি। যুদ্ধবন্দীদের ভয় দেখিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দলভুক্ত করা বিষয়ক সরকারী অভিযোগ সম্পর্কে ধীলন বলেন যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে তিনি প্রত্যেককে যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণামের কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিতেন যাতে ফৌজে যোগ দেওয়ার আগে সব কিছু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে তারা একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। বস্তুত তাঁর বক্তৃতা শুনে অনেকেই তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এইভাবে তাঁর নেতৃত্বাধীন রেজিমেন্ট মিয়িনগিয়ান (Myingyan) ত্যাগ করার প্রাক্কালে অন্তত পক্ষে প্রায় দু'শো জন সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজের সহযাত্রী হতে দ্বিধা প্রকাশ করে। তখন এদের সকলকেই সসম্মানে রেঙ্গুনে ফেরত পাঠানো হয়। এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে দেশপ্রেম, জাতীয় স্বার্থ এবং স্বাধীনতার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত

হয়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অপরিসীম দুঃখভোগ ও লাঞ্ছনার পরিণাম মনে রেখে স্বেচ্ছাব্রতী হিসাবেই সকলে ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। ফৌজের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য ভাড়াটে সৈনিকদের যেমন করতে হয় তেমন কোন প্রলোভন বা চাপ সৃষ্টি করার আদৌ কোন প্রয়োজন ঘটেনি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন প্রক্রিয়ার কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ-কথা সকলেই জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে ব্রিটেনকে বেকায়দায় ফেলার জন্য জাপান স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিল এবং সুভাষচন্দ্রও কূটনীতির প্রয়োজনে পরাধীন ভারতবর্ষ ও জাপান—এই উভয়পক্ষের সাধারণ শত্রু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপানকে সমর্থন করতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির বাস্তব প্রয়োজনে এই সহযোগিতার বন্ধন স্থাপিত হলেও জাপান পরাধীন জাতির শক্তি ও আদর্শ সম্পর্কে আদৌ শ্রদ্ধাশীল ছিল না। মালয়ের সিঙ্গাপুরে ইন্ডো-ব্রিটিশ আর্মির ভারতীয় সৈনিকেরা যেভাবে অনায়াসে জাপ সৈন্য কর্তৃক বিজিত হয়েছিল তাতে ভারতীয় সৈন্যের সমর নৈপুণ্য সম্পর্কেও তাদের অশ্রদ্ধা জন্মেছিল। তাই ভারতীয় সেনাদের অপারেশানে নামিয়ে বড় ধরনের কোন সাফল্য অর্জন করা যাবে না বলেই জাপানীরা একান্তভাবে বিশ্বাস করত। এই কারণে মণিপুরের ইম্ফলে যুদ্ধযাত্রা করার সময় জাপানী সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি আই. এন. এ-র সৈনিকদের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব দেন যে এই বাহিনীর সৈনিকরা সিঙ্গাপুরেই অবস্থান করুক এবং সেখান থেকে জাপানের গুপ্তচর হিসাবে ইংরাজের সমর প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে গোপন খবর সংগ্রহ করে জাপানকে সাহায্য করুক। অর্থাৎ তেরাউচির পরিকল্পনা অনুযায়ী আই. এন. এ-কে যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগ বাহিনী হিসাবে কখনই কাজে লাগানো হবেনা—তাকে বড় জোর অগ্রগামী জাপবাহিনীর অনুসরণকারী রেয়ারগার্ড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনার অর্থ এই যে, যেহেতু ভারতীয় সৈনিকদের উপর কোনভাবেই বিশেষ আস্থা রাখা চলে না সেই কারণে জাপানই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মূল লড়াইয়ে সামিল হবে।

সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সৈনিকদের দিয়ে শুধু পঞ্চম বাহিনী বা গুপ্তচরের কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে কেবল জাপানী সৈন্যের রক্ত ঝরিয়ে যদি ভারতকে স্বাধীনতা লাভ করতে হয় তবে সেই স্বাধীনতা দাসত্বের চেয়েও অমর্যাদাকর বলে প্রতিভাত হবে। তাই তেরাউচির প্রস্তাব নাকচ করে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করার জন্য দাবী জানান।

তেরাউচি এই দাবী অগ্রাহ্য করতে সক্ষম না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে যুদ্ধে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি রেজিমেন্টকেই ব্যবহার করা হবে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে তবেই পরবর্তী কালে গোটা বাহিনীকে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত করা হবে। এই ব্যবস্থার ফলে যে আই. এন. এ-কে জাপান তার অধঃস্তন বা সাবসিডিয়ারি বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল সে অচিরেই জাপানের সহযোদ্ধার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল। সুতরাং এই ফৌজের যুদ্ধাভিযান সংক্রান্ত কাহিনী এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছানোর পর দু'তিন বাদে (৪ঠা জুলাই) তিনি রাসবিহারী বসুর নিকট থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করার সর্বপ্রকার দায়িত্ব আপন হাতে গ্রহণ করেন। এর প্রায় ছয় সপ্তাহ বাদে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন (২৫ আগস্ট)। ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার পর তিনি এই বাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানোর জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন পর্যায় (organisational structure) এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আনুষঙ্গিক বিষয় এখানে সবিস্তারে আলোচনা না করলেও চলতে পারে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে এটা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানোর আগে সুভাষচন্দ্র প্রথমে ফৌজকে চারটি ব্রিগেডে ভাগ করে নিয়ে প্রতিটি ব্রিগেডকে এক-একটি নির্দিষ্ট ফ্রন্টে লড়াই করবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। লড়াইতে যাওয়ার আগে এই ব্রিগেডগুলি কে কোন্ পথে যাত্রা করবে এবং তাদের গন্তব্যস্থল কি হবে এই সব খুঁটিনাটি সমর কৌশলের ব্যাপার আগে ভাগেই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে স্থির করে নেওয়া হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন আই. এন. এ-র কম্যান্ডার শাহ নওয়াজ এবং জেনারেল কাওয়াবে এবং কাতাকুরা প্রমুখ জাপ সমর বিশেষজ্ঞগণ। ফৌজকে যে চারটি ব্রিগেডে ভাগ করা হয়েছিল সেগুলি গান্ধী, আজাদ এবং নেহেরুর নামে চিহ্নিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর অধিকাংশের ইচ্ছানুসারে তাঁর নিজের নামেও একটি ব্রিগেডের নামকরণ হয়েছিল।

সকলেই জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেওয়ার পরে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্য লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। মালয়ে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্মাও ইংরাজের হস্তচ্যুত হয়। এমতাবস্থায় জাপান আই. এন. এ-র সহযোগী সৈনিকদের সঙ্গে

নিয়ে বার্মার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার পরিকল্পনা করে। ভারতের অভ্যন্তরস্থ মণিপুরের ইমফল অঞ্চলটির তখন অপরিসীম সামরিক গুরুত্ব। আই. এন. এ এবং জাপানের যুগ্ম বাহিনী যদি কোনক্রমে এই এলাকাটির দখল নিতে সমর্থ হয় তাহলে মনিপুরের ভিতর দিয়ে সরাসরি বাংলা দেশে ঢুকে পড়া কোন কঠিন কাজ হবে না এবং সেরকম ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রীতিমত বিপন্ন হয়ে উঠবে। যুদ্ধজয়ের এই পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের মনঃপুত হয় এবং তদনুযায়ী ভারত-বর্মা সীমান্ত বরাবর যুদ্ধযাত্রা করা হবে বলে সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পনা তৈরী হয়ে যাবার পরে ঠিক হয় যে রেঙ্গুনে সমবেত সুভাষ ব্রিগেডের (রেঙ্গুনে এই ব্রিগেড ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসেই হাজির হয়েছিল) প্রথম ব্যাটেলিয়ানটি প্রোম হয়ে আরাকানের কালাদান উপত্যকায় জড়ো হবে। আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান দুটি মান্দালয় এবং কালেওয়া হয়ে চিন পাহাড় সংলগ্ন হাকা এবং ফালাম অঞ্চলে এসে সমবেত হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটেলিয়ান তার পূর্ব নির্দিষ্ট রুটে যাত্রা করে কক্সবাজারের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পূর্বে ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত মৌডাক অঞ্চলটি দখল করে (মে ১৯৪৪)। মৌডাকে আজাদ হিন্দ ফৌজ ক্যাপ্টেন সুরজ মলের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রায় পাঁচ মাস (সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ পর্যন্ত) ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের অবস্থান টিঁকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সুভাষ ব্রিগেডেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়ান দুটিও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ফালাম এবং হাকা অঞ্চলের দখল নিয়ে কোহিমার দিকে অগ্রসর হয় এবং সেই এলাকার পর্বতশীর্ষে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা প্রোথিত করে(১৯মার্চ ১৯৪৪)। কিন্তু কোহিমাকে অধিক দিন আই. এন. এ-র দখলে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকার আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য জাপান কোহিমা তথা ইমফল থেকে বহু সংখ্যক সৈন্য প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যায়। ওদিকে ডিমাপুর ও কোহিমায় ব্রিটিশ শিবিরে নোতুন করে সৈন্য আসার পরে তারাও নতুন উদ্যমে প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। তাছাড়া এই এলাকায় বর্ষা শুরু হওয়ায় অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করে। তখন জাপ সৈন্যরা তামু এলাকায় পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজও অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিস্থিতির চাপে ঐ একই অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করে (জুন ১৯৪৪)। এই ঘটনার কিছুদিন বাদে আই. এন. এ এবং জাপানের সম্মিলিত বাহিনী আরও পিছু হঠে চিন্দউইন নদীর পূর্বতীরে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলে সুভাষ ব্রিগেডের সমরাভিযান সেখানে স্থগিত হয়।

সুভাষ ব্রিগেডের মত গান্ধী ব্রিগেডও রেঙ্গুন হয়ে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ইমফলের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইমফলের বেগতিক অবস্থা দেখে তারা জাপ সৈন্যের পরামর্শ অনুযায়ী ইমফল ও তামুর মধ্যবর্তী পালেল নামক স্থানে পিছিয়ে এসে সেখানে একটি কঠিন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই বিপর্যয়ের মধ্যে আই. এন. এ বাহিনী পালেলের বিমানবন্দরটি দখল করে নিতে সমর্থ হলেও ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণের মুখে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। অবশেষে খাদ্যাভাব, প্রবল বর্ষণ এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার চাপে গান্ধী ব্রিগেডকেও একটু একটু করে পিছু হঠে এসে জুলাই মাসের শেষ নাগাদ কালেওয়া পর্যন্ত পশ্চাদাপসরণ করতে হয়েছিল। একইভাবে আজাদ ব্রিগেডও মে মাস নাগাদ তামুতে পৌঁছে প্রচন্ডভাবে গেরিলা আক্রমণ শুরু করলেও যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী ব্রিগেডের মত পিছু হঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

আই. এন. এ. এবং জাপানের যুগ্ম বাহিনী ১৯৪৪ সালের মার্চ মাস থেকে তাদের অভিযান শুরু করে। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তারা ব্রিটিশ সৈন্যের প্রতি-আক্রমণের মুখে রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪৪-৪৫-এ শীতের শুরুতেই ইংরাজ সৈন্য গোটা আরাকান অঞ্চল পুনরায় দখল করে বর্মার পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং তখন জাপ সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে ত্যাগ করে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। জাপানীরা পালিয়ে যাওয়ার পরে ১৯৪৫ সালের মে মাসের গোড়াতেই আই. এন. এ-র কাছ থেকে ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন আবারও দখল করে নেয়। অতঃপর আই. এন. এ. সৈনিকদের নিরস্ত্রীকৃত করে বন্দী করা হয় এবং এইভাবেই দক্ষিণপূর্ব এসিয়াতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রচেষ্টার উপর যবনিকা পতন হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রাম স্থূল আপাত ঘটনার বিচারে ব্যর্থ হলেও ফৌজি সেনারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে অপরিসীম বীরত্ব ও সমরনৈপুণ্যের নিদর্শন রেখে গিয়েছিলেন সে বিষয়ে সুভাষ ব্রিগেডের কম্যান্ডার মেজর শাহ নওয়াজের কোন সন্দেহ ছিল না। যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্যর্থকাম হলেও পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোথাও রণনৈপুণ্যের অভাব বা ভীরুতা প্রদর্শন করেনি। শুধু তাই নয় তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে আক্রমণকারী ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে জোর লড়াই করে অধিকৃত স্থান সমূহের দখল শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। তবু ভাগ্যের পরিহাস—প্রকৃতি তাদের উপর অপ্রসন্ন ছিল। পাহাড়ী এলাকায় প্রবলবর্ষণে তাদের রসদ সংগ্রহের পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। খাদ্য, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামরিক রসদের অভাবে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

সবচেয়ে বড় কথা শাহ নওয়াজ বলেছেন যে যুদ্ধের সঙ্গিন মুহূর্তে জাপ সৈন্যরাও নিজেদের বাঁচানোর জন্য আই. এন. এ-কে পিছু হঠতে বাধ্য করে। প্রকৃতি আর ফ্যাসিস্ট দোসর—এই দুয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা তাই অচরিতার্থ হয়ে রইল।[১৬]

সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের ১৬ই মে তারিখে জাপানে এসে পৌঁছান এবং তার প্রায় দেড় মাস পরে ৪ঠা জুলাই তারিখে রাসবিহারীর নিকট থেকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্ব এসিয়াতে সুভাষচন্দ্রের আগমন সংবাদ, প্রথমে গোপন রাখা হলেও পরে তা জানাজানি হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় যে সুভাষচন্দ্রের আগমন বার্তা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একাংশের মনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও ইংরাজ সরকার কিন্তু ভারতবর্ষের কংগ্রেসী (এবং বামপন্থী সমেত) রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিচার করে এই ঘটনায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তাদের একমাত্র আশংকা ছিল এই যে তাঁর উপস্থিতির দরুণ ভারতবর্ষে সরকার বিরোধী নাশকতামূলক ক্রিয়াকর্মের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই আশংকার মধ্যেও তাঁরা এই মনে করে স্বস্তি বোধ করেছিলেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধজয়ের পরিকল্পনায় কংগ্রেস সহ অধিকাংশ ভারতবাসীরই কোন সমর্থন ছিল না। ইংরাজ সরকার ভেবেছিলেন যে তবু যদি সুভাষচন্দ্র ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের (ভারত ছাড়ো আন্দোলন) তুঙ্গ সময়ে এ-দেশে এসে পৌঁছাতে পারতেন তাহলেও তাঁর পক্ষে একটা চরম কিছু করতে পারা হয়ত সম্ভব হত। কিন্তু এখন ৪৩-এর মধ্যবর্তী সময়ে যখন সর্বভারতীয় নেতাদের প্রায় সকলেই কারাবন্দী এবং আগস্ট বিপ্লবের বিপুল কর্মোদ্যোগও স্তিমিতপ্রায় তখন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভীত হবার কোন কারণ নেই। ব্রিটিশ সরকারের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের (Military Intelligence) পক্ষ থেকে তাই এই সময় ১৪ই জুলাই ১৯৪৩ তারিখে নিম্নলিখিত গোপন আশ্বাস বার্তাটি প্রচার করা হয়েছিল :

> "বোস সম্প্রতি জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে মিতালি করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন জাপানের নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের দরুণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্ভাবনার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সুখের বিষয় ভারতের জনসাধারণের মনোবল এবং সে-দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন স্থিতিশীল এবং জাপান সম্পর্কে সকলেই

বেশ ভীত। বোস হয়ত দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং রাজনীতির সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু গোটা কংগ্রেস দলকে একটা বড় রকমের বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে তাঁর সাফল্য অর্জন করা সহজ হবে না। যদি বিগত আগস্ট মাসে কিংবা গান্ধীর অনশনের সময়েও তিনি পূর্ব এসিয়াতে হাজির হতে পারতেন তাহলেও তাঁর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেক ভাল হতে পারত।"[১৭]

ব্রিটিশ সরকার নাশকতামূলক কাজের প্রস্তুতি সম্পর্কে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তা যথার্থই একেবারে অমূলক ছিল না। ইংরাজের পুলিশ এই সময় গোপনে অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক ইংরাজ বিরোধী গোপন ষড়যন্ত্রে বিশেষ রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বস্তুত ১৯৪৩ সালের মে মাস নাগাদ (অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র টোকিওতে এসে পৌঁছানোর পরেই) সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত কিছু গোপন কাগজপত্র পুলিশ ফরওয়ার্ড ব্লকের দপ্তর থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। এই সব নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ফরওয়ার্ড ব্লক বোম্বাই অঞ্চলে ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত ব্যবস্থা (decisive action) গ্রহণ করবার জন্য পরিকল্পনা করেছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ দল জাতীয় কংগ্রেসের তরফে ক্ষমতা গ্রহণ করে আসাম এবং বাংলা দেশ থেকে জাপানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে উদ্যত হয়েছিল। সময় বুঝে তারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ (Central Provinces) অঞ্চলেও ব্রিটিশ বিরোধী গণ অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। পুলিশী অনুসন্ধানের ফলে এ-ও জানা গিয়েছিল যে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার কিছু আগে ভারতবর্ষে তাদের কয়েকজন গুপ্তচরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং এরা ফরওয়ার্ড ব্লকের তত্ত্বাবধানে ইংরাজ বিরোধী কিছু নাশকতামূলক কাজেও লিপ্ত হয়েছিল। এই সব তথ্য জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরে বোঝা গিয়েছিল যে সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক ভারতের মাটিতে জাপানকে আহ্বান করে তাদের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেছিল।[১৮]

মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের পূর্বোক্ত গোপন বার্তায় কেবল নাশকতামূলক কাজ সম্পর্কেই আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক শক্তি বা সমরাভিযান বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের যেন কোন রকম ভয় ও উদ্বেগের কারণ ছিল না। এই আত্মসন্তুষ্টি পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজের পক্ষে হয়ত একেবারে অমূলকও ছিল না। কেননা ৪৫-এর শেষে আই. এন. এ-র যুদ্ধ প্রচেষ্টার সামগ্রিক খতিয়ান নিতে গিয়ে দেখা যায় যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আই. এন. এ. বড় রকমের কিছু

লাভ করতে পারেনি।—"The I.N.A. never amounted to very much in sheer military terms."[১৯] কিন্তু ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে মিলিটারি ইনটেলিজেন্স যখন উপরোক্ত বার্তা পাঠিয়েছিল তখন কোন্ হিসাবের ভিত্তিতে তারা আই. এন. এ-র সামরিক শক্তিকে ছোট করে দেখেছিল? এ কি শুধুই নিরস্ত্র পরাধীন জাতি সম্পর্কে বিজয়ীর উন্নাসিক আস্ফালন? পরের বছর যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে আই. এন. এ. এই উন্নাসিকতার সমুচিত জবাব দিয়েছিল। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে এই ফৌজের সংহার মূর্তি দেখে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ বাহিনীও থমকে গিয়েছিল। যেমন সুভাষ ব্রিগেড কর্তৃক আকিয়াবের কালাদান নদী সমীপবর্তী কায়ুকটাউ অঞ্চল অবরোধের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই এলাকায় আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণের মুখে ইংরাজের বহু প্রশংসিত নিগ্রো বাহিনীও পর্যুদস্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয় এখানকার যুদ্ধে আই. এন. এ-এর ১৪ জনের জীবনহানির পাশাপাশি বিপক্ষ দলের অন্তত ২৫০ জন মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। আবার ঐ একই বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণের তোড়ে মৌডাকের ব্রিটিশ সৈন্যরাও দিশাহারা হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল (মে ১৯৪৪)। মৌডাক অবরোধের সময় আই. এন. এ-র ক্যাপ্টেন সুরজ মল পরবর্তী সেপ্টেম্বার মাস পর্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্যদের ক্রমাগত আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। ইমফলের যুদ্ধেও ব্রিটিশ বাহিনী বড় সহজে জয় লাভ করতে পারেনি। ডিমাপুর এবং কোহিমা থেকে আগত ব্রিটিশ বাহিনীকে আজাদ হিন্দ ফৌজ বেশ ভালভাবেই মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিশ্বাসঘাতক জাপ সৈন্যদল আজাদ হিন্দ ফৌজকে পশ্চাদপসরণের জন্য চাপ না দিলে ব্রিটিশের পক্ষে এই অঞ্চলও ফিরে পাওয়া দুঃসাধ্য হত। একইভাবে গান্ধী ব্রিগেডও পালেল-এর যুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করেছিল। বিপক্ষ দলের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তাদের পর্যুদস্ত করে আজাদ হিন্দ ফৌজ এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বিমান ঘাঁটিটি দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। মাইথুন খুনু-এর যুদ্ধে অভিজ্ঞ গোলন্দাজ বাহিনী এবং তিন সহস্রাধিক সেনা সমভিব্যহারে ইংরাজ মাত্র ৬০০ আই. এন. এ. সৈনিকের মোকাবিলা করতে দিশাহারা হয়ে ওঠে। এই এলাকায় মনসুখ লাল মাত্র ৩০ জন সৈন্যের একটি প্লেটুনকে সম্বল করে ইংরাজদের হারিয়ে কয়েকটি পর্বত শৃঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চল ফৌজের দখলে রাখতে সমর্থ হন।

মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের বার্তায় এই রকম আভাসও দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু জাপান সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতবাসীই রীতিমত ভীত সেই কারণে জাপানের সহযোগী হিসাবে সুভাষচন্দ্র এবং আই. এন. এ-র ভারত অভিযানের ঘটনাকে অধিকাংশ ভারতবাসীই ভালো চোখে দেখবেন না। এই ধরনের ব্যাখ্যা কিছু অতি সরলীকৃত হলেও একেবারে অসত্য সে-কথা বলা চলে না। সকলেই

জানেন যে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক শক্তি তখন বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে না হলেও তারা সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ও জাপানের মত ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে তাঁর হাত মেলানোর ঘটনাকে সমর্থন করেনি। জাপান তথা ফ্যাসিগোষ্ঠীকে তারা সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের চেয়েও মানবতার বড় শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিল এবং এই কারণে তারা ইংরাজ বিরোধী স্বাধীনতার লড়াইকে আপাতত মুলতুবি রেখে ফ্যাসিশক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজ প্রমুখ মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে একযোগে জনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অধিকতর আগ্রহী ছিল। এই একই কারণে তারা গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' এবং সুভাষচন্দ্রের আই. এন. এ অভিযান—এই উভয় আন্দোলনেরই বিরুদ্ধাচারণ করেছিল।

কিন্তু একা কমিউনিস্টরাই নয়। ফ্যাসিবাদী শক্তিকে মদত দেওয়া হবে মনে করে কংগ্রেস এবং তার প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের আরও অনেকেই সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন। যেমন নেহেরু ১৯৪২ সালের ১২ এপ্রিলের দিল্লী সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টই ঘোষণা করলেন যে সুভাষচন্দ্র তাঁর আই. এন. এ. নিয়ে যদি কখনও ভারতের দিকে অগ্রসর হন তাহলে তিনি তাঁর বিরোধিতা করবেন কেননা তিনি বিশ্বাস করেন যে সুভাষের বাহিনী বস্তুত জাপানীদের ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছু নয়—"a dummy force under Japanese control"[২০] আর যে-গান্ধী ৪২ এর ৮ই আগস্টের প্রস্তাব নেওয়ার প্রাক্কালে বলেছিলেন, ইংরোজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলে জাপানীরা আমাদের গ্রাস করতে আসবে এমন সম্ভবনা যে ঘটবেই এ-কথা হলফ করে বলা যায় না, কেননা জাপানের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই সে-ই তিনিই কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে এ-কথাও বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্রকে আমাদের যে-করেই হোক ঠেকাতেই হবে— "In fact, I believe that Subhas Bose will have to be resisted by us"[২১] কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা ছাড়াও মানবেন্দ্র নাথ রায় এবং তাঁর অনুগামীরাও সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেননি।

কিন্তু এহ বাহ্য। কমিউনিস্ট বা কংগ্রেসীদের দলীয় রাজনীতি যা-ই হোক না কেন উভয় দলের বহু সাধারণ সদস্য তখন পার্টি ম্যানডেট অগ্রাহ্য করেই গোপনে সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ.-র প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল। বস্তুত ইংরাজের গোয়েন্দা পুলিশও কমিউনিস্টদের এই দ্বিচারিতার খবর জেনে ফেলেছিল। আর তাই বিহারের গভর্নর স্টুয়ার্ট বড় লাট লিনলিথগোকে হুঁশিয়ার করে খবর দিয়েছিলেন যে কমিউনিস্টরা মুখে ফ্যাসিবিরোধের কথা প্রচার করলেও তাদের বিশ্বাস নেই। কেননা তলে তলে তারা ঠিক এর বিপরীত কাজ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।[২২] আর কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা যেতে পারে। বাংলার মেদিনীপুর ৪২-এর আন্দোলন তথা গান্ধীর

একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু এখানকার তরুণ কংগ্রেস কর্মীরা শুধু যে গান্ধীকে আপোষকামী বলে মনে করত তা-ই নয়, তারা অন্তরে অন্তরে সুভাষচন্দ্রকেই অধিক মাত্রায় সমর্থন করেছিল। যুক্তপ্রদেশ (U.P) এবং বিহারেও অক্ষশক্তির বেতার সম্প্রচার বহু মানুষের কাছে গান্ধী অপেক্ষা সুভাষচন্দ্রকেই অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলেছিল।[২৩]

কংগ্রেস, কমিউনিস্ট বা মানবেন্দ্র নাথ রায়ের গোষ্ঠী তাত্ত্বিক বিচারে এবং যুক্তির খাতিরে সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ-র প্রতি হয়ত সমর্থন জানাতে পারেনি। এই সব যুক্তি ও তত্ত্বের যাথার্থ নিরূপণ করার প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। কেননা এই বিষয়ে ইতিপূর্বেই অনেক আলোচনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটা কথা সত্য যে পরাধীন দেশের অবমানিত জাতিসত্তা তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায় বিচার করে তার লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি নির্মাণ করে না। তার রণকৌশল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার দুঃসহ দাসত্ববোধের আবেগ ও আতিশয্য দ্বারাই নির্ণিত হয়। তাই রাজনীতির দলীয় মতাদর্শের হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা করে অগণিত সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী আই. এন. এ-র প্রতি তাদের অন্তরের টান প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এইভাবে গোপন বা এমন-কি অনেক ক্ষেত্রে সোচ্চার জন সমর্থন লাভ করা সত্ত্বেও আই. এন. এ. তার অভীষ্ট পূরণে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার অনেক কারণ ছিল। একটা বড় কারণ এই যে জার্মানীর সাহায্য পাবার আশায় সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ অবধি নিরর্থক বার্লিনে বসেছিলেন। রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য তিনি জার্মানীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু জাপান যাত্রা করতে তাঁর অসম্ভব দেরী হয়ে গেল (তাঁর নিজের দোষে নয়)। আর যখন তিনি সত্যই সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন জাপানের নিজেরই রাহুর দশা শুরু হয়ে গিয়েছে। মিলিটারি ইনটেলিজেন্স ঠিকই বলেছিল যে সুভাষচন্দ্র যদি আর কিছুদিন আগে অর্থাৎ আগস্ট আন্দোলনের সময় ভারত অভিমুখে যাত্রা করতে পারতেন তাহলেও হয়ত কিছুটা সুবিধা পাওয়া যেত। আসলে ৪২-এর কংগ্রেস এবং ৪৪এর সুভাষচন্দ্র উভয়েই এক ভুল করেছিলেন। যুদ্ধে মিত্রশক্তি হারতেই থাকবে এই দুর্দমনীয় আশায় উভয়েই অদৃষ্টের সঙ্গে জুয়ো খেলেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁদের কারও প্রতিই প্রসন্ন হননি। আগস্ট আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হয়েছিল আই. এন. এ-র ভারতাভিযান।[২৪]

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও সরকারী সিদ্ধান্তের নেপথ্য ইতিহাস

১৯৪৫ সালের মে মাস নাগাদ ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন পুনরায় দখল করে নেওয়ার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফৌজের সৈনিকদের কাছ থেকে তখন সমুদয় অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয় এবং অচিরেই তাদের সামরিক আদালতে বিচার করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্দী সৈনিকদের দিল্লীতে নিয়ে এসে লালকেল্লায় তাদের বিচারার্থে সামরিক আদালতে হাজির করা হয়েছিল (৫ নভেম্বর ১৯৪৫)।

কিন্তু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর তদনুযায়ী কাজ শুরু করতে ব্রিটিশ সরকারকে রীতিমত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বিজয়ীর ঔদ্ধত্যে (এবং সম্ভবত কিছুটা ব্রিটিশ লিবারেলিজমের আতিশয্যে) প্রকাশ্যেই কোর্ট মার্শালের কথা ঘোষণা করে নিজেদের সঙ্কট ঘনীভূত করেছিলেন। কেননা বিদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকলাপের কথা ভারতবর্ষে বিশেষ প্রচারিত হতে পারেনি। কিন্তু কোর্ট মার্শালের সংবাদ জানাজানি হওয়ার পর এবং বর্মা ফেরত ভারতীয় রিফুউজিদের মারফত আই. এন. এ সৈনিকদের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং বীরত্বের গৌরবগাথা ক্রমশঃ লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। এই সকল দেশপ্রেমিকদের সাধারণ ভাড়াটে সৈনিকদের মত বিচার করা হবে জেনে দেশের সর্বস্তরের মানুষ স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে সরকারী সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবীতে দেশের নানাস্থানে বিক্ষোভ ও জন অসন্তোষ দেখা যায়। কোর্ট মার্শালে প্রথম দফায় যে কয়জনকে বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন মুসলমান (শাহ নওয়াজ), একজন হিন্দু (প্রেম সেগল) এবং অপর একজন শিখ (গুরুবক্স সিং ধীলন)। সুতরাং ভারতবর্ষের তিন প্রধান ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সকলেই সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। তাছাড়া সরকারী মহল থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের জবরদস্তি সৈন্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মি ও সাধারণ সৈনিকদের বিক্ষোভের কথা যতই ফলাও করে প্রচার করা হোক না-কেন বর্মা পুনরায় দখল হবার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ যে রকম ব্যবহার করেছিলেন তাতে ইন্ডিয়ান আর্মির তিনটি অংশের (স্থল, বায়ু ও নৌ) অধিকাংশ সেনাই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। ফলত ফৌজের সঙ্গে

দেশের সর্বত্র সকল বিভাগের সৈনিকদের একটি অভূতপূর্ব সৌভ্রাত্রের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে একটি প্রখর রাজনৈতিক চেতনাও জাগ্রত হয়েছিল—"its result was a political consciousness which the Indian Serviceman had never before possessed."[১]

দেশের এই জাগ্রত জনমতের উত্তাপ অনুভব করে কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে তার পুরনো মনোভাব পরিবর্তন করে তাকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ-র ভারত অভিযান পরিকল্পনায় কংগ্রেসের রীতিমত আপত্তি ছিল এবং গান্ধী ও নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্র ভারতে এলে তাঁকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু কংগ্রেস যে-সময়ে আই. এন. এ বিরোধিতার কথা জাহির করেছিল ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে এ্যাটলীর লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হয় এবং সেই সঙ্গে ওয়াভেলকে ভারতের বড়লাট করে পাঠানো হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতকে অবিলম্বে স্বাধীনতা (তথা স্বায়ত্ত শাসন বা self-government) দেওয়ার প্রস্তাবটিও ঘোষিত হয়েছিল এবং এর প্রস্তুতি হিসাবে কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলিতে সত্বর নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল (২১ আগস্ট ১৯৪৫)। এমতাবস্থায় আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস আই. এন. এ-র পাশে দাঁড়িয়ে দলের অনুকূলে আজাদ হিন্দ ফৌজের জনপ্রিয়তাকে নির্বাচনে জেতার জন্য কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কোর্ট মার্শালের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের নেহরু, প্যাটেল, পন্থ প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাই আই. এন. এ-র সমর্থনে সর্বত্র জোর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে আই. এন. এ-র প্রতি কংগ্রেসের এই সহানুভূতির আতিশয্য আসলে দলের পক্ষে একটি নির্বাচনী চমক সৃষ্টি করার প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু নয়—"Much of what these leaders had said could be regarded as electioneering exuberance."[২]

আই. এন. এ-সম্পর্কে কংগ্রেসের এইরকম উচ্ছ্বাসের প্রকৃত কারণ সরকারী কর্তৃপক্ষ আরও নানারকম গোপন সংবাদ সূত্র মাধ্যমে টের পেয়েছিল। এই সকল সংবাদ মাধ্যমের সত্যাসত্য নিরূপণ করা বড় সহজ কর্ম নয়। কিন্তু সংবাদে প্রকাশিত গোপন তথ্যগুলি রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। সংবাদটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেন হরিচাঁদ বাধোয়ার-এর গোপন সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত এবং সেটির বিষয়বস্তু ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার

ইভান মেরিডিথ জেংকিন্স, সেক্রেটারী অফ স্টেটস-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ফ্রান্সিস ফিরোন টার্নবুলকে একটি চিঠি (তাং ২৫ অক্টোবার ১৯৪৫) লিখে জানিয়ে দেন। চিঠিখানি গোপনীয় বলে মার্কা করা হয়েছিল এবং এর গোড়াতেই সাক্ষী হরিচাঁদের নাম যাতে প্রকাশ করা না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হরিচাঁদের সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্তসার হল এই যে, আই. এন. এ সম্পর্কে নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গোড়ার দিকে কোন রকম সহানুভূতি ছিল না। নেহরু আই. এন. এ বন্দীদের মুক্তি দাবী করা সত্ত্বেও তাদের 'বিপথচালিত মানুষ' ("misguided men") এবং "তাদের নানা রকম ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও" ("whatever errors and mistakes they had commited") ইত্যাদি মন্তব্যগুলি প্রায়শই আই. এন. এ বন্দীদের সম্পর্কে প্রয়োগ করতেন। বস্তুত আই. এন. এ. সম্পর্কে দলীয় নীতি নির্ধারণ করার আগে কংগ্রেস বেশ ভেবে চিন্তে অগ্রসর হয়েছিল। কংগ্রেসের আসফ আলিকে প্রথমে গোটা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে এসে এঁদের সম্পর্কে দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ কি ভাবছে সে বিষয়ে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছিল। আসফ আলি এই রকম সরেজমিন অনুসন্ধান করার সময় আই. এন. এ-র বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করলে কংগ্রেস তখন আই. এন. এ-কে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়। হরিচাঁদ এ-কথাও বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে কংগ্রেস মুখে যা-ই বলুক না কেন সে যদি আই. এন. এ-র বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ না পেত কিংবা ইংরাজদের বদলে তারাই যদি ক্ষমতাসীন থাকত তাহলে কংগ্রেস নিজেও ফৌজি সেনাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হত। হরিচাঁদ জানায় যে আই. এন. এ সৈনিকদের সম্পর্কে কংগ্রেসের আদৌ কোন উচ্চ ধারণা ছিল না এবং কংগ্রেসের এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা দলের প্রভাবশালী নেতা স্বয়ং আসফ আলিই ১৮ই অক্টোবার (১৯৪৫) তারিখের প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা ব্যাপী এক দীর্ঘ আলোচনার অবকাশে তাঁকে নিজ মুখে জ্ঞাপন করেন। আসফ আলির এবম্বিধ বক্তব্যে বিস্মিত হয়ে হরিচাঁদ তাঁকে বলেন যে আই. এন. এ সম্পর্কে কংগ্রেসের এরূপ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যথার্থ স্বরূপ এখন কংগ্রেসের প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা উচিত। কিন্তু আসফ আলি নাকি তখন হরিচাঁদকে বলেছিলেন যে এমন কাজ করলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা নষ্ট হবে। আসফ আলির উল্লেখিত মন্তব্যের উপর টিপ্পনী করে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার টমাস ওয়াকার বয়েজ লেখেন যে আসফ আলির মন্তব্যে কংগ্রেসের সর্বজনবিদিত সুবিধাবাদী রাজনীতিই প্রকট হয়ে উঠেছিল।[৩]

আসফ আলি আই. এন. এ. ডিফেন্স কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মিলিটারী ইনটেলিজেন্স বিভাগ কর্তৃক

সংগৃহীত উপযুক্ত সংবাদটি হয়ত চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু তা হলেও কংগ্রেসের আই. এন. এ প্রীতি যে সর্বতোভাবে নিখাদ ছিল না সে বিষয়ে সরকারী মহলের আরও অনেক পদস্থ রাজপুরুষও নিঃসন্দেহ ছিলেন। এমন কি বড়লাট ওয়াভেল পর্যন্ত ১৯৪৫ সালের ২৭ এ নভেম্বর তারিখে তাঁর ডায়েরীতে এ-কথা লিখে যান যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের গভর্নর তাঁকে জানিয়েছেন যে সেখানকার প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতা ডাঃ খান সাহেব সহ কংগ্রেসের আরও অনেকেই তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে কবুল করে গিয়েছেন যে আই. এন. এ বন্দীদের যদি রেঙ্গুন অথবা সিঙ্গাপুরেই ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলা হোত তাহলে তাদের কোর্ট মার্শালকে কেন্দ্র করে এত হাঙ্গামা সৃষ্টি হত না। গভর্নর কানিংহাম আক্ষেপ করে লিখেছেন যে দুর্ভাগ্যবশত কংগ্রেসের এবম্বিধ দৃষ্টিভঙ্গি এখন সমূহ পরিবর্তিত হয়েছে।[৪]

আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করবার নীতি গ্রহণ করেছিল। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ মারফত খবর পাওয়া গিয়েছিল যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং অপরাপর সাংবিধানিক বিষয় সংক্রান্ত কংগ্রেসের দাবীগুলি পূরণ করতে অস্বীকৃত হয় তাহলে কংগ্রেস ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই দেশজুড়ে এক ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করবে। সেই আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে ইতিমধ্যেই বর্মা থেকে চোরা পথে বহু পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়েছে। এই সব অস্ত্রের সাহায্যে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছিল যে নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এইভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে ভারতবর্ষব্যাপী একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।[৫]

কংগ্রেসের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে ভারত সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্সও সবিশেষ আতঙ্ক বোধ করেছিলেন। বছরের শেষ দিকে তিনি বড়লাট ওয়াভেলকে একটি গোপন চিঠিতে এই মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে কংগ্রেস নানাভাবে সরকারকে তার দাবীসমূহ পূরণ করবার জন্য চাপ দিয়ে চলেছে। এই দাবীগুলি না মেটানো হলে এই দল সম্ভবত সামনের বসন্তকালের মধ্যেই অচলাবস্থার সৃষ্টি করে প্রশাসন ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে পারে।[৬]

আই. এন. এ-র কোর্ট মার্শালকে উপলক্ষ করে শুধু যে কংগ্রেস একা প্রতিবাদ জানিয়েছিল তা নয়। বস্তুত ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই দল মত

নির্বিশেষে আই. এন. এ-র সমর্থনে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সামিল হবার উদ্যোগ নিয়েছিল। ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর ২০ নভেম্বার ১৯৪৫ তারিখে প্রস্তুত একটি গোপন নোটে জানিয়েছিলেন যে কংগ্রেসের দেখাদেখি মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরাও বন্দীমুক্তির দাবীতে আই. এন. এ দিবস উদযাপন করে দেশের সর্বত্র ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছিল। মধ্য পাঞ্জাবে শিখেরা এই ব্যাপারে গ্রামের মানুষদের খেপিয়ে তুলেছিল। আর গ্রামাঞ্চলে হিন্দু মহাসভার প্রভাব কম হওয়া সত্ত্বেও তারাও কিন্তু আন্দোলন সৃষ্টিতে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[৭] ওয়াভেল সেক্রেটারী অফ স্টেটস-এর কাছে ৯ অক্টোবর ১৯৪৫-এ লেখা একটি গোপন নোটে জানান যে আই. এন. এ-র সমর্থনে প্রথমে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করলেও মুসলিম লীগ এবং পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলও অনতিবিলম্বে ঐ একই আন্দোলনের যোগ দিয়েছিল।[৮]

দেশব্যাপী এই তুমুল বিক্ষোভ ও গণ-অসন্তোষের সম্মুখে ব্রিটিশ সরকার কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে প্রথম থেকেই বেশ ভীত বোধ করেছিলেন। বস্তুত সরকার একটি উভয় সঙ্কট পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। যুদ্ধজয়ের গর্বে এবং বিজয়ীর প্রতিহিংসা মানসিকতার বশবর্তী হয়ে ইংরাজ ভারতীয় রাজনীতির জটিল পরিস্থিতি সম্যকরূপে অনুধাবন না করেই কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে কর্তৃপক্ষ দমন করতে পেরেছিলেন এবং সেই ভরসাতে তারা ভেবেছিলেন যে আই. এন. এ বন্দীদেরও তাঁরা একইভাবে শাস্তি বিধান করতে পারবেন। ১৯৪২-এ সরকার অবলম্বিত সিংহসুলভ প্রতিহিংসা (leonine violence) কর্তৃপক্ষকে আই. এন. এ-র বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল। তাছাড়া সরকারের তরফে একটা মনগড়া শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদও এই রকম কঠোরতা অবলম্বন করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে আই. এন. এ বন্দীদের শাস্তি বিধান করতে অসমর্থ হলে ইন্ডিয়ান আর্মির রাজভক্ত সৈনিকদের (যাঁরা আই. এন. এ-কৃত তথাকথিত অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও ব্রিটিশ পক্ষে রয়ে গিয়েছিল) প্রতি অবিচার করা হবে এবং সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে আর কখনও বশে রাখা যাবে না। কিন্তু তাঁরা ভাবতে পারেন নি যে ইংল্যান্ডে লেবার দল ক্ষমতাসীন হবে এবং ভারতবর্ষও অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা লাভ করতে চলেছে। এমতাবস্থায় যে-ভারতবর্ষে রাজ-এর অস্তিত্বই ক্ষণস্থায়ী সেখানে আর্মিকে রাজানুগত রাখার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ব্রিটিশের বিচারে বন্দীরা শাস্তি পাবার পরেও কংগ্রেস যখন নিকট ভবিষ্যতে ব্রিটিশের উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বাধীন ভারতে ক্ষমতাসীন হবে

তখন স্বাধীন ভারত সরকার শাস্তি প্রাপ্ত প্রতিটি বন্দীকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে দেবে। সুতরাং আই. এন. এ সম্পর্কে যাহোক একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে সরকার ক্রমশই দ্বিধা বোধ করেছিলেন। অপিচ গোয়েন্দা দপ্তর থেকে ক্রমাগত সাবধানবাণী দেওয়া হচ্ছিল যে আই. এন. এ ইস্যুতে ৪৬ সালের বসন্তকালের মধ্যেই একটা ব্যাপক বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় ভারত থেকে পাততাড়ি গোটানোর সময়ে কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অকারণ জিদের বশবর্তী হয়ে সঙ্কট ঘনীভূত করার কোনো মানে নেই। ইংরাজ সরকার তাই বন্দীদের সম্পর্কে একটা নরম মনোভাব গ্রহণ করে কোনক্রমে তাদের মুখরক্ষা করতে চেয়েছিল। আসলে সরকার একটা মধ্যপন্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিল যাতে কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্ত আগাগোড়া প্রত্যাহার করে না নিয়েও সরকার জনরোষকে প্রশমিত করতে সমর্থ হয়।

আই. এন. এ বন্দীদের কোর্ট মার্শাল সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষের জন মানসে সৃষ্ট তীব্র প্রতিক্রিয়ার নিরিখে ভারতস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাই সেক্রেটারী অফ স্টেটসকে কোর্ট মার্শাল শুরু হওয়ার প্রায় আড়াই মাস আগে একটি গোপন রিপোর্ট পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১১ই আগস্ট তারিখের এই রিপোর্টটি গভর্নর জেনারেলের সমর বিভাগের পক্ষ থেকে লিখিত হয়েছিল। রিপোর্টের প্রথম দুটি অংশে (Part I and Part II) আই. এন. এ বন্দীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত তথাকথিত অপরাধ সমূহের গুরুত্ব অনুসারে তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তদনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণীর জন্য আলাদা রকম শাস্তি বিধান করার কথাও বলা হয়েছিল। রিপোর্টের একেবারে শেষ অংশে (Part III) গভর্ণর-জেনারেলের প্রস্তাবটি কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হবার পর আই. এন. এ সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্তটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ইশতেহার (communique) জারি করে ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল। ইশতেহারের মূল বয়ানের একটি খসড়াও রিপোর্টে করে দেওয়া হয়েছিল। রিপোর্টটি IMMEDIATE. SECRET মার্কা করে গভর্নর-জেনারেলের ওয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি দীর্ঘ টেলিগ্রাম মারফত সেক্রেটারী অফ স্টেটসের কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং সেটি পরদিন অর্থাৎ ১২ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে সেক্রেটারী অফ স্টেটসের হস্তগত হয়েছিল।[৯]

রিপোর্টের প্রথম ভাগে I.N.A এবং ৯৫০ নং রেজিমেন্টের জাপান অনুগত পঞ্চম বাহিনী বা সংক্ষেপে J.I.F. (Japanese inspired fifth columnist) এবং হিটলার অনুগত পঞ্চম বাহিনী বা সংক্ষেপে H.I.F. (Hitler inspired fifth columnist) -এর বন্দীদের নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। যথা :—

১) BLACKS : যে-সকল সেনাবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং যাদের মুক্তি দিলে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের সকলকেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

২) GREYS : যারা স্বভাবত আনুগত্যহীন নয়, কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত শত্রু শিবিরে যোগ দিয়েছিল তাদের এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৩) WHITES : যাদের আনুগত্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তারাই কেবল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছিল।

রিপোর্টে Black শ্রেণীর সকল বন্দীদের সরাসরি কোর্ট মার্শাল করবার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই শ্রেণীর মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত হবেন রিপোর্টে সেই বিষয়েও একটি সম্ভাব্য নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তালিকায় নিম্নলিখিত পদমর্যাদার শিবিরত্যাগী ব্যক্তিদের নাম রাখা হয়েছিল—

ক) ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার

খ) ভাইসরয়েজ কমিশনড অফিসার্স বা সংক্ষপে V.C.O.-দের মধ্যে যারা আই. এন. এ.-তে যোগদান করেছিলেন।

গ) যে-সকল V.C.O ৯৫০ নং রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন।

ঘ) যারা প্রথমেই ইংরাজ পক্ষ ত্যাগ করে শত্রুশিবিরে স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়েছিলেন অর্থাৎ যারা যুদ্ধবন্দী হওয়ার দরুণ ইংরাজ পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে দাবী করতে পারবেন না।

ঙ) ইন্ডিয়ান আদার র‍্যাঙ্কস বা সংক্ষেপে I.O.R.-এর সেই সকল সদস্য যারা ৯৫০ নং রেজিমেন্টে অফিসার বা আন্ডার অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন।

চ) যারা যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্যত্র ব্রিটিশ অথবা মিত্রশক্তির কোন প্রজার প্রাণনাশে সহযোগিতা করেছিলেন।

ছ) যারা J.I.F অথবা H.I.F কিংবা মিত্রশক্তি বাহিনীর কোন সদস্যের উপর নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

জ) যারা ব্রিটিশ বা মিত্রশক্তির কোন প্রজাকে গ্রেপ্তার করে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করেছেন।

ঝ) I.O.R.-এর যে-সকল সদস্যরা আই. এন. এ-র অফিসার হিসাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন কিংবা শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করেছেন, এবং

ঞ) যারা জাপানী সেনাপ্রধান ফু৷ স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলেন (Fujwara volunteers)।

রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে Black হিসাবে যাদের পংক্তিভুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৬০০ জনের বিরুদ্ধে চার্জ শিট এনে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে। আরও ১৪০০ জন এমন বন্দী আছে যাদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সাক্ষীসাবুদ (evidence) পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে তাদের বিচারার্থে চালান করা সহজ সাধ্য নয়। এছাড়া আরও ৫৬০০ জন এমন Black পর্যায়ের বন্দী আছে যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ মোতাবেক বিচার কর্ম শুরু করা সম্ভব না হলেও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যাদের ১৯৪৪ সালের ৪নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে জেলে অন্তরীণ করে রাখা উচিত। রিপোর্টে বলা হয় Black বন্দীদের অপরাধ প্রমাণিত হলে আদালতের পক্ষে তাদের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা মৃত্যুদন্ড বিধান করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকবে না। অবশ্য আইন অনুযায়ী সেনাপ্রধান এই দন্ডাজ্ঞা অনুমোদন করার সময়ে তাঁর বিবেচনামত এই শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে কেবল কারাবাসের হুকুমও জারি করতে পারেন। কিন্তু সেনাপ্রধানের হাতে শাস্তি মুকুব করার এই রকম ক্ষমতা দেওয়া হলেও শাস্তিদানের ক্ষেত্রে সর্বত্র একই রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান খুব সীমিত ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত। রিপোর্টে নিম্নলিখিত আটটি ক্ষেত্রেই কেবল মৃত্যুদন্ডের বিধান বহাল রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল।

ক) যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্যত্র কোন ব্রিটিশ বা মিত্রগোষ্ঠীর নাগরিকদের মৃত্যু ঘটানোর জন্য যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী বলে সাব্যস্ত হবেন।

খ) কোন ব্রিটিশ বা মিত্রগোষ্ঠীর নাগরিকের উপর নিষ্ঠুর ব্যাবহার করার জন্য যিনি দায়ী বলে মনে করা হবে।

গ) কোন ব্রিটিশ বা মিত্রগোষ্ঠীর নাগরিককে যিনি পাকড়াও করে শত্রুপক্ষের কাছে ধরিয়ে দিয়েছেন।

ঘ) V.C.O. অথবা I.O.R প্রমুখ প্রবীণ অফিসারদের অন্তত দশজনকে নিয়ে গঠিত যে দলটি আই. এন. এ-তে যোগ দিয়েছে।

ঙ) সুভাষচন্দ্র গঠিত অস্থায়ী ভারত সরকারের সদস্য হিসাবে যিনি নিযুক্ত হয়েছেন।

চ) ইন্ডিয়ান আর্মির মেজর বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের যে-সকল অফিসার আই.এন.এ.-তে যোগ দিয়ে মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে বাধা দান করেছেন।

ছ) আই. এন. এ-র কর্ণেল বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের যে-সকল অফিসার মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ভাবে বাধা সৃষ্টি করেছেন, এবং

জ) যে-সকল অফিসার ও V.C.O. ফুজিয়ারা ভলান্টিয়ার হিসাবে যোগ দিয়েছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে সব দিক দিয়ে হিসেব করে মনে হয় যে আনুমানিক ৫০ জনকে শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে হতে পারে। এদের ছাড়া বাকী সকলের ক্ষেত্রে বেতন বন্ধ বা ছুটি, পেনসন, গ্র্যাচুইটি প্রভৃতি বাতিল করা ইত্যকার শাস্তি বিধান করাই যথেষ্ট হবে।

রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগে GREY এবং WHITE পর্যায়ের বন্দীদের সম্পর্কে কিরকম ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। Grey বন্দীদের হয়ত বাছাই করে সেনাবাহিনীতে রেখে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অনুগত সদস্যদের মনে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে এবং এই কারণে তাদের সরাসরি সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তাদের ছুটি এবং অবসরকালীন অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলিও অংশত বাতিল করার কথা ভাবা হয়েছিল। White বা রাজানুগত সৈনিকদের সম্পর্কে কিছু বলার ছিল না! তাদের শত্রু শিবির থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সৈনিকদের মত পুনর্বাসন দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাদের সকলকেই ইন্ডিয়ান আর্মিতে ফিরিয়ে আনা হবে। রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগের শেষ প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছিল যে J.I.F. এবং H.I.F.-দের মধ্যে যারা শত্রুপক্ষ বা তাদের উর্ধ্বতন অফিসারদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের প্রতি সাধারণভাবে সদয় ব্যবহার করার জন্যই প্রস্তাব করা হয়েছে। যে-সকল ঘটনা বিবেচনা করে এই রকম সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি বিবৃত করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যাতে সত্বর একটি প্রেসবিবৃতি দিতে পারেন সেজন্য এই বিবৃতির (Communique) একটি খসড়া (Draft) রিপোর্টের তৃতীয় বা শেষভাগে সংযোজন করা হয়েছিল। আই. এন. এ. সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি যাতে সুস্পষ্টভাবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা যায় সেজন্য সরকারের প্রস্তাবিত প্রেস বিবৃতির বয়ানটির ভাবানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

যে সকল সাধারণ সৈনিক চাপের মুখে বা অন্যভাবে বিভ্রান্ত হয়ে শত্রুপক্ষ দ্বারা সংগৃহীত সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল ভারত সরকার তাদের প্রতি সহৃদয় ও সদয় ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এবং বিশেষত যারা নানারকম গর্হিত কর্মের জন্য দায়ী তাদের সকলকেই আইন মোতাবেক কোর্ট মার্শালে বিচার করা হবে। যুদ্ধের সময় শত্রু শিবিরে যোগ দিয়ে নিজের প্রাক্তন দলের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যে-কোন সৈনিকের পক্ষে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। সব দেশের আইনেই এই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সুতরাং যারা এমন অপরাধ করার পর পুনরায় ধরা

পরেছে তারা কোনমতেই যুদ্ধমান সৈনিক তথা বেলিজারেন্ট এবং যুদ্ধবন্দী তথা P.O.W (Prisoner of war)-এর অধিকার দাবী করতে পারেনা। ভারত সরকার অবশ্য জানেন যে মালয় এবং বর্মার পতনের পর সাধারণ সৈনিকেরা একটা সঙ্গিণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেদিন থেকে জাপানের মিথ্যা প্রচারের রিপোর্ট ভিন্ন যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন খবরই তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। ফলত তাদের মধ্যে অনেকেই মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে কিংবা চাপের মুখে অথবা একটু সদয় ব্যবহার পাওয়ার আশায় নিদেন একটু স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রত্যাশায় শত্রু শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। এই সকল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভ্রান্ত সৈনিকদের প্রতি অবশ্যই দয়া প্রদর্শন করা হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে যারা সৈনিকদের নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে সহযোদ্ধাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাদের ইন্ডিয়ান আর্মিতে আর কিছুতেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। সুতরাং এদের সকলকেই সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করতেই হবে। তবে অনুকম্পার নিদর্শন হিসাবে তাদের ৪২ দিনের জন্য ছুটি দিয়ে সেই সময়ের পুরো বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর জাপানীদের হাতে বন্দী হওয়ার সময়ে বা যে কয়দিন তারা জাপানের কাছ থেকে বেতন পেয়েছেন সেই সময়ে ইংরাজ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পরিবারবর্গকে ভাতা হিসাবে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই অর্থ তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে না।

শত্রুপক্ষে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের অধিকাংশ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নীতি উপরে ব্যক্ত করা হল। কিন্তু এরা ছাড়াও এমন আরও অনেকেই রয়েছে শত্রুপক্ষের প্রচার যাদের এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে তাদের সত্বর মুক্তিদান করলে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে। এই সব লোকেদের সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করে যতদিন-না তাদের নির্বিঘ্নে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় ততদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখা প্রয়োজন। "But there are some who were so inbued with enemy propaganda that their immediate release would be a danger to security . These men will be dismissed from the Army and kept in detention until they can safely be released." এরা ছাড়াও এমন আরও অনেকে আছে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রমাণ করা গেলে তাদের ক্ষমার অযোগ্য বলেই মনে করা যেতে পারে। এদের মধ্যে আছে সেই সকল ব্যক্তি যারা প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের হত্যা করেছে কিংবা যারা মিত্রপক্ষের সৈন্যদের ধরিয়ে দিয়েছে অথবা তাদের নিপীড়ণ করেছে এবং সেই রকম কিছু নেতৃস্থানীয় লোক যারা দৃশ্যত স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই জাপ শিবিরে যোগ দিয়েছিল। এদের সম্পর্কে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না— এদের সকলের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের বিচার শুরু করা দরকার।

প্রসঙ্গত উপরে উল্লেখিত সৈনিকদের পাশাপাশি সেই সব বীর সেনাদের সাহস ও শৌর্যের গৌরবময় কীর্তি স্মরণ করা উচিত যাদের অধিকাংশই যুদ্ধের বন্দী দশার মধ্যেও নিজেদের আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন।

উপরোক্ত বয়ানটি ১৮ই আগষ্টের সপার্ষদ ভাইসরয় বৈঠকে আলোচনা করা হবে বলে স্থির করা হয়েছিল। এই কারণে এই রিপোর্ট ও বয়ান সম্পর্কে সেক্রেটারী অফ স্টেটসকে তাঁর মতামত উল্লেখিত দিনের আগেই টেলিগ্রাম মারফত জানাতে অনুরোধ করা হয়েছিল।

রিপোর্টে যে কথা বারে বারেই বলা হয়েছিল তা হল এই যে কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী আই. এন. এ-র Black বন্দীদের সংখ্যা এত বেশি হতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল যে তাদের সকলকে কোর্ট মার্শাল করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ভারতস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাই প্রথম দফায় এদের মধ্যে ৬০০ জনের বিচার শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা আরও ৭০০০ Black সেনা যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পুরোপুরি সগ্রেহ করা যায়নি তাদের সকলকেই ১৯৪৪ সালের ৪নং অর্ডিন্যান্স মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনা বিচারে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিল। কর্তৃপক্ষের অজুহাত ছিল এই যে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এদের বিরুদ্ধে চার্জ শিট তৈরী করা না গেলেও এদের সকলকেই কারাবন্দী করে রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু সেক্রেটারী অফ স্টেটস পেথিক-লরেন্স ওয়ার ডিপার্টমেন্টের এ ধরনের যুক্তি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সমর বিভাগের কাছ থেকে জানতে চান যে জাপানের আত্মসমর্পনের পরেও দেশের নিরাপত্তার পক্ষে এমন কি ভয়ঙ্কর বিপদের কথা তাঁরা আশঙ্কা করেছেন যাতে ৭০০০ লোককে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা অপরিহার্য বলে মনে হতে পারে? বড়লাট লিখেছিলেন, যে—৬০০ জনকে ইতিমধ্যে বিচারকর্মের আওতায় আনা হয়েছে এবং তারা ছাড়াও আরও ১৪০০ জন এমন Black সেনা রয়েছেন যাদের নানারকম বাস্তব অসুবিধার জন্য বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। পেথিক-লরেন্স বড়লাটকে এই বাস্তব অসুবিধাগুলি তাঁকে সবিস্তারে জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি এ-কথাও বলেন যে Black সেনাদের সম্পর্কে সব খবর ভালভাবে না জেনে তাঁর পক্ষে ৭০০০ লোককে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার জন্য মন্ত্রিসভার কাছে সুপারিশ করা সম্ভব হবে না।[১০]

সেক্রেটারী অফ স্টেটসের প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে সমর বিভাগের পক্ষ থেকে ২১ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে আবার একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল।[১১] ওয়ার ডিপার্টমেন্ট জানালেন যে দুই খেপে ৬০০ এবং ১৪০০, অর্থাৎ মোট ২০০০

জন Black সেনাদের বিচার যদি এই মুহূর্তেই শুরু করা যায় তাহলে অন্তত এক বছরের মধ্যেই বিচারের রায়দানও সম্পূর্ণ করা উচিত। সেক্ষেত্রে পাঁচটি আদালত বসিয়ে একটানা ১২ মাস কাজ চালাতে হলে অন্তত ২৫০ জন বিচারক এবং আইনের জ্ঞান সম্পন্ন আরও অনেক সামরিক অফিসারকে প্রসিকিউটর হিসাবে এখনই নিযুক্ত করতে হয়। তাছাড়া এইভাবে কাজ চালালে প্রতি সপ্তাহে অন্তত ৪০টি মামলার রায় অনুমোদন করানোর জন্য সেনাপ্রধানের কাছে পাঠাতে হবে। এই রকম এলাহি ব্যাপার সামলানোর মত প্রয়োজনীয় লোকবল ভারত সরকারের নেই। ওয়ার ডিপার্টমেন্ট আরও জানায় যে জাপানের আত্মসমর্পণের পর ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে হয়ত তেমন কোন আশংকার কারণ নেই। কিন্তু তা হলেও সুভাষচন্দ্র অনুগত প্রায় ৭০০০ Black সেনাদের সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা মনে রেখে প্রাদেশিক গভর্ণরদের কেউ-ই তাদের একেবারে মুক্তি দেওয়ার পক্ষপাতী নন। এই সকল প্রাদেশিক গভর্ণরদের মতামত জানবার জন্য ১৪ এবং ১৫ আগস্ট তারিখে তাঁদের নিয়ে পর পর দুদিন বৈঠক করা হয়েছিল। এই বৈঠকে অধিকাংশ গভর্ণর এই মর্মে অভিমত দেন যে বন্দী Black সেনাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি বিভিন্ন রিভিউ কমিটির মাধ্যমে খেপে খেপে যাচাই করার পর তবেই তাদের মুক্তিদান সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অর্থাৎ রিভিউ করার কাজ যতদিন না সম্পন্ন হয় ততদিন পর্যন্ত এদের জেলে বন্দী রাখাই শ্রেয়। সমর বিভাগ তাদের ১১ আগস্ট তারিখে প্রেরিত রিপোর্টের প্রস্তাবগুলির যৌক্তিকতা আরও একবার ব্যাখ্যা করে বলে যে আই. এন. এ বন্দীদের সম্পর্কে সরকারকে খুব সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ইন্ডিয়ান আর্মির যে-সকল সৈনিক আই. এন. এ সেনাদের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন তাদের কথা মনে রেখে সমস্ত Black বন্দীদের একেবারে বেকসুর খালাস দেওয়া সঙ্গত হবে না। আবার যে-সকল Grey বন্দী পরিস্থিতির শিকার হয়ে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন তাদের কথাও মনে রাখা দরকার। ভুললে চলবে না যে সুভাষচন্দ্রকে অনেকেই বিপথচালিত বলে মনে করলেও অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে তিনি দেশপ্রেমিক হিসাবে রীতিমত জনপ্রিয় এবং তাঁর আই. এন. এ-এর বিরুদ্ধে যদি সরকার কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে ভারতবাসীর গরিষ্ঠ অংশ সবিশেষ আহত হবে। এমতাবস্থায় একমাত্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর) পরেই কেবল আই. এন. এ সম্পর্কে একটি সন্তোষজনক নীতির রূপরেখা নির্মাণ করা সম্ভব। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তা নাহয় ততদিন সরকারের পক্ষে একটা মধ্যপন্থার নীতি গ্রহণ করাই সবচেয়ে ভাল। অর্থাৎ আই. এন. এ-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যেমন শাস্তিবিধান করা উচিত তেমনই বিপথগামী দুর্বলচিত্ত

সৈনিকদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা দরকার। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ততা এবং সামাজিক শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে সন্দেহভাজন আই. এন. এ সেনাদের জেলে বন্দী রেখে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির সত্যাসত্য যথাসম্ভব সত্বর খতিয়ে দেখা উচিত। টেলিগ্রামের একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে সমর বিভাগ আই. এন. এ বন্দীদের সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যথাসত্বর সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেছিল। তাঁরা বলেন যে ভারতীয় রাজনীতিকগণ এবং বিশেষত গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু আই. এন. এ. সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে সত্বর জানিয়ে দেন তাহলে সরকারী নীতি সম্পর্কে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি এই ব্যাপারে অকারণে দেরী করেন তাহলে ইতিমধ্যে জনমত সংগঠিত হয়ে বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়তে পারে এবং তখন কর্তৃপক্ষের তরফে শেষমেষ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সরকারকে হয়ত রক্ষণাত্মক ভূমিকাই গ্রহণ করতে হতে পারে। অতয়েব ২৬ আগস্টের মধ্যেই সরকারের পক্ষ থেকে যাতে একটা প্রেস বিবৃতি জারি করা যায় সেজন্য সেক্রেটারী অফ স্টেটস পেথিক-লরেন্সকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল।

উপরোক্ত টেলিগ্রামটি বড়লাটকে দেখিয়ে নিয়ে ওয়ার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ২১ আগস্ট তারিখে বিলাতে পাঠানো হয়েছিল। এর ঠিক দু'দিন বাদে সেক্রেটারী অফ স্টেটসের পক্ষ থেকে ২৩ তারিখে ওয়ার ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হল যে ভাইসরয় এবং প্রাদেশিক গভর্নররা আই. এন. এ-এর এক বিপুল অংশকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার সপক্ষে যা-ই বলুন না কেন সেক্রেটারী অফ স্টেটসের পক্ষে এ ধরনের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করা মোটেও সম্ভব নয়। তবে অভিযুক্তদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজনে তাদের কিছু দিনের জন্য সামরিক হেপাজতে বন্দী করে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে রাজী আছেন।[১২]

অতঃপর ১১ই আগস্টে ওয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রেস কমিউনিকের যে খসড়াটি করে দেওয়া হয়েছিল সেখানে বিনা বিচারে আটক করা সম্পর্কিত গোটা প্রস্তাবটি বাদ দিয়ে খসড়াটির বাকী অংশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তটি গৃহীত হওয়ার পরে আই. এন. এ-র বিচারকে কেন্দ্র করে আবার নানারকম জটিলতা দেখা দেয় এবং তখন সরকার এই বিষয়ে আবারও নোতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আই. এন. এ. ডিফেন্স কমিটির দুই প্রভাবশালী সদস্য ভুলাভাই দেশাই ও আসফ আলি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ই অক্টোবার ১৯৪৫ তারিখে বড় লাট ওয়াভেলের কাছে এক স্মারক পত্র পেশ করার পর পরিস্থিতির এইরকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।[১৩] এই স্মারকপত্রে আই. এন. এ-কৃত তথাকথিত অপরাধ সমূহের সত্যাসত্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না তুলে শুধু এইমাত্র বলা হয়েছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করে কোন অপরাধ করেই থাকে তাহলে তা প্রধানত ভারতবাসীর বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য হওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে ভারতবাসীর মতামত যাচাই না করে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ একতরফা ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা ন্যায়সঙ্গত হবে না। স্মারকপত্রে একথাও বলা হয়েছিল যে আগামী বছরের (১৯৪৬) এপ্রিল মাসের মধ্যেই কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ভাইসরয়ের কর্মপরিষদ (Executive council) নোতুন করে গঠিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আই. এন. এ সম্পর্কে বর্তমান কর্তৃপক্ষ (যার আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে নব নির্বাচিত মন্ত্রিসভা এবং নবগঠিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের উপরেই এই দায়িত্ব অর্পণ করলে ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা পায়। স্মারকপত্রে তাই সরকারকে হয় আই. এন. এ-এর বিচার পুরোপুরি বাতিল করতে নয়তো নোতুন মন্ত্রিসভার গঠন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়েছিল।

এইরকম নোতুন পরিস্থিতিতে ভারত সচিব বিচারার্থে প্রেরিত আই. এন. এ. বন্দীদের প্রতি কতটা ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত অথবা তাদের সম্পর্কে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা উচিত কি-না সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তটি বিবেচনা করার জন্য ভারত ও বার্মা কমিটির কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করেন।[১৪] এই স্মারকপত্রে বলা হয়েছিল যে প্রাথমিক বিবেচনার পর দেখা গিয়েছে যে আই. এন. এ-তে মোট ২৫৬৫ এবং ৯৫০ নং রেজিমেন্টে মোট ৩০০০ জন Black পর্যায়ের বন্দী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেন। এদের মধ্যে ১০টি বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৮০৪ জন Black বন্দীকে কোর্ট মার্শালে সোপর্দ করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ মজুত থাকলেও বাস্তব কারণে নিম্নলিখিত ৪ প্রকারের মোট ২৪৫ জনের বিরুদ্ধেই কোর্ট মার্শাল দন্ডাজ্ঞা প্রয়োগ করা সঙ্গত হবে বলে মনে করা হচ্ছে, যথা—

ক্রমিক সংখ্যা	অপরাধীদের বিবরণ	মোট সংখ্যা
১)	যুদ্ধক্ষেত্র বা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে যারা ব্রিটিশ/মিত্রপক্ষের লোককে হত্যা করেছেন	৬০
২)	যারা ব্রিটিশ/মিত্রপক্ষের লোককে বর্বরোচিত ভাবে নিপীড়ণ করেছেন	৯২

ক্রমিক সংখ্যা	অপরাধীদের বিবরণ	মোট সংখ্যা
৩)	যারা ব্রিটিশ/মিত্রপক্ষের লোককে শত্রুপক্ষের কাছে ধরিয়ে দিয়েছেন	৫৩
৪)	অন্তত দশজন প্রবীণ V.C.O/I.O.R-এর যে-দল ইন্ডিয়ান আর্মি ত্যাগ করে আই. এন. এ-তে যোগ দিয়েছেন	৪০

ইন্ডিয়ান আর্মির অনুগত সৈনিক এবং অপরাপর যুদ্ধবন্দীদের প্রতি উল্লেখিত ২৪৫ জন Black বন্দী সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ করেছেন এবং এরা সকলেই মৃত্যু অথবা দ্বীপান্তরের মত কঠোর দন্ডাজ্ঞা লাভ করার যোগ্য। কিন্তু ভারত সচিব আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে-ভাবে এই সকল Black বন্দীদের দেশপ্রেমিক বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তাতে এদের মধ্যে কয়জনকে যে শেষ পর্যন্ত কোর্ট মার্শাল করা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভারত সচিব বলেন যে সব দিক বিচার করে মনে হয় যে কোর্ট মার্শাল করে ৫০ জনের বেশী কারওকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না। বাদবাকীদের ক্ষেত্রে কেবল বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকবে না। ভারত সচিবের স্মারকপত্রে ইউরোপ এবং দক্ষিণ পূর্ব এসিয়াতে যে-সকল অসামরিক নাগরিক (Civilian Indians) জার্মানী ও জাপানের সহযোগিতায় আই. এন. এ-কে নানাভাবে মদত দিয়েছিলেন কিংবা যারা সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা অন্যান্যভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন তাদেরও সকলকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আদালতে হাজির করানোর কথা বলা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে ইউরোপ প্রবাসী এ. সি. নাম্বিয়ার এবং এন. জি. গণপুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

ভারত সচিব তাঁর প্রস্তাবগুলি স্মারকপত্রের আকারে লিপিবদ্ধ করার আগে ইন্ডিয়া অফিসের মিলিটারী বিভাগের সেক্রেটারী স্যার অ্যাসটন গেরার্ড মেইনের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের চিফ অফ স্টাফ স্যার জন সোয়েইনের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। তাঁরা সকলেই ভাইসরয়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছিলেন যে প্রাণদন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত সকল বন্দীদের (কেবলমাত্র যারা ব্রিটিশ/মিত্রপক্ষের কারও উপরে বর্বরোচিত অত্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তারা ছাড়া) দন্ডহ্রাস করে দেওয়া উচিত। কেননা তাহলে মাত্র অল্প কয়েকজনেরই ফাঁসি হবে এবং সেক্ষেত্রে আই. এন. এ বন্দীদের শহিদ বানানোর জন্য কংগ্রেসের তরফে যে প্রচার চালানো হচ্ছে তাতে জনগণ বিশেষ বিভ্রান্ত হবে না। কাজেই ইন্ডিয়া ও বার্মা কমিটির পক্ষে ভারত সচিবের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করার

ব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। তবুও সাবধানের মার নেই। আই. এন. এ বন্দীদের কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের চার দিকে যে-রকম প্রবল আকারে জন বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাতে ভারত সচিবের প্রস্তাবগুলির উপযুক্ততা সম্পর্কে আরও একবার সব কিছু যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন বলে কমিটির মনে হয়েছিল। আর তাই ভারত ও বর্মা কমিটি ভারতসচিব কর্তৃক ২০ অক্টোবার তারিখে প্রেরিত স্মারকপত্রটি সম্পর্কে ভারতের সেনাপ্রধান অকিনলেকের অভিমত কমিটিকে সত্বর জানানোর জন্য অনুরোধ করেছিল।[১৫]

ভারত ও বার্মা কমিটির ২৫ অক্টোবারের মিটিং-এর উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত জানবার পর ভারত সচিব তৎক্ষণাৎ ভাইসরয় ওয়াভেলকে কমিটির চাহিদা অনুযায়ী সকল তথ্য সংগ্রহ করে তাঁকে অবিলম্বে জানানোর জন্যে অনুরোধ করে একটি চিঠি (তাং ২৯ অক্টোবার ১৯৪৫) পাঠালেন। তিনি লিখলেন যে, যে-সকল Black বন্দীদের বিচারার্থে প্রেরণ করা হবে তাদের সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছেন। ভাইসরয় কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের কথা মাথায় রেখে এই রকম মোট কতজন Black বন্দীকে ট্রায়াল ক্যাটিগোরি-র আওতায় এনে বিচারার্থে হাজির করা হবে সে ব্যাপারে একটা আনুমানিক হিসাব যেন ভারত সচিবের কাছে অবিলম্বে প্রেরণ করা হয় বলে জানান। একই সঙ্গে এই সকল ট্রায়াল ক্যাটিগোরির সেনাদের মধ্যে কার কী ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত এবং কতজনের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে মৃত্যুদন্ডের বিধান দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে সে বিষয়েও একটা হিসাব পেশ করতে বলা হয়েছিল। ভারত সচিব সব কয়জন অভিযুক্ত সেনার বিচার সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক কত সময় লাগতে পারে সেই খবরও জানতে চেয়েছিলেন। সব শেষে ভারত সচিব লেখেন যে আই. এন. এ বন্দীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে সদয় দৃষ্টিভঙ্গি করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে ইন্ডিয়ান আর্মির যে-সকল রাজানুগত সৈনিক আই. এন. এ সেনাদের হাতে নানারকম লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন তাঁরা এদের অল্প শাস্তি দিয়ে বা বেকসুর ছেড়ে দেওয়ার ঘোর বিপক্ষে। সরকারী মহলেরও একাংশের অভিমত এই যে এভাবে শিবিরত্যাগী সৈনিকদের উদারতার দোহাই পেড়ে ছেড়ে দিলে সেনা বাহিনীর সামনে একটা খুব খারাপ নজির রাখা হবে এবং সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ভেঙে পড়তে পারে। ভারত সচিব জানান অকিনলেক যেন এই ব্যাপারটি খুব ভালভাবে পর্যালোচনা করে ভাইসরয়ের মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে পেশ করেন।[১৬]

ভারতসচিবের উল্লেখিত চিঠির জবাবে ভাইসরয় লিখলেন (তাং ২ নভেম্বার

১৯৪৫) যে-সকল সৈনিকদের কোর্ট মার্শাল করা হবে বলে আগে স্থির করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা নানারকম বিচার বিবেচনার পর ইতিমধ্যে আরও অনেক কমে নামিয়ে আনা হয়েছে। আগেকার হিসাব অনুযায়ী এদের সকলের বিচার সম্পূর্ণ করতে প্রায় এক বছর সময় লাগতে পারে বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এখন এই সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার দরুণ ছয় মাসের বেশী সময় লাগবে না বলে মনে করা হচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত কতজনের বিচার হবে এবং তাদের মধ্যেই বা কতজন প্রাণদন্ডাজ্ঞা লাভ করবেন এ বিষয়ে সঠিক কোন ধারণা এই মুহূর্তে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। ভাইসরয় এই সঙ্গে অকিনলেকের অভিমত সম্বলিত প্রতিবেদনটিও ভারত সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেন। অকিনলেকের ৩১ অক্টোবর ১৯৪৫ তারিখের স্বাক্ষরিত এই প্রতিবেদন পত্রটির শীর্ষনাম—Appreciation of the situation in respect of the so-called Indian National Army বা বাংলা তর্জমায় 'তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কিত পরিস্থিতির মূল্যায়ন।'

অকিনলেক তাঁর রিপোর্টের প্রথমেই আই. এন. এ. বন্দীদের সম্পর্কে পূর্বেকার প্রস্তাবিত ভাবনা-চিন্তার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে আই. এন. এ-তে প্রায় ২০০০০ সেনা যোগ দিয়েছিলেন। এদের সকলকে বিচারার্থে হাজির করা এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হওয়ায় প্রথমে দশটি বিশেষ ধরনের অপরাধের দায়ে যারা অভিযুক্ত হতে পারেন তাদেরই বিচার করা হবে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে প্রায় ৩০০/৩৫০ জনকে কোর্ট মার্শাল করতে হবে এবং তার জন্য অন্তত ৬টি আদালতকে টানা এক বছর কাজ করতে হবে। এই হিসাব অনুযায়ী ৫ নভেম্বর তারিখে প্রথম কোর্ট মার্শালের বিচার শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু এই ঘোষণা জারি হওয়ার পর পরিস্থিতি প্রতিদিনই দ্রুত পালটে যাচ্ছে। আই. এন. এ-র কোর্ট মার্শালকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রগুলিতে রোজই উত্তেজক লেখা ছেপে বার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলিও এবং বিশেষ করে কংগ্রেস এই সুযোগে দিগ্বিদিকে উত্তেজনামূলক প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সামনের এপ্রিল মাসের মধ্যেই নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর প্রদেশগুলিতে নোতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অকিনলেক প্রস্তাব করেছিলেন যে আগামী ছয় মাসের মধ্যেই যে-করেই হোক আই. এন. এ-র গোটা বিচারপর্বের কাজ সেরে ফেলা উচিত এবং তা করতে হলে আগেকার ১০ রকমের ট্রায়াল ক্যাটিগোরিকে কমিয়ে অর্ধেক অর্থাৎ ৫ করা উচিত। প্রথমত কেবল মাত্র রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অর্থাৎ "Waging war against the king" করার দায়ে কাউকে বিচারের জন্য হাজির করা হবে না; দ্বিতীয়ত, যাদের শিবির ত্যাগ ভিন্ন অন্য

কোন দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না তাদের কেবল শিবির ত্যাগের (desertion) জন্যই বিচার হবে এবং তৃতীয়ত বা সব শেষে যে-সকল Black বন্দীকে কোর্ট মার্শাল করা হবে না বলে স্থির করা হয়েছে তাদের সকলকেই এপ্রিল মাসের শেষ দিনটির মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। অকিনলেকের ধারণা যে তাঁর প্রস্তাবিত পাঁচটি ট্রায়াল ক্যাটিগোরির মধ্যে আন্দাজ মোট ৮৫ থেকে ১২৫ জনকে কোর্ট মার্শালের জন্য হাজির করাতে হতে পারে এবং এদের মধ্যে সম্ভবত ৩০/৪৫ জনের উপরে প্রাণদন্ডাজ্ঞা হবে। সব দিক বিচার করে তিনি মনে করেন যে যদি মোট ১২০ জন সেনাকে কোর্ট মার্শাল করা হয় তাহলে ২০ জনের অধিক প্রাণদন্ডে দন্ডিত হবেন না। তবে প্রাণদন্ডের প্রতিটি হুকুমই অনুমোদন (confirm) করিয়ে নেওয়ার জন্য অকিনলেক প্রস্তাব করেছিলেন।

ভাইসরয়ের চিঠিতে আই. এন. এ সেনাদের শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান আর্মির সৈনিকদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা সেনাপ্রধানকে জানাতে বলা হয়েছিল। অকিনলেক এই ব্যাপারে চার রকমের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, এক দল মনে করেন যারা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন—তাদের সকলেরই মুক্তি পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় এক দল মনে করেন যে আই. এন. এ-র যে-সকল সেনা বর্বরোচিত ভাবে কাউকে অত্যাচার করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে যথোচিতভাবে শাস্তি দিয়ে বাকী সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত। তৃতীয় গোষ্ঠীর ধারণা হল এই যে সেনাবাহিনীর যে-সকল অফিসার আই এন. এ-তে যোগ দিয়েছিলেন তারাই আসল অপরাধী এবং তাদের কারওকেই রেহাই দেওয়া উচিত নয়। সকলের শেষে চতুর্থ একটি গোষ্ঠী সবচেয়ে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দলটির ধারণা যে আই. এন. এ-তে যারা যোগ দিয়েছিল তারা আদতে সকলেই বিশ্বাসঘাতক এবং যদিও বাস্তব কারণে এদের সকলকে বিচারার্থে চালান দেওয়া সম্ভব নয় তবুও নীতিগত ভাবে এদের প্রত্যেককেই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমুচিত দন্ড দেওয়া উচিত। অকিনলেক বলেন যে সেনাবাহিনী মোটের উপর সীমিত সংখ্যক বিচারে (limited trial) সম্মতি জানালেও প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি বিধানের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধের পাশাপাশি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগেও বিচার করার জন্য দাবী জানানো হয়েছিল। তাছাড়া যে-সকল আই. এন. এ বন্দী নিজেদের White হিসাবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের কোনমতেই যেন ইন্ডিয়ান আর্মিতে ঠাঁই দেওয়া না হয় এই মর্মেও সেনাবাহিনীর এক বিপুল অংশ অকিনলেকের কাছে দাবী জানিয়েছিলেন।[১৭]

অকিনলেকের উপর্যুক্ত প্রতিবেদনটি খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধজয়ের প্রাথমিক উল্লাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল সেনাদের কোর্টমার্শাল করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেও পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির তীব্রতা অনুভব করে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একটা কোনরকম মুখরক্ষা করার মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছিল। ২৪ নভেম্বার ১৯৪৫ তারিখে ভাইসরয়ের কাছে লেখা অকিনলেকের একটি চিঠিতে কর্তৃপক্ষের এই উদ্বিগ্ন মানসিকতার স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। অকিনলেক এই চিঠিতে লেখেন যে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নর এবং অন্যান্য পদস্থ সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বুঝেছেন যে আই. এন. এ বন্দীদের সরকারের পূর্ব পরিকল্পনা মত ঢালাও ভাবে বিচার করে শাস্তি বিধান করলে সারা ভারত জুড়ে এমন ব্যাপক আকারের হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে যা ১৯২১ বা ১৯৪২-এর আন্দোলনকেও ছাপিয়ে যাবে। তিনি বলেন যে আই. এন. এ-র বিরুদ্ধে যে-অভিযোগই আনা হোক না কেন সাধারণ মানুষের চোখে তারা এবং তাদের নেতা সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমিক হিসাবে একটা শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তাছাড়া যে-সব তথাকথিত অপরাধ ও অত্যাচারের দায়ে তাদের অভিযুক্ত করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে সেগুলি তারা আপন কর্তব্যের তাগিদে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের নির্দেশেই করতে বাধ্য হয়েছেন এমন একটা যুক্তি খাড়া করতেও অসুবিধা হবে না এবং সেক্ষেত্রে তাদের সে বাবদে শাস্তিবিধান করা সম্ভবও হবে না। অকিনলেক অবশ্য স্বীকার করেন যে বন্দীদের প্রতি ব্যাপকভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করলে সেনাবাহিনীর অনেক অনুগত সদস্য হয়ত ক্ষুব্ধ হবেন এবং সরকার যে চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এরকম একটা ধারণাও জনমানসে সৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু তবুও সবদিক বিবেচনা করে তাঁর মনে হয় ক্ষমাপ্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে। কেননা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে ইন্ডিয়ান আর্মির বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে যে-কথা প্রচার করা হচ্ছে তা সর্বাংশে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি যাচাই করে দেখেছেন যে আই. এন. এ-র বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মির সে-রকম কোন ক্ষোভ নেই—"There is evidence to show that there is no general resentment in the Indian Army against the I.N.A." অতয়েব অকিনলেকের প্রস্তাব যে বন্দীদের কারও বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অভিযোগ সরাসরি বাদ দিয়ে কেবল খুব গুরুতর অভিযোগে মাত্র অল্প কয়েকজনকেই বিচার করা উচিত এবং বিচারে যাদের প্রাণদন্ড হবে তাদেরও দন্ডহ্রাস করা প্রয়োজন। অকিনলেক বলেন যে এইভাবে মোট কুড়ি হাজার বা ততোধিক আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের শাস্তিবিধান হলে জনতার রোষ তেমন বিপুলভাবে

আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। কিন্তু আই. এন. এ বন্দীদের সম্পর্কে সরকার যে এই রকম সদাশয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন সেটা ভারতবর্ষে এবং বিশ্বসমক্ষে ভালভাবে প্রচার করা উচিত। কেননা তার ফলে সরকার যে প্রভূত প্ররোচনা সত্ত্বেও আই. এন. এ-র বিরুদ্ধে আদৌ প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী নন সেটা জানাজানি হলে সরকারেরই ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। তবে আই. এন. এ বিচার পর্বে প্রথম দফায় যাদের হাজির করা হয়েছে তাদের বিচার কোনমতেই প্রত্যাহার করা উচিত হবে না বলেও অকিনলেক জানিয়ে দিয়েছিলেন।[১৮] পরিশেষে ভাইসরয়কে ২৬ নভেম্বার তারিখে আর একটি চিঠি লিখে অকিনলেক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কয়েকজন আর্মি কম্যান্ডার এবং এ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের মত পদস্থ সামরিক অফিসার যদিও আই. এন. এ-র প্রতি সরকারের সদয় আচরণের নীতির ঘোর বিপক্ষে তবুও তিনি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে সেনাবাহিনীর মধ্যে আই. এন. এ-র প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকেদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তাই অকিনলেক আরও একবার দ্বিধাহীনভাবে সরকারকে ক্ষমাপ্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[১৯] অকিনলেকের প্রস্তাবের সারবত্তা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর কানিংহাম কর্তৃকও সমর্থিত হয়েছিল। কানিংহাম জানিয়েছিলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ-দেশে ভারতীয় ও ইংরাজদের মধ্যে একটা তুমুল বিদ্বেষের আবহাওয়া তৈরী হবে এবং ভারতীয়দের মধ্যে যারা এখনও ব্রিটিশের প্রতি অনুগত আছে তারাও অচিরে ব্রিটিশের ঘোর শত্রুতে পরিণত হবে।[২০] ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ থেকেও অনুরূপ আশংকার কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগের এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে আই. এন. এ বন্দীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য মিলিটারী অফিসের করণিক সম্প্রদায় এবং এমন কি রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স থেকেও চাঁদা তোলা হচ্ছে। খবরের কাগজগুলিও তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে প্রতিদিন নানারকম খবর ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করছে। দেশের সর্বত্র সহর ও গ্রামাঞ্চলে আই. এন. এ. সপ্তাহ ও আই. এন. এ দিবস সাড়ম্বরে পালন করা হচ্ছে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলিও আই. এন. এ-র বিচারকে কেন্দ্র করে দেশের জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। সবচেয়ে বড় কথা আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপার নিয়ে শুধু যে রাজনৈতিক দলগুলিই অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তা নয়। ফৌজের সেনাদের আত্মীয়-পরিজন যারা অগণিত সংখ্যায় দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তারাও সকল প্রকার রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রবহীনতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভে ফুঁসে উঠছে। তাছাড়া

ফৌজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের কাজে লাগিয়ে দেশের অভ্যন্তরে একটা বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টাও করা হচ্ছে এবং এই কাজে সম্ভবত নেহরু প্রমুখ নেতারাও উদ্যোগী হয়েছেন। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষে যে চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশমিত করতে হলে সরকারের আই. এন. এ বন্দীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ত্যাগ করাই বিধেয়।[২১]

পূর্বে উল্লেখিত রিপোর্ট প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে গভর্ণর-জেনারেল (ওয়ার ডিপার্টমেন্ট) ৩০ নভেম্বর ১৯৪৫ তারিখে ভারতসচিবের কাছে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে খুব অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আই. এন. বন্দীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সাধারণ ভাবে সর্বত্রই প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এমন-কি যে-সব ক্ষেত্রে বন্দীরা তথাকথিত অপরাধগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী করতে বাধ্য হয়েছেন বলে প্রমাণ করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে সেইসব ক্ষেত্রেও মামলা তুলে নেওয়া হবে। এই ভারে বাছাই করার পর শেষমেষ কুড়ি কি বড় জোর পঞ্চাশ জনের বেশী কারওকে বিচারার্থে প্রেরণ করা হবে না। ওয়ার ডিপার্টমেন্ট আরও বলে যে, যে-তিনজনকে ইতিমধ্যে কোর্ট মার্শাল করা হচ্ছে সরকারের নোতুন সিদ্ধান্ত যদি কার্যকর হয় তাহলে তাদেরও ছেড়ে দিতে হতে পারে। মোটকথা আই. এন. এ. বন্দীদের অব্যাহতি (amnesty) দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী যে-তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছে সে-কথা খেয়াল রেখে সরকারের পক্ষে এক্ষুনি একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে আই. এন. এ. সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নোতুন উদারনীতিটি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করা উচিত।[২২] অবশেষে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ৩০ নভেম্বার তারিখেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় এক হাজার শব্দ সম্বলিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল। বিজ্ঞপ্তিতে আই. এন. এ. বন্দীদের কিভাবে ব্যাপক হারে ছাঁটাই বাছাই করে মাত্র অল্প কয়েকজনকেই কোর্ট মার্শালের জন্য পাঠানো হবে সে-কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা (acts of gross brutality) করার অভিযোগ ভিন্ন আর কোন অপরাধের জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। তাছাড়া বন্দীদের আত্মীয় পরিজনের দুশ্চিন্তা লাঘব করার জন্য অব্যাহতি প্রাপ্ত সকল সৈনিকদের নামের তালিকাও যথাসত্বর প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে প্রত্যেকে সুবিচার পায় সেজন্য তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ সমেত অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য বিচারের জন্য শেষ পর্যন্ত মোট কতজনকে হাজির করা হবে সে বিষয়ে আগাম কোন ধারণা দেওয়া হয়নি। কিন্তু এদের সংখ্যা যে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ বা সর্বনিম্ন কুড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সে কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[২৩]

প্রেস বিবৃতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার পরেও শাহ নওয়াজ, ধীলন এবং সেগলের বিচারপর্ব প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে কিন্তু উর্ধ্বতন মহলে কিছু সংশয় রয়ে গিয়েছিল। কেননা ৫ই নভেম্বার দিল্লীর লালকেল্লায় এঁদের বিচারের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। বড়লাট ওয়াভেলের ধারণা যে এই সকল বিশিষ্ট আই. এন. এ সেনাদের প্রথম থেকেই অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি এ-কথাও বলেন যে বিচারের কাজ একবার যখন আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে তখন নোতুন করে আবার সিদ্ধান্ত পালটানো ভাল হবে না।[২৪] বস্তুত ওয়াভেল শাহনওয়াজের কোর্ট মার্শালের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন এবং বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলও তাঁর এই অভিমত সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন।[২৫]

কিন্তু যাই হোক না কেন ৩০ নভেম্বারের প্রেস বিবৃতি জারি হওয়ার পর সরকারী মহল এবং বিশেষ করে ভারত সচিব পেথিক-লরেন্স অনেকটাই দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি আই. এন. এ. সম্পর্কে সরকারের নোতুন সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে ওয়াভেলকে লিখলেন যে অভিযুক্তদের শাস্তি বিধান করার সপক্ষে একটাই যুক্তি। তা হল এই যে শাস্তি না দিলে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে যাবে এবং বাহিনীর শৃঙ্খলাও নষ্ট হবে। কিন্তু এই কাজটা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে শাস্তি বিধান করে যতটুকু লাভ হবে ক্ষমা প্রদর্শন করলে লাভের পরিমাণ তার অনেক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে ক্ষমা করে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।[২৬]

ভারত সচিবের এই অপ্রত্যাশিত উদারতা এমন এক বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী যার সঙ্কেত পেয়ে এমন-কি মনুষ্যেতর প্রাণীরাও নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ডিসেম্বারের প্রথম সপ্তাহে যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে ভারত সচিব বন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন সেই বিপর্যয় অচিরেই ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছিল। ঘটনার এইরকম পরিবর্তন লক্ষ্য করে ১৯৪৬ সালের ২২ মার্চ তারিখে বড়লাট ওয়াভেল ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জকে নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি স্বীকার করেন যে সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, বলা যায় যে আই. এন. এ-র কোর্ট মার্শালকে উপলক্ষ করে যে সর্বনাশ শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে সদাশয় ব্যবহার করে সেই সর্বনাশ সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব হয়নি। নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এবং ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ইত্যাদি নানা ঘটনা শাসক শ্রেণীকে যার পর নাই অস্থির করে তুলেছিল। অতঃপর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের দিন যে নিতান্তই ঘনিয়ে এসেছে সে-কথা বেশ ভালো ভাবেই বোঝা গিয়েছিল।[২৭]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কে কতটা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের সমর্থন করেছিল সে বিষয়ে নানারকম ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান সম্পর্কে মুসলিম সমাজের প্রাথমিক মনোভাব যা-ই হোক না-কেন বন্দীদের কোর্ট মার্শালে হাজির করার পর থেকে তারা প্রকাশ্যেই আই. এন. এ-র প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওয়াভেল, ভারত সচিবের কাছে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন (তাং ৯ অক্টোবর ১৯৪৫) যে কংগ্রেসের দেখাদেখি মুসলিম লীগ ও পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলও আই. এন. এ-র প্রতি তাদের সহানুভূতি জানিয়ে আন্দোলন করার উদ্যোগ শুরু করেছে। ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো থেকে অবশ্য জানানো হয় যে লীগের এই আই. এন. এ-প্রীতি অনেকটাই সুবিধাবাদী নীতির দ্বারা চালিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বন্দীদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন সেই কারণে কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্তে লীগ ও সাধারণ মুসলিম নাগরিক সঙ্গত কারণেই যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন— "...in the case of this organization (অর্থাৎ মুসলিম লীগ) there is some reason to believe that as a party it is moved by consideration of expedieney. However, the trial of Muslims may make their effect increasingly felt on the Muslim Public and League alike."[২৮] কিন্তু ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর এই রকম তির্যক মন্তব্য যে অনেকটাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা শিব রাও নামক ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার জনৈক সাংবাদিকের অভিমত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। শিবরাও বলেন যে আই. এন. এ সেনাদের মধ্যে জাত ও ধর্মের কারণে কোন বিভেদ ছিল না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এরা সকলেই একাসনে বসে আহার করতেন। তাছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মধ্যে অনেক মুসলমানকেও কোর্ট মার্শালে হাজির করা হয়েছিল। এই কারণে যে-সকল মুসলমানেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন তারা এমন কি জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করেছিল।[২৯] এই সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে রশিদ আলির বিচারের রায় ঘোষিত হওয়ার পর দেশের সর্বত্র এবং বিশেষ করে কলকাতা সহরে যে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে মুসলমান জনসাধারণও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রশিদ আলি সহ গোটা আই. এন. এ বন্দীদের বিচার উপলক্ষে দেশের সর্বত্র হিন্দু ও মুসলমান জনতার মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা একযোগে বন্দীমুক্তির জন্য দাবী জানিয়েছিল। মুসলিম লীগের মত হিন্দু মহাসভা প্রমুখ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও বন্দীদের সমর্থনে এই সময় যে-সব আন্দোলন হয়েছিল সেগুলিতে যোগ দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিকতা ও জনযুদ্ধের তত্ত্বে বিশ্বাসী কম্যুনিস্টরা সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ-র ভারত অভিযান পরিকল্পনাকে সমর্থন করে নি। কিন্তু তা হলেও কম্যুনিস্টরাও আই. এন. এ বন্দীদের মুক্তির জন্য বিশেষ রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এই দলের পক্ষ থেকে ১৯৪৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে ক্যাবিনেট মিশনের কাছে যে স্মারকপত্র (memorandum) জমা দেওয়া হয়েছিল তাতে তথাকথিত সন্ত্রাসমূলক কাজের দায়ে দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক বন্দী সহ আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত বন্দীদের বেকসুর খালাস করে দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়েছিল। স্মারক পত্রের Civil Liberties পর্যায়ের তিন নম্বর প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল বন্দী সেনাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় সেনা বাহিনীর মধ্যে যাদের রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের অজুহাতে বিগত ছয় বছরের মধ্যে নানাভাবে দণ্ডিত করা হয়েছে তাদেরও নিঃশর্তভাবে কারামুক্তি ঘটাতে হবে।[৩০]

তাছাড়া বন্দীমুক্তির দাবীতে ১৯৪৫-এর শেষদিক থেকে এবং বিশেষতঃ পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল তা সংগঠন করার কাজে কম্যুনিস্টরা একটি মুখ্য ভূমিকাও গ্রহণ করেছিল।

অবশ্য আই. এন. এ-র সমর্থনে কংগ্রেসই সবচেয়ে জোরাল ভাবে জনমত সৃষ্টি করার কাজে উদ্যোগী হয়েছিল। কংগ্রেসের এই সমর্থনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকারী মহল থেকে অনেক সময় নানারকম টীকা টিপ্পনিও করা হয়েছিল। কিন্তু আই. এন. এ-কে সমর্থন করার ব্যাপারে কংগ্রেস যে অত্যন্ত সাবধানে এবং কূটনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে অগ্রসর হতে চেয়েছিল সেই মনোভাব স্বয়ং গান্ধীর লেখা একটি চিঠিতেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ইভান জেংকিন্সের কাছে ২৯ অক্টোবার ১৯৪৫ তারিখে লিখিত এই চিঠিতে গান্ধীজি আই. এন. এ সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক অভিমতের কথা অনুক্ত রেখে কেবল জনগণের আবেগ ও মতামতের প্রতি সহানুভূতি জানাতেই বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। গান্ধীজি লেখেন যে সশস্ত্র পদ্ধতিতে ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে তিনি একমত না হলেও এদের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কথা তিনি কখনও ভুলতে পারেন না। তিনি আরও বলেন যে সামরিক আদালতে বিচারার্থে আনীত এই সব মানুষের প্রতি ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আজও অটুট রয়েছে এবং সেই কারণে তাঁর বিনীত জিজ্ঞাসা যে সরকার কি ফৌজের সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ভারতবর্ষের এই বিপুল জনমতকে সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করতে পারবেন, না তা করা তাঁদের পক্ষে উচিত কাজ হবে ? পরিশেষে তিনি বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে

দাবী জানানোর পরিবর্তে সরকারকে শুধু যা-ভালো মনে হয় তা-ই করার জন্য বিনীত প্রার্থনা মাত্র নিবেদন করেই ক্ষান্ত রইলেন—"Let His Excellency decide what is best in the circumstances."[৩১]

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসেও আই. এন. এ সম্পর্কে কংগ্রেস অত্যন্ত সঙ্গোপনে এই রকম সাবধানী নীতি রক্ষা করে চলেছিল। ১০ মার্চ তারিখে ভাইসরয়ের সঙ্গে আসফ আলি সমভিব্যহারে মৌলাদা আজাদ একটি সাক্ষাতকারে মিলিত হয়েছিলেন। সেই বৈঠকে ভাইসরয় নাকি আজাদকে এই মর্মে সাবধান করে দেন যে কংগ্রেস যেভাবে আই. এন. এ. বন্দীদের সমর্থন জানিয়ে চলেছে তাতে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে এবং সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের হাতে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে তখন এই দল নিজেরাই বিপদে পড়বে। ভাইসরয় বলেন যে এইরকম অপরিণামদর্শীভাবে রাজনীতি করার জন্য কংগ্রেসের এখন দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ভাইসরয়ের এই হিতোপদেশ শুনে কংগ্রেস হয়ত সেই মুহূর্তে দুঃখ প্রকাশ করেনি। কিন্তু ওয়াভেল লিখেছেন যে আজাদ এবং আসফ আলি মন দিয়ে এবং নীরবে তাঁর সমস্ত কথা শুনেছিলেন এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে অত্যন্ত জরুরী সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমতও হয়েছিলেন। ফলে সেদিনকার সেই কথোপকথনে ভাইসরয় কংগ্রেসের মনোভাব জানতে পেরে বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন।[৩২]

ওয়াভেল এবং আজাদ সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু আই. এন. এ-র তিন বন্দী সেনাকে সংবর্ধনা দেওয়ার সময় এই শৃঙ্খলার কতটুকু অবশিষ্ট ছিল তা পাঞ্জাবের গভর্ণর গ্ল্যান্সি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বন্দীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দেখে গ্ল্যান্সি হতাশ এবং সম্ভবত আতঙ্কিত চিত্তে ভাইসরয়কে ১৬ জানুয়ারী ১৯৪৬ তারিখে এক বার্তা পাঠিয়ে লেখেন যে, যে-সব তথাকথিত রাজানুগত সৈনিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে বিদ্রোহী আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের শাস্তি বিধান করার জন্য সরকার দাবী জানিয়েছিলেন সেই সব অনুগত ইন্ডিয়ান আর্মির সৈনিকেরাও নিজেদের ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতেই আই. এন. এ. বন্দীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।[৩৩]

সামরিক আদালতের বিচার পর্ব ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সওয়াল-জবাব

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের সামরিক আদালত বা কোর্ট মার্শালে বিচার করা হয়েছিল। ব্রিটিশের আইন অনুযায়ী সেনাবাহিনী সংক্রান্ত আইন (service law) ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোর্ট মার্শাল করা হয়ে থাকে। কোর্ট মার্শাল নানা ধরনের হতে পারে যেমন ডিসট্রিক্ট কোর্ট মার্শাল, ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল এবং ন্যাভাল কোর্ট মার্শাল। ব্রিটিশ আইন অনুসারে কোর্ট মার্শালে জুরি (jury) ব্যবস্থার কোন সংস্থান নেই। সাধারণত সেনাবাহিনীর কর্মরত কয়েকজন অফিসারকেই এই আদালতের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আইনগত ব্যাপারে এদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি তথা সাধারণত একজন ব্যারিস্টারকেই সামরিক আদালতের জাজ-এ্যাডভোকেট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সচরাচর পাঁচ বা ততোধিক অফিসার এই আদালতে কাজ করেন এবং এঁদের মধ্যে অন্তত চারজনকে ক্যাপ্টেন অথবা ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট অথবা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের অফিসারদের ভিতর থেকে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। কোর্ট মার্শালের বিচারে যদি কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং সে-বাবদে যদি তার শাস্তি বিধান করা হয় তাহলে বিচারের রায় এবং দন্ডাজ্ঞা ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষকে দিয়ে অনুমোদিত (Confirm) করিয়ে নিতে হয়। যদি ইংল্যান্ডের মধ্যেই সামরিক আইন ভঙ্গ করার দায়ে কাউকে অভিযুক্ত করা হয় এবং যদি তার বিরুদ্ধে নরহত্যা, বিশ্বাসভঙ্গ (treason) এবং খুন ইত্যাদি আরও কয়েকটি মারাত্মক অপরাধেরও অভিযোগ থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে কোর্ট মার্শালের পরিবর্তে সাধারণ ফৌজদারী আদালতেও বিচারার্থে সোপর্দ করা যেতে পারে। ১৯৫১ সালের পূর্বাবধি কোর্ট মার্শালের বিচার ও দন্ডদানের বিরুদ্ধে কোন আবেদন করা চলত না। কিন্তু এখন কোর্ট মার্শালের আপীল বিভাগ তথা লর্ড চিফ জাস্টিসের কাছে এই রকম আবেদন পেশ করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।[১]

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের কিন্তু যে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়েছিল তা ইন্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্টের বিধি অনুযায়ীই গঠন করা হয়েছিল। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা অনুসারে যে-কোন সামরিক অফিসার সামরিক আদালত গঠনের ব্যবস্থা করতে পারেন। অন্তত পক্ষে পাঁচজন ব্রিটিশ এবং ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত

অফিসার নিয়ে এই সামরিক আদালত গঠন করা দরকার। যে-সকল অফিসারকে সামরিক আদালতের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হবে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হিসেবে তাঁদের অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এমন অনেক কারণ আছে যার জন্য কোন সামরিক অফিসার সামরিক আদালতের সদস্য হিসাবে কাজ করার পক্ষে অনুপযুক্ত বলেও বিবেচিত হতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, কোন সামরিক আদালতের বিচার্য বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবার জন্য যে-সব তদন্ত কোর্ট গঠিত হয়, কোন অফিসার যদি সেই রকম কোন তদন্ত কোর্টের সদস্য হন তাহলে তাঁকে আর সামরিক আদালতের সদস্য করা হয় না। অভিযুক্ত ব্যক্তি কাদের নিয়ে সামরিক আদালত গঠিত হবে সে বিষয়ে আগাম সংবাদ জানবার জন্য দাবী করতে পারেন এবং সামরিক আদালত চালু হওয়ার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি এক বা একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সদস্যের শত্রুতা আছে কিংবা মামলা সম্পর্কে কোন সদস্য আগে থেকেই তাঁর অভিমত গঠন করে রেখেছেন, অথবা তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন এই রকম আপত্তি জানিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে-কোন ব্যক্তিকে সামরিক আদালতের সদস্য হিসেবে কাজ করতে না দেওয়ার জন্য দাবী জানাতে পারেন। এই রকম আপত্তি উত্থাপিত হলে প্রথমেই এই সব আপত্তি কতদূর সঙ্গত ও যথার্থ তা আলাদা ভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়। সামরিক আদালতের সাধারণ প্রথা এই যে যদি এই রকম কোন আপত্তি দৃশ্যত ভিত্তিহীন না হয় তাহলে যে-অফিসারের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করা হয় তিনি নিজেই সদস্য হিসাবে কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির আপত্তি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর সামরিক আদালত গঠিত হলে সদস্যগণের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সিনিয়র তিনিই সামরিক আদালতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর সামরিক আদালতের প্রেসিডেন্ট, সদস্যগণ এবং জাজ-এ্যাডভোকেট শপথ গ্রহণ করেন।

মামলার শুনানীর সময় যে-সমস্ত আইন ও কার্যক্রম ঘটিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সে সম্পর্কে সামরিক আদালতকে পরামর্শ দেওয়াই জাজ-এ্যাডভোকেটের প্রধান কাজ। শুনানী শেষ হলে জাজ-এ্যাডভোকেট সংক্ষেপে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আলোচনা করে মামলার আইন সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে আদালতকে তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেন। জাজ-এ্যাডভোকেট সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতহীন হবেন বলে আশা করা হয়। জুরিদের সাহায্য নিয়ে বিচার করার সময় সাধারণত জজদের অবস্থা যেমন হয়ে থাকে জাজ-এ্যাডভোকেটের অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই হয়। কিন্তু জুরি মোকদ্দমার জজের সঙ্গে জাজ এ্যাডভোকেটের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। জাজ এ্যাডভোকেট নিছক পরামর্শদাতা হিসাবেই কাজ করেন। আইন

ঘটিত কোন প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী নন। আদালতের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও তিনি সম্মতি বা অসম্মতি জানিয়ে ভোট দেন না। সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনা করার সময় জাজ-এ্যাডভোকেট সুস্পষ্টভাবে শুধু এই কথাই বুঝিয়ে বলেন যে, একমাত্র আদালতই এ-সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী।

সামরিক আদালতের আহ্বায়ক-অফিসার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সামরিক অফিসারই সাধারণত অভিযোক্তা হিসাবে মামলা চালিয়ে থাকেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুরোধ মত তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্যও আর একজন অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত পক্ষের সমর্থনকারী অফিসারদের যে আইন বিষয়ক যোগ্যতা থাকতেই হবে তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তবে এক পক্ষে যদি আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ কাউকে নিযুক্ত করা হয় তাহলে অপর পক্ষেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই নিয়োগ করা বিধেয়। সামরিক আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ সম্পর্কে পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত ব্রিটিশ আদালতে যে-প্রকার কার্যক্রম ও নিয়মাবলী অনুসৃত হয় সামরিক আদালতেও প্রায় অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি, অভিযোক্তা পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করতে পারেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যও সাক্ষী ডাকতে পারেন। আদালতে যে-সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয় কেবলমাত্র সে-সবের ভিত্তিতেই আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

ভারতবর্ষের বিচারালয় সমূহের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্ট অনুসারে গঠিত সামরিক আদালতেও অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করে সাক্ষ্য দিতে পারেন না। তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বা মৌখিক বিবৃতি দিতে পারেন। উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করার পর সামরিক আদালত সকলের শেষে অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অথবা তাঁদের কৌঁসুলিদের সওয়াল শোনেন। ঘটনা সম্পর্কে আসামীপক্ষ থেকে যদি কাউকে সাক্ষী মানা না হয় তাহলে আসামী পক্ষের বক্তব্য সকলের শেষে শোনা হয়। অতঃপর জাজ-এ্যাডভোকেট সকল বিষয় বিবৃত করেন। এর পরে আদালতের সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত তা বিবেচনা করে দেখবার জন্য আদালতের অন্যান্য কাজ বন্ধ রাখা হয়। একটি মাত্র দফা অথবা সমস্ত দফা অভিযোগ সম্পর্কেও যদি আসামীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলেও আদালতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে, সেটি কেবলই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। এরপর আবার আদালতের কাজ আরম্ভ হয় এবং তখন আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে যদি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে আসামীর অতীত দিনের কার্যাবলী এবং স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে আসামী অথবা তার

কৌঁসুলি দন্ড হ্রাস করবার জন্য আদালতে সওয়ালও করতে পারেন। অতঃপর আসামীর প্রতি কি-রকম দন্ডবিধান করা হবে সে বিষয়ে সামরিক আদালতের সদস্যগণ রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনার জন্য মিলিত হন। দন্ডবিধান হয়ে যাওয়ার পর সামরিক আদালতের আজ্ঞাটি সেনাপ্রধান কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। সেনাপ্রধান অবশ্য তাঁর ইচ্ছামত এই দন্ডের পরিমাণ ও মেয়াদ কমিয়ে দিতে পারেন।[২]

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের বিচার করার জন্য যে কোর্ট মার্শাল গঠন করা হয়েছিল তাতে মোট সাতজন সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন মেজর-জেনারেল এ. বি. ব্ল্যাক্সল্যান্ড (A.B.Blaxland)—আদালতের প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার এ. জে. এইচ বুর্ক (A.J.H. Bourke), লেঃ কর্ণেল সি. পি. স্কট (C.P.Scott), লেঃ কর্ণেল টি. আই. স্টিভেনসন (T.I.Stevenson), লেঃ কর্ণেল নাসির আলি খান, মেজর প্রীতম সিং এবং মেজর বনওয়ারী লাল। আদালতের অপেক্ষমান সদস্যদের (Waiting members) মধ্যে ছিলেন লেঃ কর্ণেল সি. এইচ. জ্যাকসন (C.H. Jackson), মেজর এস. এস. পন্ডিত এবং ক্যাপ্টেন গুরদয়াল সিং রণধাওয়া। ভারতবর্ষের এ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার এন. পি. এঞ্জিনীয়ার-এর উপর সামগ্রিকভাবে সরকারের পক্ষে মামলা চালানোর (Prosecution) দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। মিলিটারী প্রসিকিউটার লেঃ কর্ণেল পি. ওয়ালস (P. Walsh) অ্যাডভোকেট-জেনারেলকে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। সামরিক-আদালতের জাজ-এ্যাডভোকেট হিসাবে যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁর নাম কর্ণেল এফ. সি. এ.কেরিন (F.C.A. Kerin)।

অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে যে ডিফেন্স কৌঁসুলিদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, জওহরলাল নেহর, ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু, রায়বাহাদুর বদ্রীদাস, আসফ আলি, কুনওয়ার স্যার দলীপ সিং, বক্সি স্যার টেকচাঁদ এবং পি. কে. সেন। শেষোক্ত তিনজনের মধ্যে প্রথম দুই জন লাহোর হাইকোর্ট এবং পি. কে সেন ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। বিচার শুরু হওয়ার প্রথম দিনে সপ্রুর অনুরোধক্রমে আদালত ভুলাভাই দেশাইকে সিনিয়র ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে মেনে নেয়।

মামলায় সরকার পক্ষে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন লেঃ ডি.সি. নাগ। এই ব্যক্তি আই. এন. এ-তে এক সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের আর্মি এ্যাক্টটি তিনিই রচনা করেছিলেন এবং ফৌজের তিনি প্রধান আইন বিষয়ক উপদেষ্টাও ছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হওয়ার পর তিনি একই সঙ্গে এই সরকারের

এ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং ডেপুটি এ্যাডজুটেন্ট-জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সরকার পক্ষের এই প্রধান সাক্ষী, সাক্ষ্য দান কালে এবং বিশেষ করে জেরার সময় (cross-examination) অনেক রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনাদের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য সরকারের পক্ষে আরও অনেককেই সাক্ষী হিসাবে হাজির করানো হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা—ক্যাপ্টেন ধারগালকর, সুবাদার মেজর বাবু রাম, জমাদার আলতাফ রজ্জাক, নায়েক সন্তোখ সিং, ল্যান্স-নায়েক গঙ্গা শরণ, সুবাদার আশা, নুর খান, হাবিলদার সুচা সিং, সিপাহী কাকা সিং, জমাদার মহম্মদ নওয়াজ, আহমেদ নওয়াজ, হাবিলদার মহম্মদ সারোয়ার, জমাদার মহম্মদ হায়াৎ, হাবিলদার ওয়াজিৎ বাহাদুর, রাইফেলম্যান রবিলাল, সুবাদার রাম স্বরূপ, ল্যান্স নায়েক মহীন্দর সিং, দিলাসা রাম, হাবিলদার নবাব খান, সিপাহী হনুমান প্রসাদ, গানার (gunner) ভাল সিং, সিপাহী শহীদুল্লাহ খান, ল্যান্স নায়েক মহম্মদ সঈদ, হাবিলদার গোলাম মহম্মদ, সিপাহী আল্লা দিত্তা, জাগিরী রাম, আব্দুল হাফিজ খান এবং গিয়ান সিং। ৪/২ গোর্খা রাইফেলস-এর লেঃ কর্ণেল জে. এ. কিটসন (J.A.Kitson)-ও সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছিলেন।৩

অভিযুক্ত পক্ষ মোট ১১২ জনকে দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ানো হবে বলে প্রথমে স্থির করেছিল। এদের মধ্যে প্রাথমিক ভাবে অন্তত ৭০ জনের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে তাদের যে-কোন সময়ে সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে হাজির করা হবে বলে ঠিক করেও রাখা হয়েছিল। কিন্তু সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করে এমন সব তথ্য জানা গিয়েছিল যে অভিযুক্ত পক্ষের সকল সাক্ষীদের ডাকার আর প্রয়োজনই পরে নি। ভুলাভাই দেশাই জানিয়েছিলেন যে বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করার ফলে বিবাদী পক্ষের যুক্তি এবং অভিমত বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেই কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের মোট ১১ জনের সাক্ষ্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রথম পাঁচ জনের নাম—সাবুরো ওতা (Saburo Ohta), সুনিচি মাৎসুমোতো (Shunichi Matsumoto), রেনজো সাওয়াদা (Renzo Sawada), তেরুও হাচিয়া (Teruo Hachiya) এবং তাদাশি কাতাকুরা (Tadashi Katakura)। এঁরা ছাড়া 'হুকুমৎ-এ আজাদ হিন্দ' গোষ্ঠীর অনেককেই সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়েছিল যেমন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার ও প্রোপাগান্ডা দপ্তরের মন্ত্রী এস. এ. আইয়ার, আন্দামান তথা শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জের চিফ কমিশনার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল এ. ডি. লোকনাথন, আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের

অন্যতম ডিরেক্টর দীননাথ, ক্যাপ্টেন আর. এ. এর্সাদ, হাবিলদাব শিব সিং এবং ভারত সরকারের কমনওয়েলথ রিলেশানস বিভাগের বি. এন. নন্দা।

সামরিক আদালতে বিচার শুরু হওয়ার দিনের ঘটনা আনন্দবাজার পত্রিকায় (তাং ৭ নভেম্বার ১৯৪৫) সবিস্তারে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টের কিছু অংশ এখানে উদ্বৃত করা যেতে পারে—

"নয়া দিল্লী, ৫ই নভেম্বরঃ—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লার অন্তর্গত ব্যারাকের যে-হলটি শয়নপ্রকোষ্ঠরূপে ব্যাবহৃত হইত, সেই হলে অদ্য বেলা ১০-১৫টায় সামরিক আদালত বসে। আদালতের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সদস্য শপথ গ্রহণ করেন এবং আসামী ক্যাপ্টেন শাহ্ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন পি কে সাইগল ও লেঃ গুরুবক্স সিং ধীলনকে কোর্টে হাজির করা হয়। আসামীগণ সারিবদ্ধ হইয়া কোর্টের সম্মুখে দন্ডায়মান হন। তাঁহারা ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাঁহারা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক সমস্ত নিদর্শন ইউনিফর্ম হইতে খুলিয়া হওয়া হইয়াছিল।"

উপর্যুক্ত তিন জন ছাড়াও ঐ দিন আরও তিন জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়েছিল। এদের নাম ক্যাপ্টেন আব্দুল রশিদ,, সুবাদার শিঙারা সিং এবং জমাদার ফতে খান। প্রথমোক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নরহত্যা এবং সে-কাজে সহায়তা করা অর্থাৎ ভারতীয় দন্ডবিধির ১২১ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছিল। শেষোক্ত তিনজনকে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৭ নং এবং ৩২৯ নং ধারা অনুসারেও (সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোককে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে গুরুতরভাবে আঘাত করা) অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রথমে তাঁদের পড়িয়ে শোনানো হয়েছিল। অভিযোগ ছিল এই যে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বার মাস থেকে ১৯৪৫ সালের ২৬ এপ্রিলের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মালয়ের সিঙ্গাপুরে এবং রেঙ্গুন ও পোপা পাহাড়ের নিকটবর্তী এলাকা সমূহে এবং ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানে সম্রাটের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। লেঃ গুরু বক্স সিং ধীলনের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ এই যে তিনি ১৯৪৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখে বার্মার পোপা পাহাড় এলাকায় হরি সিং, দুলি চাঁদ, পরদেব সিং এবং ধরম সিং নামক চার ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। ক্যাপ্টেন সেগলের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ এই যে পূর্বোক্ত চার ব্যক্তিকে হত্যা করার কাজে তিনি সহায়তা (abetment) করেছিলেন। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজকেও খাজিন শাহ, আয়া সিং এবং মহম্মদ হোসেন নামে তিন ব্যক্তিকে হত্যাপরাধে সহায়তা করার দায়ে বিশেষভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ মন দিয়ে শোনার পর নিজেদের নির্দোষ বলে ঘোষণা

করেন। অতঃপর এ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার এন. পি. এঞ্জিনীয়ার তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ করার পরে সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী লেঃ ডি. সি. নাগের জবানবন্দী গৃহীত হয়। এই সময় বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি সাক্ষীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ করার জন্য এবং অন্য সকল প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে দেখার জন্য অন্তত তিন সপ্তাহকাল মামলার শুনানি স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থনা জানান। ফরিয়াদীপক্ষ এই আবেদন মঞ্জুর করতে সম্মতি জানালে আদালত মামলা কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দান করেছিলেন।

শুনানী স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি হওয়ার আগে অ্যাডভোকেট-জেনারেল প্রদত্ত নাতিদীর্ঘ উদ্বোধনী বক্তৃতায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পূর্বাপর ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছিল। অ্যাডভোকেট-জেনারেলের মূল অভিযোগ ছিল এই যে আজাদ হিন্দ ফৌজ বেআইনী ভাবে তৈরী করা হয়েছিল এবং এই ফৌজে বলপ্রয়োগ করে সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকেও অ্যাডভোকেট-জেনারেল বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন যে এই বেআইনী বাহিনী এবং বেআইনী সরকার জাপানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সম্রাট তথা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এ্যাডভোকেট-জেনারেল বলেন যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াও বিদ্রোহ করারই সামিল এবং বৈরী আচরণে লিপ্ত শত্রুপক্ষে যোগ দিলেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। আনুগত্যহীনতার কোন কাজ করার পর সে-বাবদে উদ্ভূত ফৌজদারী অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কেউ কোন অধিকার দাবী করতে পারেন না। যেহেতু বিশ্বাসঘাতক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলাও বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল সেই জন্য এই সব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের হুকুম পালন করা হয়েছে বলে কোন দোহাই দেওয়া চলে.না।

অ্যাডভোকেট-জেনারেল স্বীকার করেন যে কোর্ট মার্শালে যাঁদের হাজির করা হয়েছে তাঁরা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এ্যাক্ট প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তারা যা-কিছু করেছেন তার জন্য তাদের উপর কোন দায়িত্ব অর্শাবে না। কিন্তু এই ধারণা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত। কেননা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এ্যাক্ট নামক আইনটির কোন বৈধ ভিত্তি নেই এবং এমন একটি অবৈধ আইন নাগরিকদের মৌলিক আনুগত্য বন্ধনের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারেনা। কাজেই এই তথাকথিত আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত সমুদয় কর্তৃপক্ষের পিছনে কোন বৈধ স্বীকৃতি বা অনুমোদন থাকতে পারে না এবং সেই কারণে এই ধরনের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কৃতকর্মের দায় থেকেও কেউ নিস্তার পেতে পারেন না।

এ্যাডভোকেট-জেনারেল তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আদালতে

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শ (exhibit) পেশ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে প্রথমটি ছিল বর্মাতে ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত শাহ নওয়াজ-কৃত একটি খসড়া পরিকল্পনা—"A scheme for the reception and management of the Indian soldiers in Burma". বাকী দুটি নথি ছিল শাহ নওয়াজ ও সেগলের লেখা এবং যুদ্ধকালীন অবস্থার নানা ঘটনার বিবৃতি সমন্বিত দুটি মূল্যবান ডায়েরী। এগুলি ছাড়াও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এ্যাক্ট এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের জারি করা যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘোষণা পত্রটিকেও (proclamation) আদালতে নথি হিসাবে পেশ করা হয়েছিল।

এ্যাডভোকেট-জেনারেলের উদ্বোধনী বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে অভিযুক্ত তিন ব্যক্তি আদালতে তাঁদের নিজ-নিজ লিখিত বিবৃতি পেশ করেন। প্রথমে শাহ নওয়াজের বিবৃতি পাঠ করা হয়। শাহ নওয়াজ তাঁর বিবৃতির প্রারম্ভেই তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এ-কথা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের নির্দেশে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যই তিনি এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং সকল সভ্য দেশে প্রচলিত যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন মোতাবেক এ-জন্য তিনি যুদ্ধমান সৈনিকের মর্যাদা তথা বেলিজারেন্ট (belligerent) হিসাবে স্বীকৃতি পাবার অধিকারী। শাহ নওয়াজ আরও বলেন যে—

> "আই. এন. এ-তে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি স্থির করেছিলাম যে আমি আমার সর্বস্ব—আমার জীবন, আমার ঘর-সংসার এবং সম্রাটের প্রতি আমার পারিবারিক আনুগত্যের ঐতিহ্য, সব কিছুই উৎসর্গ করব। আমি মনে মনে এমনকি এও ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমার ভাইও যদি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করব এবং ১৯৪৪ সালের পরবর্তী সময়ের যুদ্ধে আমরা যথার্থই পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করি। আমি এবং আমার খুড়তুতো ভাই চিন পাহাড় এলাকায় প্রায় দু'মাস ধরে প্রতিদিনই পরস্পরের বিরোধিতা করেছি। সে আহত হয়েছিল। সম্রাট না স্বদেশ-কার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা হবে সেটাই ছিল আমাদের প্রধান প্রশ্ন। আমি দেশের প্রতি অনুগত থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করব বলে আমি নেতাজীর (সুভাষ চন্দ্র বোস) কাছে পবিত্র অঙ্গীকারও করেছিলাম।"

মহম্মদ হোসেন নামক যে ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে শাহ নওয়াজকে অভিযুক্ত

করা হয়েছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি বলেন যে এই ঘটনা যদি সত্য বলেও মেনে নেওয়া হয় তাহলেও তাঁকে এই অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। কেননা মহম্মদ হোসেন সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে এই বাহিনীর শৃঙ্খলা মেনে চলতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেই তিনি একটি সঙ্কটের মুহূর্তে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা যদি সফল হত তাহলে তাঁর মাধ্যমে আই. এন. এ সংক্রান্ত অনেক গোপন খবর ব্রিটিশের কাছে পাচার হয়ে যেত এবং তার ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ অনেক অভাবনীয় বিপদের সম্মুখীন হোত। আই. এন. এ অ্যাক্ট তথা পৃথিবীর যে-কোন সভ্য দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই রকম জঘন্য অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু হোসেনকে এই অপরাধের জন্য আদপেই প্রাণদন্ড দেওয়া হয়নি এবং শাহ নওয়াজেব জারি করা ঐ তথাকথিত দন্ডাদেশ কার্যকর করার জন্য তাকে গুলি করে মারার খবরটিও মোটেই সত্য নয়। আসলে হোসেনের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগপত্র তৈরী করে তার সহযোদ্ধারা তাকে শাহনওয়াজের কাছে একদিন হাজির করিয়েছিল এবং সেই সময় তিনি হোসেনকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে তিনি যে অপরাধ করেছেন তার জন্য মৃত্যুদন্ডই তার উপযুক্ত শাস্তি বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এ তো তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র। তিনি তো সত্যি সত্যি মহম্মদ হোসেনের বিচার করেন নি যে তাকে প্রাণদন্ড দেবেন। আসলে মহম্মদ হোসেনকে কেবল একটা চেতাবনী বা ওয়ার্নিং মাত্রই দেওয়া হয়েছিল। তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচার করে কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি।

শাহ নওয়াজ তাঁর বিবৃতিতে তাঁদের পরিবারে রাজনুগত্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য সত্ত্বেও তিনি কিভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন সে-কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে তাঁর বাবা ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বছর যুক্ত ছিলেন। তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি সমর্থ পুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের পক্ষেই লড়াই করেছিল এবং এই পরিবারের অন্তত আশি জন লোক এখনও ইন্ডিয়ান আর্মিতে বিভিন্ন অফিসারের পদে নিযুক্ত রয়েছেন। বস্তুত সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের মূল্যবান ঐতিহ্য তাঁর গোটা পরিবারের সঙ্গে এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল যে এক সময় তিনি নিজেও আই. এন. এ-তে নাশকতামূলক কাজ করার অভিসন্ধি নিয়েই এই বাহিনীতে যোগ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং আই. এন. এ যদি জাপানের শোষণ নীতির চাপে পড়ে তার কাছে নতি স্বীকার করত তাহলে সেই মুহূর্তেই তিনি আই. এন. এ-তে ভাঙ্গন ধরানোর কাজে বিশেষ রকম তৎপর হয়ে উঠতেন। কিন্তু এইরকম দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। শাহ নওয়াজ বলেন যে

আই. এন. এ-তে যোগ দেওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কোনদিন সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিন্তু মালয়ে সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি বক্তৃতা শোনার পর তিনি যথার্থই অভিভূত বোধ করেছিলেন—"এটা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর বক্তৃতা শুনে আমি সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত চিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং আমার জীবনে সেই প্রথম আমি একজন ভারতীয়ের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করলাম। দেশের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ এবং ঐকান্তিক মমত্ববোধ, তাঁর অকপট আচরণ এবং জাপানী অভিসন্ধির কাছে মাথা নোয়াতে তাঁর প্রবল আপত্তি লক্ষ্য করে আমি রীতিমত পুলকিত বোধ করেছিলাম।" শাহ নওয়াজের কাছে সুভাষচন্দ্রের এই স্বাধীনচেতা মনোভাব বিশেষ রকম তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল, কেননা ভারতীয়রা না চাইলেও জাপানীরা যে ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকে পড়বে এটা তাঁরা সবাই বুঝে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা এটাও জানতেন যে ভারতের অভ্যন্তরে জাপ সৈন্যের অগ্রগতি ব্রিটিশদের পক্ষে প্রতিহত করা মোটেও সম্ভব হবে না। সুভাষচন্দ্র এমন একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তিকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ছিলেন এবং সেটাই শাহ নওয়াজের মনে সবচেয়ে সসম্ভ্রম বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল।

শাহ নওয়াজ বলেন যে ব্রিটিশের প্রজা হিসাবে যে-রাজশক্তির প্রতি তিনি এবং বস্তুত ইন্ডিয়ান আর্মির সকলেই অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিল বিপদের মুহূর্তে তাদের প্রতি রাজশক্তির অমানবিক এবং কাপুরুষোচিত ব্যবহার কখনই ভোলার নয়।

> "সিঙ্গাপুরের রণক্ষেত্রে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে আমার ডাইনে ও বামের ব্রিটিশ অফিসারগণ তাঁদের সকল ইউনিট সমেত হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। আমি কিন্তু তখনও অর্থাৎ আমার কম্যান্ডিং অফিসার আত্মসমর্পনের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমার ঘাঁটি আগলিয়েই বসেছিলাম। নির্দেশ লাভ করার পরেও আমি বিশেষ রকম আপত্তি প্রকাশ করি, কেননা আমার মনে হয়েছিল যে শত্রুর সঙ্গে লড়ে যাবার জন্য আমাকে মোটেও কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। যুদ্ধের একেবারে শেষ সময়ে আমাকে সিঙ্গাপুরে এনে এই রকম নিঃশর্তভাবে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেওয়াতে আমার উপর অবিচার করা হয়েছিল এবং এর জন্য আমার সৈনিকের মর্যাদাবোধও ক্ষুন্ন হয়েছিল।... আমরা জাপ সেনাদের রীতি এবং তাদের অত্যাচারের কথা আগেই শুনেছিলাম এবং আমাদের এ-কথাও মনে হয়েছিল যে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম ব্রিটিশ অফিসাররাই আমাদের সঙ্কটের মুখে ফেলে

দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।...১৯৪২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সকাল বেলায় সেদিন আমরা শিবিরে ফিরে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার মেজর ম্যাডুম সঙ্গী ব্রিটিশ অফিসারদের নিয়ে আমাদের ব্যাটেলিয়নকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। আমার সঙ্গে করমর্দনের সময় তিনি বল্লেন—'আমার মনে হয় এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার সময় এসে গিয়েছে।' তাঁর এই কথা কটির মধ্যে দিয়ে আমাদের ধারণাটিই প্রতিষ্ঠিত হল—আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের বিপদের মুখে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

শাহ নওয়াজ জানান যে ফেরার পার্কের অনুষ্ঠানে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের শত্রুহস্তে সমর্পণ করার সময়েও কর্ণেল হান্ট তথা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে এই রকম নিস্পৃহভাব এবং চরম উদাসীনতা দেখিয়েছিল। সেদিনের অনুষ্ঠানে কর্ণেল হান্ট প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন—"আজ আমি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের জাপ সরকারের হাতে সঁপে দিচ্ছি। আপনারা যেমন আমাদের নির্দেশ পালন করেছেন তেমনভাবে এখন থেকে জাপ সরকারেরই নির্দেশ মেনে চলবেন।" এর পর জাপ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মেজর ফুজিয়ারা যুদ্ধবন্দীদের দন্ডমুন্ডের কর্তৃত্ব ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর উপর অর্পণ করলে তিনি এই সব যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য তাঁরই নেতৃত্বে একটি বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। এই সকল বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা ও কর্মসূচী শোনার পর শাহ নওয়াজের মনে কি-রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-কথা ব্যক্ত করে তিনি লেখেন—

"এই সব বক্তৃতা আমার মনে যেন বজ্রপাত ঘটিয়েছিল। আমাদের প্রাক্তন শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনাটি আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল। আমার মত অন্যান্য সেনা অফিসাররাও নিতান্ত অসহায়ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে ব্রিটিশরা যেন আমাদের গোরু ছাগলের মত একবার জাপানীদের হাতে এবং আবার জাপানীদের দ্বারা ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে সমর্পণ করছে এবং সেই মোহন সিংকেই আমাদের দন্ডমুন্ডের মালিকানাও দেওয়া হচ্ছে।...কিন্তু মোহন সিংকে বেশ ভালভাবে জানার দরুণ আমি এটা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম যে মোহন সিং-এর পক্ষে অন্তত রাজনৈতিকভাবে জাপানীদের কূটনীতি ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না এবং আমরা শেষপর্যন্ত তাদেরই স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্য ব্যবহৃত হব।"

শাহ নওয়াজ লেখেন যে এমতাবস্থায় তাঁদের আর কিছু করার ছিল না। মালয়ে জাপ সেনাদের হামলা প্রত্যক্ষ করে ইতিমধ্যে তাঁদের মনে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে। এই হানাদারদের হাত থেকে কি-ভাবে স্বদেশ এবং সেখানে বসবাসকারী আত্মীয়-পরিজনদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা যায় এই দুশ্চিন্তার মধ্যেই তাঁরা দিন কাটাচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে শাহ নওয়াজের মনে হয়েছিল যে জাপানীদের সঙ্গে তাঁরাও যদি ভারতবর্ষে ঢুকতে পারেন তাহলে জাপ-সেনাদের হামলা অন্তত কিছু পরিমাণে বন্ধ করা যেতে পারে—

> "আমার মনে হয়েছিল যে তাদের (জাপানীদের) সঙ্গে ভারতবর্ষে উপস্থিত হলে এই অবস্থা (অর্থাৎ জাপ সৈন্যের হামলাবাজি) ঠেকানো যাবে। অন্তত মালয়ে একজন অসহায় যুদ্ধবন্দী হিসাবে দিন কাটানোর চেয়ে যদি হাতে বন্দুক নিয়ে ভারতে হাজির হতে পারি তাহলে দেশবাসীর জীবন, সম্পত্তি এবং মর্যাদা রক্ষার কাজে আমি স্বদেশের অনেক বেশী উপকার করতে পারব। অতয়েব আমি আই. এন. এ-এর জন্য এমন সব সদস্য সংগ্রহের কাজে লেগে পড়লাম যারা জাপানীরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে প্রস্তুত থাকবে।"

শাহ নওয়াজ বলেন যে বাদীপক্ষের বিভিন্ন সাক্ষীর বিবৃতিতে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজে কেবলমাত্র এইরকম সমর্পিত-প্রাণ এবং অকুতোভয় সৈনিকদেরই নেওয়া হযেছিল। বস্তুত এই ফৌজে জবরদস্তি লোক সংগ্রহের কোন প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কোনমতেই আজাদ হিন্দ ফৌজে নেওয়া হবে না এবং যাঁরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা বিসর্জন দিয়ে কঠোর পরিশ্রম এবং চরম আত্মোৎসর্গ করতে রাজী আছেন কেবলমাত্র তাঁদেরই এই ফৌজে গ্রহণ করা হবে। শাহ নওয়াজ বলেন

> "আমি নিজের চোখে দেখেছি কেমন করে দূর প্রাচ্যের হাজার হাজার দরিদ্র পীড়িত ভারতীয় তাদের যথাসর্বস্ব আই. এন. এ-কে দান করে এবং নিজেরা গোটা পরিবার সহ আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে দেশের স্বার্থে ফকির বনে গিয়েছিল। আমি জানতাম আমরা একজন খাঁটি নেতার সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং তিনি যখন অসহায়, নিরস্ত্র এবং দারিদ্র পীড়িত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর নামে তাদের জন্য এবং তাদের মুক্তির জন্য জীবন আহুতি দিতে আমাদের আহ্বান জানালেন তখন কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ভারতবাসীর পক্ষে তাঁর এই ডাক উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।"

শাহ নওয়াজ পরাধীন ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ রাজের নিত্যদিনের অকরুণ আচরণের কথাও সক্ষোভে স্মরণ করেন—

"সেই সব লক্ষ লক্ষ উপবাসী মানুষ যাদের নির্দয় ভাবে শোষণ করে এবং যাদের ইচ্ছাকৃত ভাবে নিরক্ষর এবং অজ্ঞ রেখে ব্রিটিশরা নিজেদের শোষণ, ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেছিল তাদের কথা চিন্তা করে আমার মনে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটা তীব্র ঘৃণার বোধ সৃষ্টি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে এই ব্যবস্থা একটা অবিচারের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই অবিচার দূর করবার জন্য আমার জীবন, আমার আশ্রয়, আমার পরিবার ও তার ঐতিহ্য এবং আমার যথাসর্বস্ব বিসর্জন দেব বলে আমি মনস্থ করেছিলাম।"

শাহনওয়াজ বলেন যে সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে এতদিনে

"আমি একজন নেতার দেখা পেয়েছি এবং আমি তাঁকেই অনুসরণ করব বলে স্থির করেছিলাম। এটা আমার জীবনের একটা মস্ত বড় সিদ্ধান্ত। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে আমার অসংখ্য আত্মীয়-পরিজন যাদের আমি কখনোই আমার মতানুগামী করতে পারব না তাদের বিরুদ্ধেই এখন থেকে আমাকে লড়াই করতে হবে।"

শাহ নওয়াজ লিখেছিলেন যে বিবেকের নির্দেশে এই রকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এবং অপরাপর আই. এন. এ সৈনিকদের জাপানের কাছে আত্মবিক্রয়কারী আদর্শভ্রষ্ট সেনা হিসাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। শাহ নওয়াজ আদালতের সমবেত বিচারকগণকে আহ্বান করে বলেন

"আমি আপনাদের এবং আমার দেশবাসীদের গোচরার্থে বলতে পারি যে আই. এন. এ. যে দুর্ভোগ সহ্য করেছে তা কোন ভাড়াটে বা ক্রীড়ণক সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। বস্তুত আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্যই লড়াই করেছিলাম।...(আসলে) জাপানীদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা করারও কিছু ছিল না এবং তারা সাহায্য করার পরিবর্তে অনেক সময়েই আমাদের বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। এবং বেশ কয়েকবার আমাকে তাদের বিরুদ্ধেই গুলি বর্ষণ করতে হয়েছিল আদালতে পেশ করা আমার ডায়েরীতে এই সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে।"

পরিশেষে শাহ নওয়াজ তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে তিনি দেশাত্মবোধের প্রেরণাবশতঃ আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে

দুর্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গেও তিনি স্বমর্যাদায় সামনা সামনি লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁকে ও তার অধীনস্থ বাহিনীকে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁদের জন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। রেশন সববরাহ এতই অনিয়মিত ছিল যে তাঁকে গোটা বাহিনী সহ দিনের পর দিন শুধু ধান এবং জঙ্গলের ঘাস খেয়েই কাটাতে হয়েছিল। খাবার জন্য নুনটুকুর প্রত্যাশা করাও ছিল বিলাসিতার সামিল। এইভাবে শুধু বার্মা অঞ্চলেই তাঁদের প্রায় তিনহাজার মাইল মার্চ করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

শাহ নওয়াজের দীর্ঘ বিবৃতির সারমর্ম ছিল এই যে যে-ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এবং গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজকে কয়েকটি মনগড়া অভিযোগের দায়ে কোর্ট মার্শাল করতে উদ্যত হয়েছেন তাঁদের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই কিন্তু শত্রু শিবিরে ঠেলে দিয়েছিলেন। আর তাছাড়া আই. এন. এ-র কোন অফিসারই ব্যক্তিগত দায়িত্বে কোন তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ করেনি—তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করা ব্যতীত আর কিছুই করেন নি এবং এ-জন্য আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাঁদের উপরে ব্যক্তিগতভাবে কোন দন্ডাজ্ঞা দেওয়া চলে না।

শাহ নওয়াজের পর ক্যাপ্টেন প্রেম সেগলের লিখিত বিবৃতি পাঠ করা হয়েছিল। সেগলও শাহ নওয়াজের মত কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁরা আই. এন. এ-তে যোগ দিয়েছিলেন সে কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ নওয়াজের বক্তব্যগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলেন যে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ফেরার পার্কের অনুষ্ঠানে যেদিন যথাক্রমে ফুজিয়ারা ও মোহন সিং-এর হাতে তাঁদের সঁপে দেওয়া হয়েছিল সেই দিনই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রকারান্তরে নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই নির্ধারণ করে নেওয়ার অধিকার দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে এই কথাই বিশ্বাস করেছিলেন যে যেহেতু ব্রিটিশরাজ তাঁদের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছেন সেই কারণে তারা তাঁদের কাছ থেকে কোনরকম আনুগত্যও আশা করতে পারেন না। সেগল প্রসঙ্গক্রমে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে বলেন—

> "দিল্লীর অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং বি. বি. সি. ভারতবর্ষের সমস্ত ঘটনাই যবনিকার আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু সম্ভবত ভারতবর্ষের কোন গোপন কেন্দ্র এবং জাপান ও অক্ষ শক্তি পরিচালিত বহির্ভারতীয় কেন্দ্রগুলি খোলাখুলি ভাবেই সরকার কর্তৃক গৃহীত এই সকল ব্যবস্থাদির খবর প্রচার করে চলেছিল। এই সব বেতার প্রচারের বিবরণী থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তী দিনগুলির মত ভারতবর্ষে তখন একটা বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে।

ব্রিটিশ এবং ভারতীয় প্রেস ও সরকারী বেতার প্রচার সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করায় আমরা এই সকল সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন কারণ খুঁজে পাইনি।"

সেগল লিখেছিলেন যে এই সমস্ত খবর পাওয়ার পর স্বদেশে যে-সকল আত্মীয় স্বজনকে তাঁরা ছেড়ে এসেছেন তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁরা সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এই উদ্বেগ শেষ পর্যন্ত যে-ব্রিটিশ জাতি তাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে পদানত করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধেই একটা আক্রোশের জন্ম দিয়েছিল। সেগল লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষের সেই চূড়ান্ত সঙ্কটের সময়ে সে-দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং তাঁদের কাছে খবর ছিল যে ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারতের বুকে কোনমতেই জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না। শাহ নওয়াজের মত সেগলেরও তাই মনে হয়েছিল যে এই সঙ্গিণ সময়ে একটি ভারতীয় মুক্তি ফৌজ যদি জাপানীদের সঙ্গে একযোগে ভারতের মাটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তাহলে আসন্ন বিপদ হয়ত অনেকটাই এড়ানো হবে। সেক্ষেত্রে এই মুক্তি ফৌজ শুধু যে ভারতীয়দের উপর জাপানী হামলা রুখতে পারবে তা-ই নয়, তারা ভবিষ্যতে ব্রিটিশের পরিবর্তে ভারতে জাপানী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকেও রুখে দিতে পারবে। সেগল বলেন জাপানীদের অত্যাচারের ভয়ে বা ভাড়াটে সৈন্যদের মত কোন লাভের আশায় তিনি বা তাঁর বাহিনীর কেউ আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়নি। তা যদি হোত তাহলে ইন্ডিয়ান আর্মিতে তাঁর পাওনা মাসিক ১২০ ডলার বেতনের পরিবর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের মাসিক মাত্র ৮০ ডলারের বেতন গ্রহণ করে তিনি আই. এন. এ-তে যোগ দিতেন না। আসলে স্বদেশ প্রেমের প্রেরণাতেই তিনি এবং তাঁর অধঃস্তন সেনাদল আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের এই সমুন্নত স্বদেশাভিমানের কথা বুঝতে চাইছেন না।

বস্তুত আই. এন. এ-তে যোগ দেওয়ার জন্য যে-ভাবে তাঁদের বিচার করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। সত্য বটে যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি তাঁর অধঃস্তন সেনাদের নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু আত্মসমর্পণ করার সময় চুক্তি ছিল যে তাঁদের সকলকেই যুদ্ধবন্দী (Prisoners of War) হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তদনুযায়ী তাঁদের সকলকেই যুদ্ধবন্দীদের পক্ষে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাগুলিও দিতে হবে। আত্মসমর্পণের পর তাঁদের কিছুদিনের জন্য এই সব সুবিধা দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু তারপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের অকস্মাৎ একদিন জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের কাউকেই

যুদ্ধবন্দী হিসেবে স্বীকার করা হবে না। এই রকম আকস্মিকভাবে মত পরিবর্তন করা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। সেগল বলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই অস্ত্র সজ্জিত ছিলেন এবং দেশের জন্য তাঁরা দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু ঝরাতেও প্রস্তুত ছিলেন। কাজেই আত্মসমর্পণ করার সময়েই যদি বলে দেওয়া হোত যে তাঁদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহণ করা হবে না তাহলে তাঁরা লড়াই চালিয়ে যেতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেদিন এ সব কথা না বলে আজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছেন। এই আচরণ শঠতার নামান্তর।

সেগলের বিরুদ্ধে হরি সিং, দুলি চাঁদ, দরায়ো সিং এবং ধরম সিং নামে চার ব্যক্তির হত্যাকান্ডে সহায়তা করার (abetment) অভিযোগও আনা হয়েছিল। এই অভিযোগের উত্তরে সেগল বলেন উল্লেখিত চার জন সিপাহীকে নানা অভিযোগে বিচারের জন্য পাঠানো হয়েছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত চার্জ শিটও দাখিল করা হয়েছিল এবং তারপর যথাবিধ পদ্ধতিতে বিচার করে তাদের সকলকেই প্রাণদন্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দন্ডাদেশ লাভ করার পর আসামীরা তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে আর কখনও ঐ ধরনের অপরাধ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে প্রাণদন্ডের আদেশ মোটেও কার্যকর করা হয়নি। কিন্তু এই রকম ক্ষমা প্রদর্শনের কথা জানাজানি হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ব্যাহত হতে পারে মনে ভেবে এই সংবাদ চেপে যাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা আনীত তথাকথিত হত্যাকান্ডের ঘটনাটির কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। অথচ এই মিথ্যা অভিযোগের দায়েই সেগলকে আসামী হিসাবে সাজানো হয়েছে। সেগল বলেন যে হত্যাকান্ডের ঘটনাটি যদি বাস্তবে ঘটেও থাকে তাহলেও কিন্তু তাঁকে সেই কারণে ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী করে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। এক্ষেত্রে শাহ নওয়াজের মত সেগলও একইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন যে প্রাণদন্ডে দন্ডিত উল্লেখিত চারজন সিপাহী স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে ফৌজের শৃঙ্খলা বিধি সম্পূর্ণ আইনানুগ ভাবেই তাদের উপর প্রয়োগ করা যায়। মোট কথা যে আইন মেনে চলার ব্যাপারে উল্লেখিত চার সিপাহী স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হয়েছিলেন সেই আইনের প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাদের বা তাদের পক্ষ থেকে আর কারও কোন অভিযোগ দায়ের করা সঙ্গত নয়।

পরিশেষে সেগল বলেন যে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন তা হয়ত সর্বতোভাবে সফল হয়নি। বস্তুত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করার প্রাথমিক উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তা হলেও এই ফৌজ মালয়, বর্মা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার

অন্যত্র বসবাসকারী ভারতীয়দের জীবন, সম্পত্তি এবং মর্যাদা রক্ষার দুরুহ দায়িত্ব ভাল ভাবেই পালন করতে পেরেছিল। রেঙ্গুনের ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট এবং বার্মা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট তাঁদের তার-বার্তায় আজাদ হিন্দ ফৌজের এই অনন্য প্রচেষ্টার সপ্রশংস উল্লেখও করেছেন। সেগল বলেন তাঁদের সিদ্ধি ও সাধনার মধ্যে হয়ত কিছুটা ব্যাবধান রয়েই গিয়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা একেবারে ব্যর্থ হননি। দেশের হিত সাধনে তাঁরা যে অন্তত অংশত সফল হয়েছিলেন সেই কথা ভেবে তাঁরা সতত গর্ববোধ করেন।

সেগলের পর লেঃ গুরুবক্স সিং ধীলনের বিবৃতিটি পাঠ করা হয়েছিল। ধীলনের বয়ানেও আগের বক্তাদের যুক্তিগুলি বহুলাংশে পুনরুচ্চারিত হয়েছিল। ধীলন বলেন যে সামরিক বাহিনীতে শিক্ষালাভের সময় তিনি জেনেছিলেন যে মাতৃভূমির কল্যাণে আপনাকে নিয়োজিত করাই হল একজন সৈনিকের প্রাথমিক কর্তব্য। দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমীর চেটউড হলের দেওয়ালে এই কর্তব্যের নির্দেশ সমন্বিত একটি বাণী ক্ষোদাই করা আছে। সেখানে লেখা আছে যে সৈনিকের পক্ষে সর্বাগ্রে দেশের মর্যাদা, কল্যাণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ক স্বার্থের কথা মনে করা উচিত। তারপর তাঁর অধঃস্তন সেনাদের সুবিধা, নিরাপত্তা এবং মঙ্গলের কথা তাঁর খেয়াল রাখা প্রয়োজন। তাঁর নিজের নিরাপত্তা ও সুবিধার কথা সব সময়েই একেবারে সকলের শেষে তিনি বিবেচনা করবেন। ধীলন বলেন এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে যোগ দেওয়ার পর তিনি নানারকম তিক্ত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে জাপানের আক্রমণের মুখেও মালয়ের নিরাপত্তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং তার ফলে জাপানী হানার সময় সেখানকার নাগরিকদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। অথচ এই নিরপরাধ মালয়ী নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ধীলন বলেন এদের দুঃখ লাঞ্ছনার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিগত দেড়শো বছরের ব্রিটিশ শাসনে তাঁর নিজের দেশের অসহায় নাগরিকদের উপর প্রতিদিন কত-না লাঞ্ছনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের যাবতীয় সম্পদ শোষণ করেছে এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাশা চরিতার্থ করবার জন্য ভারতবর্ষের অসহায় মানুষগুলিকে তারা নির্বিচারে কাজে লাগিয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আসলে এ-দেশকে চিরকাল দাসত্ব বন্ধনে বেঁধে রাখার জন্যই তারা সুপরিকল্পিতভাবে ভারতবর্ষকে শক্তিহীন করে রেখেছিল।

ধীলন বলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার এই রকম মর্মান্তিক অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁর মন যখন বিষিয়ে উঠেছিল সেই সময় মোহন সিং-এর আই. এন. এ. গঠনের প্রস্তাব তাঁদের মধ্যে রীতিমত উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে এই রকম একটা বাহিনী যদি সত্যিই গড়ে তোলা যায় তাহলে অচিরেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে। শুধু তা-ই নয়, স্বাধীনতা লাভের পথে যদি শেষ পর্যন্ত জাপানীরাও বাধা সৃষ্টি করে তাহলে এই ফৌজের সাহায্যে তাদেরও যথাসম্ভব মোকাবিলা করা যাবে। সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। ধীলনের ভাষায়—

"ভারত মাতা আমাকে ডাক দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছিল এবং আমি তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোহন সিং-এর দলে যোগ দিয়েছিলাম।" এই ঘটনার কিছু দিন পরে মোহন সিং-এর দল ভেঙে গেলে তিনি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গড়ে তোলা আজাদ হিন্দ ফৌজেও সেই একই দেশপ্রেমের প্রেরণায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ গঠিত এই ফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর উপর কোন বলপ্রয়োগ করা হয়নি। ধীলন বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসৈনিকের (Volunteer) সংখ্যা এত বেশী হয়ে পড়েছিল যে শুধু তিনি কেন কাউকেই এই বাহিনীতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক গ্রহণ করা হয়নি। ধীলন জানিয়েছিলেন যে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে তিনি প্রতিটি সৈন্য সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে এ-কথা পরিষ্কার করে সবাইকে বুঝিয়ে বলেন যে, যে-কেউ এই বাহিনীতে যোগ না দিয়েও সসম্মানে অব্যাহতি পেতে পারেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এমন ঘটনা যে আদৌ ঘটেনি তা-ও নয়। মিনগিয়ানে তাঁর অধীনস্থ একটি বাহিনী অভিযানে বেরোনোর ঠিক আগের মুহূর্তে প্রায় দুইশত সৈন্য তাঁর সঙ্গী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এদের সকলকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সসম্মানে রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

ধীলন বলেন সরকার পক্ষের কয়েকজন সাক্ষী এমত অভিযোগ করেছেন যে আই. এন. এ-তে যে-সকল যুদ্ধবন্দী যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন তাদের নাকি সকলকেই কনসেনট্রেসন ক্যাম্প বা পীড়ণ শিবিরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হোত যাতে তারা সকলেই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ধীলন বলেন আই. এন. এ-র কোন কনসেনট্রেসন ক্যাম্পই ছিল না— যা ছিল তাকে বড় জোর ডিটেনসন ক্যাম্প বলা যেতে পারে। কিন্তু এই ক্যাম্পেও যাদের আনা হোত তাদের কোন সময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। অতএব সরকার পক্ষের সাক্ষীর বিবৃতি সর্বৈব অসত্য। ধীলন বলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকেরা যুদ্ধ চলার সময়ে যে-রকম

হাসিমুখে সমস্ত রকমের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে সে-কথা চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এদের কাউকেই ভয় দেখিয়ে বা প্রলোভনে ভুলিয়ে ফৌজের সদস্য করা হয়নি—তিনি জানান যে স্বয়ং একজন ব্রিগেড কম্যান্ডার হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে একাধিক্রমে বিশ থেকে ত্রিশ ঘন্টা এক ফোঁটা জল না খেয়ে এবং প্রায় দু-তিন দিন অনাহারে কাটাতে হয়েছে। তাঁর মত একজন পদস্থ সেনাধ্যক্ষকেই যখন এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তখন তাঁর অধীনস্থ সাধারণ সৈনিকদের না-জানি আরও কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছিল। ভয় দেখিয়ে বা জবরদস্তি করে যাদের সৈনিক হিসাবে নাম লেখানো হয় তাদের দিয়ে এতটা মহৎ দুঃখভোগ কখনও সম্ভব হয়না।

ধীলন সম্পর্কে এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি আই. এন. এ-র চারজন সৈনিককে বিচারার্থে সোপর্দ করেছিলেন। ধীলন বলেন যে এই চার ব্যক্তিকে নিজেদের শিবির ত্যাগ করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়ে গ্রেপ্তার করে বিচারার্থে চালান করা হয়েছিল। কিন্তু এদের বিচার করে দন্ডাজ্ঞার কথা শোনানো হলেও সেই দন্ড এদের কারো উপর আদৌ প্রয়োগ করা হয়নি। সরকার পক্ষ থেকে যে-প্রচার করা হয়েছিল যে ধীলনের হুকুম মোতাবেক তাদের সকলকেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সে-কথা আদৌ সত্য নয়, কেননা হত্যাকান্ডটি যেদিন সঙ্ঘটিত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়েছে সেই দিন ধীলন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে সেই সময় অকুস্থলে উপস্থিত থেকে গুলি চালানোর হুকুম দেওয়া সম্ভব ছিল না।

পরিশেষে ধীলন তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের লিখিত বয়ানে পূর্ববর্তী বক্তাদের মত এ-কথা জোর দিয়ে বলেন যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক বৈধভাবে সংগঠিত সেনাবাহিনীর একজন যুদ্ধমান সদস্য হিসাবে এবং আপন সামরিক কর্তব্য পালনের অবকাশে তিনি যা-কিছু করেছিলেন তার জন্য ইন্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্ট এবং ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ধারা মোতাবেক তাঁর বিচার করা চলে না। ধীলন আরও বলেন যে স্বদেশ ও স্বদেশে বসবাসকারী নাগরিক ও আত্মীয়-পরিজনদের স্বার্থ রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আই. এন. এ-তে যোগ দিয়ে দেশকে জাপানী হানাদারদের নিগ্রহ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরই বাধাদানের ফলে জাপানীরা পূর্বভারতের অসামরিক নাগরিকদের উপর বোমা ফেলতে সাহসী হয়নি। ধীলন বলেন তাঁদের এইরকম নিঃস্বার্থ দেশ সেবার আগ্রহ লক্ষ্য করেই দূরপ্রাচ্যে বসবাসকারী অনেক ভারতীয় অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের ভান্ডারে স্বেচ্ছায় এক কোটি টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছিলেন। কাজেই কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির আশা নিয়ে তিনি আই. এন. এ-তে যোগ দেন

নি। আর স্বাধীন ভারত সরকারের স্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সদস্যকে ব্রিটিশের কোর্ট মার্শালে বিচার করা সম্পূর্ণভাবেই আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

কোর্ট মার্শালে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই অভিযুক্তদের তরফে আত্মপক্ষ সমর্থনের সওয়াল শুরু করার প্রারম্ভেই বলে নেন যে কোর্ট মার্শাল একটি বিশেষ ধরনের আদালত এবং এখানে বিচার পদ্ধতির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এই প্রক্রিয়া অনুসারে আদালতকে একই সঙ্গে মামলার প্রাসঙ্গিক আইনের প্রশ্নগুলি এবং ঘটনাক্রমের সত্যাসত্যও নিরূপণ করতে হয়। দেশাই বলেন যে এই কারণে তিনি প্রথমেই আদালতে গৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ঘটনাক্রম সম্পর্কে (conclusions of fact) যে-সকল সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেইগুলি সর্বাগ্রে বলে নেবেন। তিনি বলেন যে আদালতে পেশ করা ২৫০ পৃষ্ঠার সাক্ষ্য (evidence) এবং ১৫০ পৃষ্ঠার নথি-প্রদর্শ (exhibits)-এর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত অন্তত আট রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যথা—

১। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বার মাসে জাপান কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা

২। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সৈন্যের আত্মসমর্পণ

৩। ১৯৪২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফেরার পার্কের সভায় জাপান কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সৈন্যের হস্তান্তর

৪। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বার মাসে প্রথম আই. এন. এ-র গঠন এবং ডিসেম্বার মাসে মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পর ঐ বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া

৫। ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব। এর কিছুদিন পরে তিনিই আই. এন. এ-র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারপর দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৃহত্তর পূর্ব এসিয়ার দেশগুলির একটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠান

৬। ১৯৪৩ সালের ২১ তারিখে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের ঘোষণা। অতঃপর এই সরকারের প্রধান পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ

৭। ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এই সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা এবং আই. এন. এ. কর্তৃক অস্থায়ী ভারত সরকার ও রাষ্ট্রের নির্দেশ পালন

৮। অতঃপর এই সরকার রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হওয়ার পর আই. এন. এ বার্মার মধ্য দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে সুদূর কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর

হয়। এর কিছু দিন বাদে ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন পুনরায় দখল করে নেওয়ার পর এবং জাপ সৈন্যের পশ্চাদাপসরণের পর আই. এন. এ সৈনিকদের গ্রেপ্তার ও আত্মসমর্পণ।

উপর্যুক্ত ঘটনা সমূহের নিরিখে ভুলাভাই দেশাই তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন। তিনি বলেন যে এ্যাডভোকেট-জেনারেলের জেরা থেকে জানা যায় যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের ঘোষণা তথা Proclamation অনুসারে এই সরকার বেশ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশাই বলেন যে পূর্বে বর্ণিত আটটি তথ্যের সঙ্গে স্বাধীন ভারত সরকারের অস্তিত্ব বিষয়ক বাস্তব ঘটনাটি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে কোর্ট মার্শালে তথাকথিত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি মোটেও আইনসম্মত নয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ বেকসুর খালাস পাওয়ার অধিকারী।

সওয়াল করার সময় দেশাই বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ সহকারে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা ও আন্তর্জাতিক আইনের বিধান (provision) উল্লেখ করে তাঁর যুক্তির বনিয়াদ রচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে

১। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার বিদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও কিংবা পরবর্তী কালে ভেঙ্গে পড়লেও আইন মোতাবেক গঠিত হয়েছিল।

২। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই স্বাধীন ভারত সরকারকে স্বীকৃতি না দিলেও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একে বেলিজারেন্ট/ইনসার্জেন্ট[৪] মর্যাদা দিতে বাধ্য।

৩। যেহেতু আজাদ হিন্দ ফৌজ উক্ত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার দ্বারা গঠিত একটি জাতীয় সেনাবাহিনী এবং যেহেতু ঐ সরকার বিধিসম্মতভাবে যে কয়টি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ কেবল সেইসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন সেই কারণে এই ফৌজের সৈনিকদেরও কোন ব্রিটিশ আদালতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচার করা চলে না।

৪। যেহেতু আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ তাদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রের নির্দেশেই যুদ্ধকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন সেই কারণে যুদ্ধ চলার সময়ে কর্তৃপক্ষের হুকুম অনুযায়ী কোন কাজ করা বা না-করার জন্য তথাকথিত কোন অপরাধে তাদের ব্যক্তিগতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

৫। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এ-কথাও বলা যায় না যে, যেহেতু আজাদ হিন্দ ফৌজের সকলেই এক সময় ইন্ডিয়ান আর্মির সদস্য

ছিলেন সেই কারণে তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের প্রাথমিক আনুগত্য লঙ্ঘন তথা বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত।

ভুলাভাই দেশাই-এর প্রথম প্রতিপাদ্য ছিল এই যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার বিদেশের মাটিতে গঠিত হলেও কিংবা পরবর্তী সময়ে ভেঙ্গে গেলেও আইন মোতাবেকই গঠিত হয়েছিল। দেশাই বলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে বসবাসকারী ভারতীয়দের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। সত্য বটে যে এই সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি এবং এর অস্তিত্বও ছিল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তাহলেও এই সরকারকে পরিকল্পনাহীন এবং বিশৃঙ্খল বিদ্রোহীদের সাহায্যে গড়ে তোলা একটা এলোমেলো সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করা চলে না। এই সরকার গড়ে তোলার জন্য একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা হয়েছিল। একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণা বা Procamation-এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার বার্তাটি বিশ্ব সমক্ষে প্রচার করা হয়েছিল। এই সরকারের কার্য নির্বাহী পরিষদ হিসাবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়ে প্রতিটি দপ্তরের জন্য এক-এক জন দায়িত্বশীল মন্ত্রীও নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া এই সরকারের প্রতি বিদেশে বসবাসকারী বহু সংখ্যক ভারতবাসী স্বেচ্ছায় আনুগত্য জ্ঞাপন করেছিলেন। শুধু মাত্র মালয়েই ১৯৪৪ সালের জুন মাসে প্রায় ২,৩০,০০০ ভারতবাসী এই সরকারের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং পরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাষ্ট্রীয় পরিচিতির একটা লক্ষণীয় চিহ্ন হল তার ভৌগোলিক আয়তন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ড থাকবে এবং সেই ভূখন্ডের উপর ঐ সরকারের আধিপত্য বজায় থাকবে। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও অস্থায়ী ভারত সরকারকে অবশ্যই একটি বৈধ সরকার হিসাবে গণ্য করতে হয়। কেননা ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বার তারিখে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের (শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ) সমুদয় এলাকা অস্থায়ী ভারত সরকারের নিকট সমর্পণ করেন। আজাদ হিন্দ সরকার অবশ্য এই এলাকায় সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন। আসল কথা হল এই যে এই দুইটি অঞ্চল আজাদ হিন্দ সরকারেরই দখলে ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা প্রয়োজন যে আজাদ হিন্দ সরকার ও জাপানের নিপ্পন সরকারের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সর্ত অনুযায়ী প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয় অধ্যুষিত এবং ৫০ বর্গ মাইল আয়তন সমন্বিত জিয়াবাদী অঞ্চলটিও আজাদ হিন্দ সরকারের দখলে এসেছিল

এবং এই এলাকাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। অনুরূপভাবে মণিপুর ও বিষ্ণুপুর এলাকার প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল এলাকাও এই সরকার দখল নিয়েছিল। দেশাই বলেন অস্থায়ী ভারত সরকারের অস্তিত্ব আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমত বর্মা ও মালয় পুনরায় দখল হওয়ার পরে সেখান থেকে অস্থায়ী ভারত সরকারের বেশ কিছু মূল্যবান দলিল ও কাগজ-পত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। এই কাগজগুলি দেখে বোঝা যায় যে এই সরকার অত্যন্ত নিপুণভাবে সমস্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করে রেখেছিল। ডিফেন্স কৌঁসুলি এই বিষয়টি সম্পর্কে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে কোন ভুঁইফোড়, বেআইনী সরকারের পক্ষে এই সকল গুরুত্বপূর্ণ দলিল এতটা গুছিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। কৌঁসুলি ভুলাভাই আরও বলেন যে এই সরকার নিজস্ব ডাক টিকিট ছাপানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন। তাছাড়া সরকারী টাকা জমা রাখার জন্য আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের মত একটি সরকারী সংস্থাও গড়ে তোলা হয়েছিল। আজাদ হিন্দ সরকারের পতনের পর এই ব্যাঙ্ক যখন বাজেয়াপ্ত (seize) করা হয়েছিল তখনও এতে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা জমা ব্যালেন্স পাওয়া গিয়েছিল এবং এই সব জমা টাকার হিসাব ও অন্যান্য খাতা-পত্রও পাওয়া গিয়েছিল। এই সকল বিভিন্ন ধরনের ঘটনা দেখে অস্থায়ী ভারত সরকারের বৈধ অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সব চেয়ে বড় কথা এই সরকার পৃথিবীর বেশ কয়েকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সরকার পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছিল যে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার যে-কয়টি রাষ্ট্র অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল সেগুলি সব কটিই জাপান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এই অবান্তর তর্কের উত্তরে শুধু এই কথাই বলা যায় যে, যেহেতু রাষ্ট্রগুলির উপর জাপানের কার্যকরী প্রভাব ছিল সেই কারণে এদের স্বীকৃতির মর্যাদা বাতিল করা চলেনা।

অস্থায়ী ভারত সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সরকার পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে জাপানের পক্ষ থেকে এই সরকারের নিকট তেরুও হাচিয়া (Teruo Hachiya) নামে যে দূতকে পাঠানো হয়েছিল আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির রীতি অনুযায়ী জাপ সরকার তাঁকে উপযুক্ত পরিচয় পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন নি। অর্থাৎ সরকার পক্ষের যুক্তি এই যে জাপান আজাদ হিন্দ সরকারকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়নি বলেই সেই সরকারের কাছে প্রেরিত জাপানী দূতের সঙ্গে উপযুক্ত পরিচয়পত্র ছিল না এবং তাই অস্থায়ী ভারত সরকারের প্রধান সুভাষচন্দ্রও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু দেশাই বলেন যে সরকারপক্ষ এই বিচ্যুতিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা সর্বৈব ভ্রান্ত। আসলে

সুভাষচন্দ্র হাচিয়ার সঙ্গে দেখা করেননি কারণ তাঁর কাছে জাপ সরকার থেকে দেওয়া কোন পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি। এটি জাপ সরকারের পক্ষে একটি পদ্ধতিগত ত্রুটি হিসাবে গণ্য হলেও এই ঘটনার দ্বারা জাপ সরকার যে অস্থায়ী ভারত সরকারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন সেই তথ্য অস্বীকার করা যায় না। আর যেহেতু কেবল দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যেই একমাত্র কূটনৈতিক পর্যায়ে দূত বিনিময় সম্ভব সেই কারণে আজাদ হিন্দ সরকার সমীপে হাচিয়ার উপস্থিতিই ঐ সরকারের স্বাধীন সত্তা এবং বৈধ অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত করে।

যে-কোন সরকারের বৈধ অস্তিত্বের একটি বড় নিদর্শন তার সংগঠিত জাতীয় সেনাবাহিনী। আই. এন. এ ছিল এই অস্থায়ী ভারত সরকারের জাতীয় বাহিনী। সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী লেঃ ডি. সি. নাগ (ইনি একদা আজাদ হিন্দ সরকারে জজ, এ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসাবে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত ছিলেন) কর্তৃক রচিত আই. এন. এ. অ্যাক্ট অনুযায়ী এই বাহিনীকে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই আই. এন. এ. এ্যাক্ট ব্রিটিশ সরকারের তৈরী ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্টের আদলেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু এটি ইন্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট বিধানের থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের সেই কারণে সরকার পক্ষ আই. এন. এ. অ্যাক্টটিকে অবৈধ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। সরকার পক্ষের বক্তব্য ছিল এই যে একটা অবৈধ আইনের উপর ভিত্তি করে গঠিত গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজও একটি অবৈধ বাহিনী। কিন্তু ভুলাভাই দেশাই সরকার পক্ষের যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যে আই. এন. এ. অ্যাক্টের বেত্রদন্ড বিধানের ধারাটি ইন্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের হলেও এটির মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ঐ বিষয়ে-যে সকল আইন প্রচলিত ছিল সেগুলিরই সামগ্রিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সুতরাং বিধিসম্মতভাবে গঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের অধীনস্থ একটি জাতীয় বাহিনী হিসাবেই আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বীকৃতি পাবার দাবী করতে পারে।

ডিফেন্স কৌঁসুলির দ্বিতীয় নম্বর প্রতিপাদ্য ছিল এই যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে মেনে না নিলেও এই সরকার আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বেলিজারেন্ট মর্যাদার (belligerent status) অধিকারী। ডিফেন্স কৌঁসুলি বলেন যে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ঘোষিত কোন বৈধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধমান পক্ষের সৈনিকেরা বেলিজারেন্ট মর্যাদার অধিকারী হয়। আবার কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে যখন কোন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেয় তখনও বিদ্রোহীপক্ষের সকলেই ইনসার্জেন্ট হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্ঘর্ষকে বৈধ যুদ্ধ হিসাবে মনে করা কত দূর

সঙ্গত ? ডিফেন্স কৌঁসুলি বলেন যে আদালতে গৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা গিয়েছে যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার বিধি সম্মতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধটি ছিল আন্তর্জাতিক আইনসম্মত একটি বৈধ যুদ্ধ।

সরকার পক্ষ থেকে অবশ্য যুদ্ধের বৈধতা অস্বীকার করে বলা হয়েছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল আসলে একটি বিদ্রোহী সেনা সংগঠন এবং বিদ্রোহীরা ভারতবর্ষে আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত বৈধ ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করবার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে যে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন তাকে বৈধ যুদ্ধ বলে গণ্য করা যায় না এবং সেই কারণে এই তথাকথিত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদেরও বেলিজারেন্ট মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভুলাভাই দেশাই সরকার পক্ষের এবম্বিধ যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলেন যে বৈধ যুদ্ধের সর্ত হিসাবে যুদ্ধমান পক্ষ দুটিকে যে সব সময় সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র (sovereign independent states) হতেই হবে তার কোন মানে নেই। বস্তুত পক্ষে একটি রাষ্ট্রের অধীশ্বরের বিরুদ্ধেও সেই রাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে ("War might exist between a state and its suzerain") যেমনটি খোদ ইংল্যান্ডেই সম্রাট প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় জেমসের আমলে রাজা বনাম প্রজাদের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের সময়ে (১৬০০-৪৯) সম্রাট ও পার্লামেন্টের বিরোধকে কেন্দ্র করে উপর্যুপরি দুটি গৃহযুদ্ধ (civil war) সংঘটিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত সম্রাটকে প্রাণদন্ড (৩০ জানুয়ারী ১৬৪৯) দেওয়া হয়েছিল। সম্রাট দ্বিতীয় জেমসের আমলেও (১৬৩৩-১৭০১) রাজা-প্রজার সঙ্ঘর্ষে সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল (১৬৮৮)। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধও (Boer War 1899-1902) এই রকমের একট সঙ্ঘর্ষের নিদর্শন। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে এই রকম নানা ঘটনার উল্লেখ করে ডিফেন্স কৌঁসুলি বলেন যে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকেও বৈধ যুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়, কেননা তা নাহলে বলতে হয় যে ইংল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য জার্মানী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ ন্যায়সঙ্গতভাবে লড়াই করার অধিকারী হলেও তার নিজের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোন বৈধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অধিকারী নয়। দেশাই এইরকম অদ্ভুত যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করে বলেন শুধু যে বৈধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষকেই বেলিজারেন্ট মর্যাদা দেওয়া হয় তা নয়। আন্তর্জাতিক আইনে বিদ্রোহীদেরও ইনসার্জেন্ট মর্যাদা স্বীকৃত হয়ে থাকে। দেশাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে আন্ডারহিল বনাম

হার্নানডেজ মামলায় বিচারপতি ফুলারের রায় উল্লেখ করে বলেন যে গৃহযুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের সূচনাপর্ব থেকে অনুষ্ঠিত বিরোধী পক্ষের যাবতীয় ঘটনা ও কার্যসমূহকে একটি বৈধ সরকারের কার্যাবলী হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং বিদ্রোহ যদি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থও হয় তাহলেও যুদ্ধ চলার সময়ে বিদ্রোহীরা তাঁদের এইসব কৃতকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হতে পারেন না। দেশাই বলেন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) সময়কার এই মামলায় বিচারপতি ফুল্যারের রায় ছিল সম্পূর্ণরূপে দ্ব্যর্থহীন। এই রায়ে বলা হয়েছিল যে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত বিদ্রোহীদেরও আইন অনুযায়ী একটি বিশেষ মর্যাদার (status) অধিকার দিতে হয় এবং আইন অনুসারেই বিদেশী শক্তির অধীনস্থ যে-কোন বিজিত জাতিও বিজেতার বিরুদ্ধে বৈধ যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্বিশেষে যুযুধান সৈনিকগণ যুদ্ধ চল্যকালীন তাদের কৃতকর্মের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। দেশাই বলেন যে সব দিক দিয়ে বিচার করে তাই আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াইকে একটি বৈধ যুদ্ধ হিসাবেই গণ্য করা দরকার। কোর্ট মার্শালে অভিযুক্ত তিন ব্যক্তিকে এই যুদ্ধ চলার সময় অপরাপর কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা ও সেই কাজে সাহায্য করার দায়ে দোষী করা হয়েছে। কিন্তু এটাই যদি অভিযোগের সারকথা হয় তাহলে তো বিজয়ী পক্ষের সৈন্যদেরও বহু ক্ষেত্রে ঐ একই অপরাধের জন্য বিচারার্থে চালান দিতে হয়, কেননা তারাও তো অনেকেরই প্রাণ নিয়েছেন এবং আরও অনেকের উপরে অত্যাচারও করেছেন। আসলে যুদ্ধের সময়ে এইভাবে যদি শান্তি কালের ন্যায়-নীতি অনুযায়ী সৈন্যদের গতি বিধি নিয়ন্ত্রণ করে দেওয়া হয় তাহলে যুদ্ধ ব্যাপারটাই আর ঘটতে পারেনা। তাই যুদ্ধের সময়কার আইনই যুদ্ধমান সৈনিককে হত্যা করার অধিকার অর্পণ করে। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ৭৯ নম্বর ধারায় বলা আছে যে আইন মোতাবেক কোন কিছু করার জন্য কাউকে দোষী করা যায় না। সুতরাং ভারতীয় দন্ড সংহিতা বা আন্তর্জাতিক আইন কোন কিছু অনুসারেই কোর্ট মার্শালে বিচারার্থে আনীত তিন ব্যক্তিকে হত্যাপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যায় না। এগুলিকে যদি অপরাধ বলে আদৌ গণ্য করা হয় তাহলে তার জন্য সমস্ত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সৈনিকের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রের উপরেই বর্তায় এবং আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রের এবম্বিধ কোন দায়িত্বের কথা স্বীকার করা হয় না। মোট কথা আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধকে যেহেতু বৈধ যুদ্ধ হিসাবেই গণ্য করা বিধেয় সেই কারণে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদেরও বেলিজারেন্ট মর্যাদা স্বীকার করে নিয়ে তাদের ব্যক্তিগতভাবে সকল প্রকার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

দেশাই বলেন যে বেলিজারেন্ট (এবং ইনসার্জেন্ট) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া

কোন রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সহানুভূতির উপর নির্ভরশীল নয়। বাস্তব ঘটনার নিরিখে (অর্থাৎ একটা বৈধ যুদ্ধের লক্ষণ বিচার করে) এবং যুদ্ধমান দলের কোন এক পক্ষের বা কোন আদালতের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে যেখানে যার বেলিজারেন্ট মর্যাদা প্রাপ্য তাকে তদনুযায়ী স্বীকৃতি দেওয়াই বিধেয়।

দেশাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী আদালতক স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে ১৯১৮ সালে এই কারণেই ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ডের জাতীয় বাহিনীকে বেলিজারেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কোন প্রতিষ্ঠান তথা রাষ্ট্র বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে বেলিজারেন্ট মর্যাদা দেওয়া বা না-দেওয়া যে নির্ভর করে না সে কথা ব্যাখ্যা করে দেশাই বলেন যে প্রতিপক্ষকে মেনে না নিলেও তার বেলিজারেন্ট মর্যাদা খেয়াল-খুশি মত অগ্রাহ্য করা যায় না। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আইন মোতাবেক একটা যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে কি-না এবং সেই যুদ্ধের ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুসারেই সকলে এতে অংশ গ্রহণ করেছিল কি-না। এই কারণে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৮২১-২৫) যোদ্ধাদের এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদেরও বেলিজারেন্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু বিদ্রোহীরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

দেশাই বলেন যে এ্যাডভোকেট-জেনারেল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগ প্রমাণ করবার জন্য নানা ধরনের সাক্ষ্য-সাবুদ পেশ করেছেন।[৫] তাঁর এই প্রচেষ্টা বিবাদীপক্ষের বক্তব্যকেই সমর্থন করে কেননা বিবাদী পক্ষও এটাই প্রমাণ করতে চায় যে আই এন. এ. দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা বৈধ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং সেই কারণে এই যুদ্ধের সৈনিকদের বেলিজারেন্ট হিসাবে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কর্তব্য। সরকার পক্ষ থেকে আই. এন. এ. সৈনিকদের স্রেফ বিদ্রোহী বলে উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে কটাক্ষ করে দেশাই বলেন যে যদি আই. এন. এ. সৈনিকদের নিছক বিদ্রোহী বলেই মনে করা হয় তাহলেও তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। দেশাই বলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উইনস্টন চার্চিল কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে বিদ্রোহও যুদ্ধেরই একটি প্রকরণ এবং তাই বিদ্রোহীদের দেখা মাত্রই সব সময়ে গুলি করে মেরে ফেলা চলে না। দেশাই বলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী আই. এন. এ. সৈনিকদের তাই বেলিজারেন্ট হিসাবেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

বাদীপক্ষের তরফ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের দাবী নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য এ-কথাও বলা হয়েছে যে, যে-অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের জাতীয়

সেনাবাহিনী হিসাবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তি দেখানো হয়েছে যে সেই সরকার বিদেশের মাটিতে গঠিত একটি এমিগ্রি সরকার (emigre government) ছাড়া আর কিছু নয় এবং এহেন সরকার কোন বিশেষ মর্যাদার দাবী করতে পারেনা। দেশাই সরকার পক্ষের এই যুক্তি খন্ডন করে বলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেলজিয়ামের মধ্যে বেলজিয়ান সরকারের এক বর্গইঞ্চি পরিমাণ জমিও তার দখলে ছিল না। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খোদ লন্ডনের মাটিতে বহু দেশের এমিগ্রি সরকার তাদের কর্মকেন্দ্র বা হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করেছিলেন। দেশাই বলেন যে এই সকল এমিগ্রি সরকার মাত্র অল্প কিছু দিনের জন্যই স্বদেশের মাটিতে তাদের অধিকার হারিয়ে বিদেশে এসে আস্তানা স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্বভারতে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের সঙ্গে এই সকল এমিগ্রি সরকারের প্রকৃত অর্থে কোন প্রভেদ ছিল না। তফাৎ মাত্র একটিই—তা হল এই যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেই ভারতবাসীদের বিগত দেড়শো বছর যাবৎ নিজ বাসভূমে কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু তফাতের জন্য একটা জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবীকে তামাদি বলে ঘোষণা করা যায় না। অর্থাৎ অস্থায়ী ভারত সরকারের নির্দেশে ঘোষিত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদেরও বেলিজারেন্ট মর্যাদা (status) অস্বীকার করা চলে না।

প্রসিকিউসান কাউন্সেলের পক্ষ থেকে এই রকম অজুহাত দেখানো হয়েছিল যে, যেহেতু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করার জন্যই আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই কারণে এই সরকার এবং তার অনুগত আই. এন. এ-কে স্বীকৃতি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দেশাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের ফ্রান্সের ভিকি (Vichy) এবং Petain সরকার বনাম Maquis গোষ্ঠীর বিরোধের নজির উল্লেখ করে বলেন যে সেই সময় বিদ্রোহী Maquis গোষ্ঠীকে স্বয়ং আমেরিকার জেনারেল আইজেনাহাউয়ার (Eisenhower) স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেন নি।[৬] সুতরাং সেই নজির অনুযায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজকেও বেলিজারেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে কোন কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়। দেশাই বলেন যে জার্মানীর নাৎসী সরকার অবশ্য Maquis গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং অ্যাডভোকেট-জেনারেল এঞ্জিনীয়ার নাৎসী জার্মানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও অনুরূপভাবে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হতে পারেন। কিন্তু ডিফেন্স কৌঁসুলি এই ব্যাপারে নাৎসী জার্মানীর চেয়ে ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন।

সরকার পক্ষ কর্তৃক আনীত সমুদয় অভিযোগের সারমর্ম ছিল এই যে

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্য লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু ডিফেন্স কাউন্সেল অ্যাডভোকেট-জেনারেলের এই যুক্তি খারিজ করে দিয়ে বলেন যে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিও তো একদা ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্য লঙ্ঘন করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং সে-সময় তাদের বেলিজারেন্ট মর্যাদা পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। দেশাই বলেন যে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য প্রদর্শনের দায়িত্বকে কখনও চিরন্তন বা নিরবচ্ছিন্ন বলে ধরে নেওয়া চলে না। তাই যদি হবে তাহলে কোন পরাধীন জাতির পক্ষে আদৌ স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। আসলে আই. এন. এ. সৈনিকদের মত যে-কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে একটা তাত্ত্বিক আনুগত্য বা exhypothesi allegiance-এর কথা ধরে নিলেও তাদের যে একই সঙ্গে বিদ্রোহ করারও অধিকার রয়েছে সে কথাও স্বীকার করে নেওয়াই সঙ্গত। দেশাই বলেন যে আর আজাদ হিন্দ ফৌজের উপরে সরকার পক্ষ থেকে যে আনুগত্যের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই আনুগত্যের বন্ধন তো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেই ফেরার পার্কের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৪২) ঘটনার পর স্বেচ্ছায় ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত দেশাই ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আনুগত্য সম্পর্কিত দায়িত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে ব্রিটেনে রাজা ও দেশের প্রতি আনুগত্যের সহাবস্থান ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে শুধুই রাজার প্রতি আনুগত্যের বন্ধন স্বীকার করা হয়। এমতাবস্থায় ফেরার পার্কের সেই ঘটনার দিন খোদ রাজার প্রতিনিধিই যখন রাজার পক্ষ থেকে সমস্ত আনুগত্যের বন্ধন অস্বীকার করলেন তখন অসহায় ভারতবাসীর পক্ষে মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য জানানো ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। দেশাই বলেন মাতৃভূমির প্রতি এই আনুগত্যই আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য জাতি মাত্রেরই যে জন্মগত অধিকার রয়েছে সে কথা ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের আমেরিকার স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণা পত্রের মধ্যেই বিশ্ব সমক্ষে প্রচার করা হয়েছিল।

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার সম্পর্কে সরকার পক্ষের আর একটি গুরুতর অভিযোগ হল এই যে এই সরকার জাপানের ক্রীড়ণক হিসাবে কেবলমাত্র নিপ্পন সরকারের নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছিল। দেশাই সরকার পক্ষের এই সকল অভিযোগকে সম্পূর্ণ অসত্য বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন অস্থায়ী ভারত সরকার বা তার অধীনস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল—কথাটা এইভাবে না বলে বরং বলা

উচিত যে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য জাপানই অস্থায়ী ভারত ভারকারের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। জাপান এই চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য ভারত ভূখণ্ডে অধিকৃত সকল এলাকা অস্থায়ী ভারত সরকারের দখলে ফিরিয়েও দিয়েছিল। তাছাড়া আই. এন. এ-এর পক্ষ থেকে এ-কথা বারে বারেই বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রাম চলা-কালে জাপান যদি কোন সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করতে দ্বিধা বোধ করবে না। দেশাই বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের গোড়ার দিকের ইতিহাস অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে এই ফৌজ জাপানের দুরভিসন্ধির কাছে নতি স্বীকার করতে কোনদিনই প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত মোহন সিং গ্রেপ্তার হওয়ার পরে জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন রকমের ক্ষমতার লড়াইও হয়ে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত জাপানও বুঝে গিয়েছিল যে আই. এন. এ-কে দিয়ে তার খেয়াল-খুশি মত কাজ করানো যাবে না। তাই তখন থেকে জাপান আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে মানিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছিল। সুভাষচন্দ্র এই ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকে গোটা বাহিনীর উপর তাঁর এমনই অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে জাপানী খবরদারী তথা জাপানের হাতে আই. এন. এ-র এর ভূমিকা সম্পর্কে আদৌ কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় না। দেশাই বলেন এ-কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে রণক্ষেত্রে জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের যুগ্ম নেতৃত্ব (joint command) থাকার দরুণ অনেক সময় জাপ কম্যান্ডারের নির্দেশেই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যাক্তি মাত্রই জানেন যে রণকৌশলের জটিল পরিকল্পনা বা superior strategy নির্মাণে এ-রকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটে থাকে এবং এর দ্বারা এমন কথা প্রমাণ হয় না যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের হাতে খেলার পুতুল হিসাবে পরিণত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এ-কথাও ভুললে চলবে না যে গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজ কেবল ভারতীয় অফিসার ও সেনাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল। দেশাই বলেন যে প্রসিকিউসন কাউন্সেল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধবন্দীদের শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়ার প্রশ্নটিই রীতিমত অবান্তর বলে দেশাই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা কেবল স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই লড়াই করেছিল। বিজিত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে এ্যাডভোকেট-জেনারেল শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়ার সামিল করে বাস্তব ঘটনার প্রতি অবিচার করেছেন বলে দেশাই অভিযোগ করেন।

দেশাই তাঁর সওয়ালের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে বলেন যে সরকার পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেন নি।

আসামীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত হত্যা এবং হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার অভিযোগগুলি যে নিতান্তই অমূলক সে-কথা অভিযুক্তদের লিখিত বিবৃতিতেই সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই সকল বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে তথাকথিত নিহত ব্যক্তিদের উপর প্রাণ দন্ডের আদেশ আদপেও প্রয়োগ করা হয়নি। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধ চলার সময়ে আপন কৃতকর্মের জন্য যে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হতে পারেন না সে-কথাও ডিফেন্স কাউন্সেলের তরফে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল। ডিফেন্স কাউন্সেলের প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, যেহেতু অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার আইন মোতাবেকই গঠিত হয়েছিল সেই কারণে এই সরকারের অধীনস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের কোন বিশেষ দেশের মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী বিচার করা উচিত নয়। শুধু তাই নয় এই সকল সৈনিকদের বেলিজারেন্ট মর্যাদাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। ডিফেন্স কাউন্সেল বলেন যে আসামীদের শুধু যে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা-ই নয় তাদের বিচার করার পদ্ধতিটিও রীতিমত অসিদ্ধ। অভিযুক্তদের বিভিন্ন অপরাধের দায়ে একই সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করা হয়েছে এবং এইভাবে আইনের পরিভাষায় misjoinder of causes হওয়ার দরুণ গোটা বিচার পদ্ধতিই অসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

ডিফেন্স কৌঁসুলি ভুলাভাই দেশাই-এর সওয়াল শেষ হওয়ার পর বিচার পর্বের বিংশতিতম দিনে (২২ ডিসেম্বার ১৯৪৫) এ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার নাসিরওয়ান পি. এঞ্জিনীয়ার আদালতে সরকার পক্ষের বক্তব্য ও যুক্তি সমূহ পেশ করেন। অভিযুক্ত পক্ষ যে সকল তথ্য ও যুক্তির উপর নির্ভর করে তাঁদের সওয়াল তৈরী করেছিলেন, এ্যাডভোকেট-জেনারেল সেগুলি প্রত্যেকটিই একে একে খন্ডন করতে উদ্যোগী হন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই রকমঃ

এক, এ্যাডভোকেট-জেনারেল বলেন যে অভিযুক্ত পক্ষের আত্মপক্ষ সমর্থনের সমুদয় যুক্তির প্রধান অবলম্বন ছিল এই যে যুদ্ধের সময় পূর্ব এসিয়াতে Provisional Government of Free India নামে একটি স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। এই সরকার জাপান প্রমুখ কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং সেই সঙ্গে আন্দামান সহ কয়েকটি ছোট-ছোট অঞ্চলের উপরেও তার রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করতে পেরেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল এই অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারেরই সেনাবাহিনী। সুতরাং এই স্বাধীন সরকারের আজ্ঞা পালন করার অবকাশে তার অধীনস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের কৃতকর্মের জন্য আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সেই বাহিনীকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। এ্যাডভোকেট-জেনারেল অভিযুক্ত পক্ষের এবম্বিধ যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন যে Provisional Government of Free India নামক

কোন সরকারের আদপেই কোন বৈধ অস্তিত্ব ছিল না। জাপান তার যুদ্ধ প্রচেষ্টার (War efforts) কৌশল হিসাবে এই রকম একটি তথাকথিত সরকারকে স্বীকৃতি দিলেও এই সরকারের প্রধান সুভাষচন্দ্রের কাছে দূত পাঠানোর সময় আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী সেই দূতকে (Mr. Hachiya) জাপ সরকারের কোন বৈধ পরিচয়পত্র (credential) দিয়ে প্রেরণ করেনি। অর্থাৎ জাপ সরকার নিজেও Provisional Government of Free India-র বৈধ স্বাধীন সত্ত্বাকে মনে-প্রাণে স্বীকৃতি দেয়নি। অভিযুক্ত পক্ষের তরফে তথাকথিত স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রশাসনিক আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে যে-সব যুক্তি দেখানো হয়েছিল তার জবাবে অ্যাডভোকেট-জেনারেল আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ওপেনহাইমের (Oppenheim) মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন যে, যুদ্ধের সময় অধিকৃত এলাকার উপর দখলদারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করার অধিকার থাকলেও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সেই সকল এলাকা দখলদারী রাষ্ট্র আত্মসাৎ (annex) করতে পারে না।[৭] সুতরাং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রশাসনিক আধিপত্য স্থাপনের নজির দেখিয়ে অভিযুক্ত পক্ষ Provisional Government of Free India-র বৈধ অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[৮]

দুই, অভিযুক্ত পক্ষের দ্বিতীয় দফার যুক্তি ছিল এই যে পশ্চিম এসিয়ার রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের চাপে ইংরাজরা দিশাহারা অবস্থায় ভারতীয় সৈনিকদের নিজেরাই শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেয়। সুতরাং আশ্রিতকে ত্যাগ করার পর আশ্রয়দাতা তাদের সুসময়ে পরিত্যক্ত সৈনিকদের শিবির ত্যাগের অপরাধে দণ্ড দিতে পারেন না। তাছাড়া শিবির ত্যাগ ইত্যাদির অছিলায় ভারতীয়দের আনুগত্যহীনতা বা treason/high treason ইত্যাদি দণ্ডবিধির দায়ে আদপেই অভিযুক্ত করা চলেনা, কেননা ব্রিটিশ ভারতে treason/high treason সংক্রান্ত কোন আইনের উল্লেখ ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে নেই। সুতরাং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাডভোকেট-জেনারেল বিবাদীপক্ষের সুনির্দিষ্ট প্রথম অভিযোগটি (অর্থাৎ ইংরোজ সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল হান্ট নিজেই ভারতীয় সৈনিকদের শত্রুর কাছে সমর্পণ করে প্রকারান্তরে আশ্রিতজনকে ত্যাগ করেছিলেন) পাশ কাটিয়ে এই বলে তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন যে যুদ্ধের নানারকম ভাগ্য বিপর্যয়ের সময়ে কোন-কোন মুহূর্তে ইংরাজ সেনাদের মত ভারতীয় সেনাদেরও পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব না হলেও এ-কথা বলা ঠিক হবে না যে সরকার কোন অবস্থাতেই ভারতীয় সেনাদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। আর treason বা high treason সংক্রান্ত আইনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অ্যাডভোকেট-জেনারেল বলেন যে ইন্ডিয়ান

পেনাল কোডের ১২১ নং ধারায় উল্লেখিত আইনগুলির সারমর্ম (অর্থাৎ দেশদ্রোহিতা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্যহীনতা জনিত অপরাধ) বিবৃত করা আছে এবং তদনুযায়ী অভিযুক্তপক্ষ আপন কৃতকর্মের দায়িত্ব আইন মোতাবেক অস্বীকার করতে পারেন না।[৯]

প্রসঙ্গত এ্যাডভোকেট-জেনারেল আরও বলেন যে বিবাদীপক্ষের ক্যাপ্টেন সেগল অভিযোগ করেছেন যে কর্নেল কিটসনের (Col. Kitson) নিকট আত্মসমর্পণ করার সময় তাঁকে যুদ্ধমান (belligerent) সৈনিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সরকার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। এ্যাডভোকেট-জেনারেল এই অভিযোগের জবাবে বলেন যে সেগলের মত একজন পদস্থ সেনা অফিসারের ভাল করেই জানা উচিত যে রণাঙ্গনে যুদ্ধরত কোন ক্যাপ্টেন বা কর্নেলের পক্ষে বিধিসম্মতভাবে এই রকম কোন স্বীকৃতিদানের অধিকার থাকে না। সুতরাং এই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি পালনের প্রশ্নটিই রীতিমত অবান্তর। তিন, অভিযুক্ত পক্ষের আর একটি যুক্তি ছিল এই যে তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে জাপ সৈন্য ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধের সুযোগ যে লুঠ-তরাজ বা তান্ডব চালানোর পরিকল্পনা করেছিল তা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ্যাডভোকেট-জেনারেল বলেন যে অভিযুক্ত পক্ষ কিন্তু বরাবর এই কথাই বলে এসেছেন যে ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করার জন্য অর্থাৎ শাদা কথায় জাপানকে ভারতবর্ষ দখল করতে সাহায্য করার জন্য তাঁরা এবং তাঁদের আজাদ হিন্দ ফৌজ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং জাপানী তান্ডবের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করার কথাটি তাঁদের পূর্বাপর ঘোষণার পরিপন্থী। চার, অভিযুক্ত পক্ষ থেকে সব চেয়ে প্রবলভাবে যে যুক্তিটির অবতারণা করা হয়েছিল তা হল এই যে একটি স্বাধীন সরকারের সেনা এবং বিশেষত যুদ্ধমান সেনা হিসাবে তাদের তথাকথিত কোন অপরাধের জন্য যদি বিচার করা নিতান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে তাহলে কেবল আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুযায়ী সেই বিচার চালানো উচিত। অ্যাডভোকেট-জেনারেল এই যুক্তির মূল ভিত্তি হিসাবে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের বৈধ অস্তিত্বের কথাটিই ইতিপূর্বে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি এখন আরও বলেন যে আন্তর্জাতিক আইন যদি প্রয়োগ করা হয়-ও তাহলে কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যাবে সে বিষয়ে আইনে সুস্পষ্টভাবে সীমা নির্দেশ করে দেওয়া আছে। এই সীমা নির্দেশে বলা আছে যে আন্তর্জাতিক আইনের যে অংশগুলি ইংল্যান্ডের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কেবলমাত্র সেইগুলিই প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ্যাডভোকেট-জেনারেল হ্যাল্‌সবেরির (Halsbury) Laws of England থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে বলেন ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী যদি অভিযুক্ত পক্ষের শাস্তি

পাওনা হয় তাহলে আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই পেড়ে তাঁরা সেই পরিণাম থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

পাঁচ, সরকার পক্ষ অভিযুক্তদের মধ্যে লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে চারজন সেপাইকে (হরি সিং, দুলি চাঁদ, দরায়ো সিং এবং ধরম সিং) হত্যা করার অভিযোগ এনেছিলেন। ক্যাপ্টেন সেগলের বিরুদ্ধে এদের হত্যাকান্ডে সাহায্য করার (abetment) অভিযোগ ছিল। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে তিনি খাজিম শাহ এবং আয়া সিং নামক দুই ব্যক্তিকে মহম্মদ হোসন নামক অপর একজনকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে হত্যাকান্ডে সহায়তা (abetment) করছিলেন। এ্যাডভোকেট-জেনারেল বলেন এই সকল অভিযোগ অস্বীকার করে শাহ নওয়াজ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যাই বলুন না কেন আদালতে পেশ করা সাক্ষ্যের (evidence) ভিত্তিতে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে হত্যা ও হত্যাকর্মে সহায়তা করার সমুদয় অভিযোগ সত্য। অভিযুক্ত ধীলন ও সেগলের পক্ষে বলা হয়েছিল যে, যে চারজন লোককে হত্যা করা হয়েছিল বলে প্রচার করা হয়েছে তাদের লাশ সনাক্ত করা যায় নি। তাছাড়া আদালতকে এই কথাও জানানো হয়েছিল যে উল্লেখিত চার ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হলেও এই দন্ডাদেশ কার্যত প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু এ্যাডভোকেট-জেনারেল ১৯মার্চ ১৯৪৫ তারিখে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের স্বাক্ষরিত একটি বিশেষ আদেশনামা বা special Order-এর উল্লেখ (এই আদেশনামাটির বৈধতা আদালতে জেরা করার সময়েও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি) করে বলেন যে এই স্পেশাল অর্ডারে উপরোক্ত চারজনকে ৬ই মার্চ ১৯৪৫ তারিখে সন্ধ্যা ৭টার সময় তাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত দন্ডাদেশ অনুযায়ী হত্যা করা হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে। আসামী পক্ষের কৌঁসুলি ভুলাভাই দেশাই অবশ্য এই আদেশনামায় শাহনওয়াজের স্বাক্ষরটিকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে নিলেও গোটা আদেশনামার দলিলটিকেই প্রমাণ সাপেক্ষ বলে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ্যাডভোকেট-জেনারেলের দাবী অনুযায়ী আসামী পক্ষের কৌঁসুলির এই আপত্তি আদালতে গ্রাহ্য হয়নি।

ছয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য যুদ্ধবন্দীদের (Prisoners of War) মধ্য থেকে ভয় দেখিয়ে এবং বলপূর্বক সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে সরকার পক্ষ যে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তার জবাবে অভিযুক্ত পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল একটি স্বেচ্ছাব্রতী সেনাসংগঠন যেখানে এত বেশী সংখ্যক লোক যোগদানে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে ভয় দেখিয়ে বা দৈহিক পীড়ণ চালিয়ে সেখানে লোক সংগ্রহ করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। অভিযুক্ত পক্ষের এবম্বিধ যুক্তির উত্তরে এ্যাডভোকেট-জেনারেল বলেন যে যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজে যাঁরা একদা তথাকথিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

ভাবে যোগ দিয়েছিলেন তেমন বহু সৈনিক আবারও দলে দলে ফৌজ ত্যাগ করে ইন্ডিয়ান আর্মির কর্তৃপক্ষের আশ্রয়ে ফিরে এসেছিলেন। এইভাবে প্রথম অবস্থার দলত্যাগ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘরে ফেরার ঘটনা থেকে যে সত্যটি স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয় তা হল এই যে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃস্থানীয় অফিসারগণ যদি যুদ্ধবন্দীদের পীড়ণ শিবিরে নিয়ে অত্যাচার না করতেন অথবা তাদের ভীতি প্রদর্শনে বিরত থাকতেন তাহলে হয়ত আজাদ হিন্দ ফৌজে বেশী সংখ্যায় লোক যোগ দিত না।[১০]

এ্যাডভোকেট-জেনারেলের সওয়াল শেষ হওয়ার সাতদিনের মাথায় আদালতের একবিংশতি দিবসের (২৯ ডিসেম্বার ১৯৪৫) অধিবেশনে জজ এ্যাডভোকেট কর্নেল কেরিন আদালতে উত্থাপিত মামলার আইনী প্রশ্নগুলি (questions of law) পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে শোনান। এর পরের অধিবেশনটিই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলার প্রথম পর্বের (first trial) বিচারের শেষ অধিবেশন এবং সেটি ৩১ ডিসেম্বার ১৯৪৫ তারিখে মাত্র ২০ মিনিটের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আদালতের বিচার, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং প্রতিদিনকার কর্মপ্রণালীর একটি নির্ঘন্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে। সেটি ছিল এই রকম—

প্রথম অধিবেশন, তাং ৫. ১১. ১৯৪৫ : এই দিন এ্যাডভোকেট-জেনারেল আদালতে উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন, তাং ৬. ১১. ১৯৪৫ : এই দিন লেঃ নাগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন, তাং ২১. ১১. ১৯৪৫ : এই দিন লেঃ নাগের ক্রশ এগজামিনেশন হয়।

চতুর্থ অধিবেশন, তাং ২২. ১১. ১৯৪৫ : এই দিন ক্যাপ্টেন ধারগালকার (Dharghalkar)-এর সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়াও সুবাদার মেজর বাবুরামকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পঞ্চম অধিবেশন, তাং ২৩.১১.১৯৪৫ : এই দিন পর্যায়ক্রমে পাঁচ ব্যক্তির সাক্ষ্য নেওয়া হয় এরা হলেন জমাদার আলতাফ রজ্জাক, ল্যান্স নায়েক গঙ্গারাম, সুবাদার আসল নুর খান, হাবিলদার সুচা সিং এবং সিপাহী কাকা সিং।

ষষ্ঠ অধিবেশন, তাং ২৪. ১১.১৯৪৫ : জমাদার আহমেদ নওয়াজ এবং হাবিলদার সারওয়ার নামক দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য এই দিনে গ্রহণ করা হয়।

সপ্তম অধিবেশন, তাং ২৬.১১.১৯৪৫ : এই দিন যে দুই জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয় তাদের নাম জমাদার মহম্মদ হায়াৎ এবং হাবিলদার ওয়ালিৎ বাহাদুর।

অষ্টম অধিবেশন, তাং ২৭. ১১. ১৯৪৫ : এইদিন রাইফেলম্যান রবিলাল, সুবাদার রাম স্বরূপ এবং ল্যান্স-নায়েক মহিন্দর সিং-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে আগের দিনের সাক্ষী ওয়ালিৎ বাহাদুরকেও ক্রশ এগজামিন করা হয়।

নবম অধিবেশন, তাং ২৮. ১১. ১৯৪৫ : এই অধিবেশনে হাবিলদার নবাব খান, সিপাহী হনুমান প্রসাদ, গানার ভাল সিং, সিপাহী সয়িদুল্লা খান এবং ল্যান্স-নায়েক মহম্মদ সয়িদের সাক্ষ্য নেওয়া ছাড়াও সিপাহী দিলাস খানকে জিজ্ঞাসাবাদ (cross-examination) করা হয়। দশম অধিবেশন, তাং ২৯. ১১. ১৯৪৫—এই অধিবেশনে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন-যথা সিপাহী জাগিরীরাম এবং সিপাহী আল্লা দিতা।

একাদশ অধিবেশন, তাং ৩০. ১১. ১৯৪৫ : এই দিন আদালত খুবই অল্প সময়ের জন্য বসে। তারপর সরকার পক্ষের অন্যতম সাক্ষী কর্নেল কিটসনকে আদালতে হাজির হবার সুযোগ দানের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

দ্বাদশ অধিবেশন, তাং ৭.১২. ১৯৪৫ : এই অধিবেশনে লেঃ কর্নেল কিটসনের সাক্ষ্য গ্রহণ ছাড়াও ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সেগল এবং লেঃ ধীলনের বিবৃতি পাঠ করা হয়। ত্রয়োদশ অধিবেশন, তাং ৮. ১২. ১৯৪৫ : এই দিন জাপ বিদেশ দপ্তরের অফিসার সাবুরো ওটা (Saburo Ohta)-এর সাক্ষ্য নেওয়া হয়।

চতুর্দশ অধিবেশন, তাং ১০. ১২. ১৯৪৫ : এই অধিবেশনে তিন জন জাপানী অফিসারের সাক্ষ্য নেওয়া এবং ক্রশ এগজামিনেসান সম্পন্ন করা হয়। এঁরা হলেন রেনজো সাওয়াদা (Renzo Sawada), টি. হাচিয়া (T. Hachiya) এবং তাদাশি কাতাকুরা (Tadashi Katakura)।

পঞ্চদশ অধিবেশন, তাং ১১. ১২. ১৯৪৫ : এই অধিবেশনে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের দুই জন পদস্থ কর্মচারীর (যথা এস. এ. আইয়ার এবং লেঃ কর্নেল লোকনাথন) সাক্ষ্য নেওয়া হয়। এঁদের সাক্ষ্য ও জবানবন্দী পরবর্তী দুই দিনের অর্থাৎ ষোড়শ (১২ ডিসেম্বার) ও সপ্তদশ (১৩ ডিসেম্বার) অধিবেশন অবধি একাদিক্রমে স্থায়ী হয়েছিল।

অষ্টাদশ অধিবেশন, তাং ১৭.১২.১৯৪৫ : এই দিন ডিফেন্স কৌঁসুলি ভুলাভাই দেশাই ভাষণ শুরু করেন এবং পরের দিন অর্থাৎ উনবিংশতি দিবসের অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতা শেষ হয়।

বিংশতি অধিবেশন, তাং ২২. ১২. ১৯৪৫ : এই দিন সরকার পক্ষের তরফে এ্যাডভোকেট-জেনারেল তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

একবিংশতি অধিবেশন, তাং ২৯. ১২. ১৯৪৫ : এই দিন জাজ-এ্যাডভোকেট কর্নেল কেরিন আদালতের নিকট আইনের প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যা করেন।

দ্বাবিংশতি অধিবেশন, তাং ৩১. ১২. ১৯৪৫ : এই দিনের স্বল্প সময়ের অধিবেশন সমাপ্ত করে আদালতের প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার এ. জে. এইচ. বুর্ক ঘোষণা করেন যে আদালতের বায় প্রথাসিদ্ধভাবে গৃহীত হওয়ার পর আনুমানিক এক সপ্তাহের মধ্যেই তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে। এর পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পর্বের বিচার মামলা শেষ হয়।

কোর্ট মার্শালের বিচারে শাহ নওয়াজ, সেগল এবং ধীলনকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের দন্ড জারি করা হয়। কিন্তু আইন অনুযায়ী দেশের সেনাপ্রধানের সম্মতি সাপেক্ষেই কেবল কোর্ট মার্শালের দন্ডাজ্ঞা প্রয়োগ করা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে দেশের সর্বত্র যে বিপুল গণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তার তীব্রতা উপলব্ধি করে কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই স্থির করে রেখেছিলেন যে কোর্ট মার্শালের বায় বের হবার পর যখন সেটি সেনাপ্রধানের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হবে তখন সেনাধ্যক্ষ সেই রায়ের কঠোর দন্ড (আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধ প্রমাণিত হলে কোর্ট মার্শালের পক্ষে প্রাণদন্ড বা জীবন মেয়াদের কঠোর দন্ডবিধান করা ভিন্ন গত্যান্তর থাকে না।) মকুব করে অপরাধীদের লঘু শাস্তি দেবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেনাপ্রধান অকিনলেক অপরাধী তিনজনকেই যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের কেবল সেনাবাহিনী থেকে বহিস্কার করা এবং বকেয়া বেতন ও ভাতা প্রদান বন্ধ করে রাখার শাস্তি দান করেন। ১৯৪৬ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে সেনাপ্রধানের এই সিদ্ধান্তের বার্তা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত জারি করা হয়।[১১]

সূত্র নির্দেশ

১। Martin E.A.M (ed.), *A Concise Dictionary of Law*, Oxford, 1990, p. 103

২। আনন্দবাজার পত্রিকা, সোমবার, ৫ নভেম্বার ১৯৪৫, পৃঃ ৩—'সামরিক আদালতে বিচার পদ্ধতি ঃ ভারতীয় আর্মি এক্টের কয়েকটি বিধান'।

৩। সরকার পক্ষে যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁদের সকলের নাম কোন এক জায়গায় একত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমতাবস্থায় সমকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে এই নামগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য Gauba K.L., *Famous and Historic Trials*, Lahore, 1946, p. 290-94.

৪। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈধ যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিদের বেলিজারেন্ট (belligerent) এবং সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইনসার্জেন্ট (insurgent) বলা হয়ে থাকে। অবশ্য এটা নিতান্তই অতি সরলীকৃত ভাষ্য। আসলে আন্তর্জাতিক আইনের পরিভাষা অনুযায়ী belligerency-এর পূর্ববর্তী ধাপকে insurgency বলা হয়। *Encyclopaedia Britannica, Micropaedia* (15th edn)-তে belligerent-এর নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে ঃ

"Under the Geneva convention of 1949, lawful belligerents comprise members of militias, voluntary corps, and organised resistance groups who are commanded by a person responsible for his subordinates, have a distinctive sign, carry arms openly and conduct operations successfully."

আর *Webster's New World Dictionary* (Second edn)-এ insurgent বিষয়ে দুটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে, যথা a) Designating or of a revolt or rebellion not well enough organised to be recognised in international law as belligerency. b) Desiginating or of a faction in revolt against the leadership of a political party.

৫। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রথম দিকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার (Waging war against the King) অভিযোগ আনা হলেও পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমন্সে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আর্থার হেন্ডারসন ঘোষণা করেন যে এই রকম অভিযোগের উপর এখন থেকে আর কারও বিচার করা হবে না।

৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের একদা জাতীয় নেতা ও সেনাধ্যক্ষ Philippe Petain (1856-1951) নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে সে-দেশে জার্মানীর ক্রীড়ণক Vichy সরকার প্রতিষ্ঠা করেন (1940)। এই সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের Maquis গোষ্ঠী বিদ্রোহ করলে আমেরিকার জেনারেল আইজেনহাওয়ার এদের যুদ্ধের combatant বলে স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন যে জার্মানী যদি এই সকল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক (reprisal) আচরণ গ্রহণ করে তাহলে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করার অপরাধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭। Mitra H.N. and Mitra N.N. (ed.), *The Indian Annual Register*, 1945, Vol. II, New Delhi, 1990, pp. 291-92–'Sir N.P.Engineer's arguments.'

৮। *ibid.* p. 291

৯। জজ-এ্যাডভোকেট কর্নেল কেরিনও (Col. Kerin) এ্যাডভোকেট-জেনারেলের বক্তব্য সমর্থন করে আদালতে ২৯ ডিসেম্বার ১৯৪৫ তারিখে বলেন : "The Prosecution had argued that the accused owed a duty of allegiance to the King as Indian Commissioned Officers and also owed such a duty of allegiance as natural born subjects of His Magesty the King. A breach of such a duty of allegiance might amount to an offence of waging war, as defined in Section 121 of the I.P.C., and also might amount to an offence called high treason according to English Law." *ibid.* 'The Judge-Advocates argument', p. 295

১০। কিন্তু এ্যাডভোকেট-জেনারেলের যুক্তি খন্ডন করে এই কথাও বলা যায় যে যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পাল্টা চাপের মুখে নতি স্বীকার করে অথবা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শাস্তি এড়ানোর জন্য এই সকল আজাদ হিন্দ ফৌজিরা আবার ইন্ডিয়ান আর্মিতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১১। Mitra H. N. and Mitra N. N. (ed.), *Op. cit.*, p. 298.

আদালতের রায় ও গণ বিক্ষোভ

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল বিচার প্রক্রিয়া অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে বিচারের প্রয়োজনে অভিযুক্ত পক্ষের তরফে সাক্ষ্য-প্রমাণ যত কিছুই পেশ করা হোক না কেন আদালতের রায় যে কী হবে তা কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই এক রকম স্থির করে রেখে ছিলেন। বস্তুত যুদ্ধে পরাজিত শত্রুপক্ষের প্রতি বিজয়ীপক্ষ কোনকালেই সুবিচার করেনি। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনা সম্মেলনের (১৮১৫) রোয়েদাদে বিজিত পক্ষ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভার্সাই চুক্তিতেও (১৯১৯) জার্মানীর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। তবুও তো এই দুটি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক আইনের প্রথা ও রীতি অনুসারেই বিচার করা হয়েছিল। আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সেক্ষেত্রে কেবল ব্রিটিশ আইন অনুযায়ীই বিচার করা হয়েছিল। ফৌজি সেনারা অবশ্য আদালতে আন্তর্জাতিক আইনের সুবিধা দাবী করে বিচার চেয়েছিলেন। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়নি। কিন্তু প্রার্থনা মেনে নেওয়া হলেও পরাক্রান্ত ঔপনিবেশিক সরকারের কাছ থেকে কতটা ন্যায় বিচার পাওয়া যেত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কোর্ট মার্শালে অভিযুক্ত পক্ষের প্রধান কৌঁসুলির সওয়ালের তীক্ষ্ণতা ও যুক্তিসজ্জা আইন ও বিচার জগতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় সংযোজন। কিন্তু এই সওয়াল ও সাক্ষ্য-প্রমাণের অকাট্যতা বা মেরিট (merit) অনুযায়ী অভিযুক্ত পক্ষকে বেকসুর খালাস করানো যায়নি। আসলে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতে প্রবেশের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি ইংরেজের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের শুধু থেকেই সুভাষচন্দ্র যে-ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাতে ইংরাজ সরকার রীতিমত বিপন্ন বোধ করেছিল। এর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজকে যে-রকম দ্রুততায় গড়ে তোলা হয়েছিল এবং প্রতিদিনই ঐ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা যে-রকম হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা দেখে ইন্ডিয়ান আর্মির প্রবাদ সিদ্ধ রাজভক্তি বা আনুগত্য সম্পর্কেই ব্রিটিশ সরকারের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। তাই যুদ্ধ শেষে বিজয়ী তার ঔপনিবেশিক দাপট দেখানোর সুযোগ ফিরে পাওয়া মাত্র এই সকল অবাধ্য ও বিদ্রোহী সেনাদলকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই রকম সিদ্ধান্তের অজুহাত হিসাবে সরকারের তরফে প্রচার করা হল যে ইন্ডিয়ান আর্মির অনুগত সৈনিকেরাই বিদ্রোহী আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের শাস্তি বিধানে বিশেষ রকম আগ্রহী।

কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই সরকারের ভুল ভেঙ্গে যায়
আগেই বলা হয়েছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার করা হবে বলে সরকারি
নির্দেশটি জারি হওয়ার পরেই দেশব্যাপী এক তুমুল হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়
এই আন্দোলনে শুধু যে সাধারণ মানুষ সামিল হয়েছিল তা-ই নয়। ইন্ডিয়া
আর্মির সাবেকী রাজানুগত সৈনিকেরাও (যারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদে
শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন বলে প্রচার কর
হয়েছিল।) এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন
দাবী জানিয়েছিল। জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকা
যার-পর-নাই অসহায় বোধ করে। কিন্তু কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্ত একবার ঘোষণ
হওয়ার পর প্যাক্স ব্রিটানিকার তথাকথিত মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে সেই সিদ্ধান্
আর পরিবর্তন করা চলে না। অথচ দেশের যা হাল তাতে জনতার দাবী মে
না নিলে সরকার সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবেন বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল
এমতাবস্থায় ব্রিটিশ লিবারেলিজিম-এর ধুয়ো তুলে কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন
কোর্ট মার্শালের আইন মোতাবেক অভিযুক্তদের যে দন্ডাদেশই দেওয়া হোক ন
কেন ভারতবর্ষের সেনাপ্রধান তাঁর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই সব দণ
মুকুব করে দেবেন। তাছাড়া প্রথম দফায় যত জনকে বিচার করা হবে এব
যতজনের উপর প্রাণ দন্ডের বিধান দেওয়া হবে বলে ভাবা হয়েছিল কালক্রমে
তাদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা হয়। এইভাবে একাধারে
সরকারের মুখ রক্ষা ও গণবিক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ
পরিকল্পনার ছক করেছিলেন তদনুযায়ী অন্তত দুই দফায় আজাদ হিন্দ ফৌজে
বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম পর্বের বিচার ৫ নভেম্বার ১৯৪৫ থেকে ৩
ডিসেম্বার ১৯৪৫ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল এবং সে যাত্রায় অভিযুক্ত তি
সেনাপ্রধানকেই নাম মাত্র শাস্তি দিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।[১] দ্বিতীয় পর্বে ১৯৪৬
সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবারও এই বিচার প্রহসন শু
হয়েছিল। ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৬ তারিখে বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বুরহা
উদ্দীনকে বিচারার্থে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সেই মামলায় অভিযু
পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন নুরউদ্দীন আহমেদ। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সাক্ষী
হিসাবে জমাদার রেজা হুসেন আনসারীকে দাঁড় করানো হয়েছিল। বুরাহা
উদ্দীনকে আদালত যাবজ্জীবন কারাবাসের দন্ডে দন্ডিত করেছিল। কিন্
সেনাপ্রধানের ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এর আদেশ মোতাবেক তাঁর দন্ড হ্রাস করে
তাঁকে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। ঐ বছরের ৫ই
ফেব্রুয়ারী তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্র সূত্রে আবার খবর আসে যে সামরিক
আদালত আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আব্দুল রশিদ আলিকেও যাবজ্জীব

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে এবং এইবারেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই দণ্ডাদেশের মেয়াদ কমিয়ে রশিদ আলির জন্য সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দিয়েছেন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষে বিচারের কাজ এবং আদালত চালু রাখার উদ্যোগটি টিঁকিয়ে রাখা বড় সহজসাধ্য ছিল না। কেননা বিচারের খবর জনসাধারণের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই জনতার বিক্ষোভ প্রচণ্ড আকারে আত্মপ্রকাশ করে। আগেই বলা হয়েছে যে, ৫ই নভেম্বার ১৯৪৫-এ দিল্লীর লালকেল্লায় প্রথম পর্বের বিচার শুরু হওয়ার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই শুনানির কাজ স্থগিত রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিচারের খবর জনতার কর্ণগোচর হয়ে যায়। সংবাদপত্রগুলিতে এই খবর ফলাও করে ছাপানো হতে থাকে। কাগজগুলিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবন কথা এবং গৌরবময় আত্মত্যাগের কাহিনী এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যাতে জনতা সহজেই অভিযুক্ত পক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবনত ও সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রগুলি এইভাবে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার ফলে দেশের সর্বত্র নানা ধরনের অশান্তি দেখা দিতে থাকে। জনতা দাবী করে যে ফৌজি সেনাদের নিঃশর্ত মুক্তিদান করতে হবে এবং দেশদ্রোহ তথা যুদ্ধাপরাধের জন্য তাদের কোন মতেই বিচার করা চলবে না। কলকাতা সহরে ২১ থেকে ২৩ নভেম্বার (১৯৪৫) অবধি এই আন্দোলন স্থায়ী হয়েছিল। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই তিন দিনের হাঙ্গামায় সহরে ৩০ জন লোক প্রাণ হারিয়েছিল এবং আনুমানিক ১৫০/২০০ জন লোক আহত হয়েছিল। এই কয়দিনের বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশকেও প্রায় ১৪ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল।

কলকাতার সেই তিনদিনের উত্তাল ঘটনা সম্পর্কে বাংলার লাট ক্যাসি একটি বিবরণী পেশ করেছিলেন। ভারত সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্সের কাছে লেখা বড় লাট ওয়াভেলের একটি চিঠিতে (তাং ২৭ নভেম্বার ১৯৪৫) এই বিবরণীর একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া ছিল।[২] এই রিপোর্ট পাঠ করে জানা যায় যে সহরে প্রধানত দুইটি খেপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রথম দফায় এক দল উন্মত্ত যুব জনতা ২১ শে নভেম্বার (১৯৪৫) দ্বিপ্রহরের শুরুতেই কলকাতার রাস্তায় নেমে পড়ে। ঐ দিন লালকেল্লায় সামরিক আদালতের অধিবেশন দুই সপ্তাহের মত স্থগিত থাকার পর আবার শুরু হয়েছিল এবং সেদিন সরকার পক্ষের সাক্ষী লেঃ নাগকে জেরা করার কথা ছিল। এই অধিবেশন শুরু হওয়ার সম সময়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং বিশেষ করে ধর্মতলা ওয়েলিংটনের (অধুনা লেনিন সরণী ও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে) সংযোগস্থলে ও চাঁদনি/মতিশীল স্ট্রীটের আশেপাশে জনতা অবরোধ সৃষ্টি করে। ক্যাসি জানিয়েছেন যে অবরোধকারী জনতা যে খুব হিংস্র হয়ে উঠেছিল তা নয়। কিন্তু

তারা চাপা উত্তেজনা ও আবেগে এতই অধীর হয়ে উঠেছিল যে তাদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক করার কোন অবকাশ ছিল না। জটলা করে পথের মাঝে বসে পড়ে তারা প্রায় টানা ১৫ ঘন্টা ধরে কান-ফাটানো স্লোগান দিয়ে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু এর পরের পর্যায়ে জনতা শুধু পথ অবরোধ করে এবং স্লোগান আউড়িয়ে ক্ষান্ত থাকেনি। এই সময় জনতার প্রতিবাদ সহসা আক্রমণাত্মক চেহারা ধারণ করে। এই পর্বে রাস্তায় চলাচলকারী যান-বাহন অর্থাৎ ট্রাম, ট্যাক্সি, মোটর গাড়ী, লরি, মিলিটারী ভ্যান ইত্যাদির উপর অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করে দেওয়া হয়। রাজপথের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যারিকেড তৈরী করে যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটানো হয়েছিল। এই ধরনের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ত খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ঘটনাক্রম যে-রকম দ্রুত গতিতে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল তা দেখে এই কথাই মনে হয় যে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক এই বিশৃঙ্খলা হয়ত রীতিমত ভেবে-চিন্তেই ঘটানো হয়েছিল। ক্যাসি এই সময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক ধর্মঘটের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই ধর্মঘটের সঙ্গে হয়ত আজাদ হিন্দ সেনাদের মুক্তির প্রশ্ন জড়িত ছিল না। কিন্তু এই ধর্মঘট সহরের সাম্প্রতিক হাঙ্গামাকে তীব্রতর করে তুলেছিল। ক্যাসি লিখেছেন যে সহরের এইসব ঘটনার মধ্যে জন মানসে সৃষ্ট ব্রিটিশ বিরোধিতার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল।

কলকাতার গন্ডগোলের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ক্যাসি পরের বছর (১৯৪৬) ২রা জানুয়ারী তারিখে বড়লাট ওয়াভেলের কাছে আরও বিস্তারিত একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন।[৩] এই রিপোর্টে তিনি বলেন যে কলকাতায় ২১ ও ২২ নভেম্বারে (১৯৪৫) ধর্মতলা স্ট্রীটের হাঙ্গামায় ছাত্র জনতাই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে অনতিবিলম্বে গুন্ডা, বদমাস, লুম্পেন এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একাংশ যোগ দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। ছাত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথ চলতি গাড়ী, লরি, বাস প্রভৃতির চালকদের বাহন বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু কালক্রমে সহরের নিকৃষ্ট ধরনের গুন্ডারা অনুরোধ-উপরোধের তোয়াক্কা না করে বলপ্রয়োগ করে সহরের পরিবহণ ব্যবস্থা স্তব্ধ করে দিতে উদ্যত হয়। উত্তর কলকাতায় এই আন্দোলনে প্রধানত ছাত্র ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী সামিল হয়েছিল। সেই কারণে এই অঞ্চলে বলপ্রয়োগের ঘটনার রিপোর্ট বড় একটা কানে আসেনি। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতা এবং বিশেষ করে ভবানীপুর ও ধর্মতলা অঞ্চলে ভীতি প্রদর্শনের অনেক ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল।

ক্যাসির উল্লেখিত চিঠির ৫নং অনুচ্ছেদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মন্তব্যটি করা হয়েছিল তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ক্যাসি লিখেছেন জনতার উপর

পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে অবরোধকারী মানুষের দল কখনও কখনও নিকটবর্তী গলিঘুঁজিতে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা যে-যার অবস্থান ক্ষেত্রের মাটি আঁকড়ে বসেছিল। কলকাতার বিক্ষোভকারী জনতার এই অকুতোভয় সংগ্রামী মনোভাব সহরের ইতিহাসে ইতিপূর্বে বড় একটা ঘটতে দেখা যায়নি। ক্যাসি অবশ্য বলেছেন যে জনতার এই বেপরোয়া মনোভাবের একটা কারণ সম্ভবত এই যে পুলিশ বরাবরই কিছুটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে জনতার আক্রমণ প্রতিহত করেছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের রিভলভার থেকে মাত্র ২/১ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া ছাড়া কোন বড় রকমের প্রত্যাঘাত করতে চায়নি। মোট কথা পুলিশের তরফে যতটা সম্ভব কম প্ররোচনা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জনতাকে সামলানের জন্য মিলিটারিকে প্রথম দিকে আদৌ ডাকাই হয়নি। এ-সবের ফলে জনতার মনে ত্রাস সৃষ্টি করা যায়নি। ক্যাসি লিখেছেন যে সেই দিনগুলিতে হাঙ্গামা হয়ত আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি তার আর একটি কারণ সম্ভবত এই যে কি কংগ্রেস কি কমিউনিস্ট উভয় দলই উত্তেজিত ছাত্র জনতাকে সংযত করবার জন্য বারংবার আবেদন জানিয়েছিলেন। ২৩ তারিখে (নভেম্বর ১৯৪৫) কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে গাড়ী করে পাড়ায় পাড়ায় শান্তি আবেদন প্রচার করা হয়েছিল। তাছাড়া ঐ দিন পুলিশের তরফেও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য যথোপযুক্ত তৎপরতা অবলম্বন করা হয়েছিল। গভর্ণর নিজেও বেতার বক্তৃতার মাধ্যমে হাঙ্গামা দমন করবার জন্য প্রয়োজন বোধে সহরের রাস্তায় সেনা সমবেশ করা হবে বলে হুমকি জারি করেছিলেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও বড় সহজে সহরের বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়নি। এর জন্য ১৪ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করতে হয়েছিল, ৩৩ জনকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, প্রায় ২০০ জন অসামরিক নাগরিককে নানা ধরনের মারাত্মক আঘাত পেতে হয়েছিল, অন্তত ১৫০টি পুলিশ ও মিলিটারি গাড়ি ভস্মীভূত হয়েছিল এবং ৭০ জন ব্রিটিশ ও ৩৭ জন আমেরিকান সৈন্য আহত হয়েছিলেন।[৪]

২১-২৩ নভেম্বারের (১৯৪৫) ঘটনা সম্পর্কে ক্যাসির রিপোর্টে সরকারী ভাষ্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তা থেকে ঘটনার পূর্ণ তাৎপর্য ও মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ক্যাসির বয়ানে যে হাঙ্গামার কথা বলা হয়েছে সেই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ ও নেতৃত্বহীন জনতার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের কিছু কিছু বিবরণী সে যুগের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। এইসব বেসরকারী রিপোর্ট এবং সংবাদপত্রের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে আন্দোলনের প্রথম দিনেই (অর্থাৎ বুধবার, ২১ নভেম্বার তারিখে) আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস পালনের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ার যে বিরাট ছাত্র সমাবেশ হয়েছিল তা ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার জন্য পুলিশ

সমবেত জনতার উপর বলপ্রয়োগ করে এবং তার ফলে একজন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়েছিলেন। ক্যাসি তাঁর ২রা জানুয়ারী তারিখের লেখা চিঠির ৭ নং অনুচ্ছেদে পুলিশ কমিশনারের তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে লিখেছিলেন যে পুলিশ সরকারী সম্পত্তি রক্ষা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণ ছাড়া কোথাও গুলি চালায়নি এবং প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে কখনও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেনি। কিন্তু ২৩শে নভেম্বার ১৯৪৫-এর আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা ঐ কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখেন যে গত বুধবার ২১শে নভেম্বার তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (১৮নং মীর্জাপুর স্ট্রীট) ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ক্লাসে যোগ না দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল ও শোভাযাত্রা বের করে। কিন্তু শোভাযাত্রাকারীরা রাস্তায় শান্তভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। মিছিলটি ডালহাউসি স্কোয়ারের কাছে উপস্থিত হলে পুলিশ যখন এর গতিরোধ করে তখন মিছিলকারীরা অনন্যোপায় হয়ে রাস্তাতেই বসে পড়ে। সেখানে তারা তিনঘন্টা যাবৎ অবস্থান করে 'জয় হিন্দ', 'ভারত ছাড়ো', 'আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই', 'নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ'—ইত্যকার নানারকম স্লোগান দিতে থাকে। আর ঠিক "এমনি সময় ঠিক এই মুহূর্তে বিদ্যুতের বেগে ছুটে এল অশ্বারোহী জাঠ পুলিশ। মতি শীল স্ট্রীট থেকে ছুটে এল ধর্মতলা দিয়ে ওপারে ম্যাডান স্ট্রীটের দিকে জনতাকে দু'ভাগে ভাগ করে। ঘোড়ার চাঁটে ছিটকে পড়ল একজন—হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা শিখ ছেলে। তখনই গুলি ছুটল। কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বার ৭-১০ মিনিটের আলো-অন্ধকারে যে এ দৃশ্য দেখেনি—সে বুঝতেও পারবে না কোনদিন কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল। গুলি ছুটলো উল্টো দিক থেকে। ভীড়ের চাপে স্রোতের মত জনতা পেছিয়ে যাচ্ছে।...শুধু মনে হলো হাজার হাজার ছেলে পালাচ্ছে। ভীড়ের মধ্যে ফিরে দাঁড়ালাম।...চেঁচিয়ে উঠলাম—ফিরে দাঁড়াও। পালাব না—কেউ পালাব না। সেই মুহূর্তে শুধু মনে ছিল—এগুতে হবে, আমাদের এগুতে হবে। পালানো কাপুরুষতা—রাস্তার মাঝখানে আছড়ে পড়েছে গুটি দুই বুলেট-বেঁধা দেহ। লাঠিতে থেঁতলে যাওয়া মাথা দশ বছরের ছেলেকে টেনে তুললাম।"[৫]

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যক্ষদর্শীর উল্লেখিত বিবরণীটি ২৩শে নভেম্বার আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদেও সমর্থিত হয়েছে। এই সংবাদে লেখা হয় যে গত বুধবার অর্থাৎ ২১ তারিখে সন্ধ্যাবেলা কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটে ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশের গুলি ও লাঠি চালানোর ফলে রামেশ্বর ব্যানার্জী নামে একটি ১৯ বছরের যুবক নিহত ও আরও ৬০ জন আহত হয়। রামেশ্বর সহ ৫৪ জন আহতকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রামেশ্বরকে

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় সে পথের মধ্যেই মারা পড়ে। আহতদের মধ্যে অন্তত ২১ জনের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের হাসপাতালেই ভর্তি করে নিতে হয়েছিল। ২৪শে নভেম্বারের আনন্দবাজারে আরও অনেক হতাহতের খবর ছাপা হয়। এই খবরে জানানো হয়েছিল যে বৃহস্পতিবারে (অর্থাৎ ২২ নভেম্বারে) ভবানীপুর থানার কাছে যখন উত্তেজিত জনতা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল সেই সময় পুলিশ আবার জনতার উপর লাঠি চালায় এবং গুলি বর্ষণ করে। ফলে ৫ জন নিহত এবং প্রায় ৫০ জন আহত হয়। উক্ত নিহত পাঁচ জনের মধ্যে পদ্মপুকুর রোডের বলাই চন্দ্র মিত্র নামে একজন যুবক ছিলেন। ঐ একই দিনে কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্যা এবং কর্পোরেশনের কাউন্সিলর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী শহীদ রামেশ্বরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যোগ দেওয়ার পরে ফিরে যাওয়ার সময় সন্ধ্যা ৭.৩০টা নাগাদ হাজরা ও রসা রোডের কাছে মিলিটারি লরির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ বাদেই মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টগুলি পাঠ করলে অনায়াসেই বোঝা যায় যে গভর্ণর ক্যাসি পুলিশের সংযত আচরণ এবং নিতান্ত সীমিত এবং অপরিহার্য ক্ষেত্রে পুলিশের গুলি চালানোর ব্যাপারে যে সাফাই গেয়েছিলেন তা সর্বাংশেই অমূলক ছিল। বস্তুত বেসরকারী রিপোর্টগুলিতে ছাত্র জনতা এবং ছাত্র মিছিল যে প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণ ছিল সে কথাই বলা হয়েছে। অথচ এই শান্তিপূর্ণ মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ তাদের উপর লাঠি ও গুলি চালিয়েছিল। ক্যাসির রিপোর্টে হতাহতের যে খবর দেওয়া হয়েছিল তারও কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না।

২১-২৩ নভেম্বারের (১৯৪৫) ঘটনায় পুলিশের আচরণের মধ্যে একটা ত্রাস ও মরিয়া ভাব ফুটে উঠেছিল। এই মরিয়া ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গভর্ণর ক্যাসি ঐ একই চিঠিতে পুলিশ কমিশনারের অভিমত উল্লেখ করে লিখেছিলেন বিক্ষোভকারী জনতা এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং সংখ্যার বিচারেও তারা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে কলকাতা পুলিশের সমস্ত ফোর্স তাদের মোকাবিলা করার জন্য পথে নামানো হলেও তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারত না। ক্যাসি জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্যে '৪২-এর বেপরোয়া মানসিকতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই ঐ একই চিঠির অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন যে তিন দিনের হাঙ্গামায় সব কিছুই যে আগে ছকে রাখা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক গড়ে তোলা হয়েছিল তা নয়। তবে ঘটনাক্রমের মধ্যে জনতার একটা আইন ভাঙার মত্ত উচ্ছ্বাস টের পাওয়া গিয়েছিল, ঠিক ১৯৪২-এর মত—যখন অনেক তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণরোষ বিদ্যুৎগতিতে নানাস্থানে

ছড়িয়ে পড়ত এবং ফলত গোটা সমাজ জীবন সহসা স্তব্ধ হয়ে যেত। আর
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে হাঙ্গামার সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার নিত্য নোতু
উপায় ও প্রয়োগ পদ্ধতিও কাজে লাগানো হয়েছিল। যেমন কলকাত
কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বিভাগের শ্রমিকগণ ঠিক এই সময়েই ধর্মঘট ক
সহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় রীতিমত ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সকল শ্রমিকদে
আন্দোলন এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুব জনতার প্রতিবাদ-আন্দোলন পরস্পর মিলে
মিশে একাকার হয়ে যায় এবং সহরের নাগরিক জীবন এবং আইন-শৃঙ্খলা
অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলার ঘটনার কিছু কিছু আনুপূর্বিক বিবরণ না
সূত্র থেকে সঙ্কলন করে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে[৬]। প্রথমেই ২১
নভেম্বারের কথা। কী ঘটতে যাচ্ছে সেদিন তার কোন পূর্বাভাস সহরবাসী
কাছে ছিল না। সেদিন গান্ধীবাদী ছাত্র সংগঠন একটা প্রতিবাদ সভা ডেকেছি
বটে, কিন্তু সেই সভা বা সমাবেশের চেহারা কিরকম হবে সে বিষয়ে কো
ধারণা করা যায়নি। সহসা দেখা গেল রাস্তায় অনেক লোক জমে গেছে এব
তাদের ঠেকানোর জন্য—

"বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। ঘোড়-সওয়ার পুলিশও রয়েছে—তা
মাঝে মাঝে এসে ভীড় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এমন সময় দেখলাম চাঁদনি
দিক থেকে একদল খাকসার সামরিক কায়দায় মার্চ করে আসছে। তারা এসে
পুলিশ কর্ডনকে ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে লাঠি চার্জ—হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি, রাস্তা
সাধারণ লোকের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। আশ-পাশের মুসলমা
ছেলেরাও নেমে পড়েছে। রাস্তার আলো নিভিয়ে দেওয়া হল—বাল্‌ব ভে
ভেঙে। এই প্রথম রাস্তা অন্ধকার করল কলকাতার মানুষ।"

ছাত্র নেতা অবন্তী সান্যাল সেদিন ধর্মতলা স্ট্রীটের হাঙ্গামায় জড়ি
পড়েছিলেন। তিনি সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছেন ঃ

"ধর্মতলার বাঁক ঘুরছি তখন। সামনে আটকে গেল একটা আমেরিকা
জিপ। শোভাযাত্রা গর্জন করছে—'জয় হিন্দ', 'কুইট ইন্ডিয়া'...ফুটপাত আ
রাস্তার একাংশ আটকে চলেছি আমরা, কখনো ট্রাম লাইন আটকে, কখন
সঙ্কুচিত হয়ে।...জ্যোতি সিনেমা পেরিয়ে এলাম। সামনে ম্যাডান আর ম
শীল স্ট্রীট। পথ আটকাল পুলিশ। বসে পড়ল তৎক্ষণাৎ শ দুয়েক ছেলে রাস্তা
উপরে। লাইন তখন ভেঙে গেছে। ছুটে আসছে ছেলের দল, কয়েক হাজার
চীৎকার করে। পথ আটকেছে পুলিশ। সামনে লালমুখো ফিরিঙ্গী সার্জেন্টে
দল। ভ্যানের উপর লাঠিধারী পুলিশ...তখন ৩.৩০ মিনিট। ছেলেরা চেঁচাচ্ছে
স্লোগানের হুঙ্কারে কাঁপছে চারদিক। বক্তৃতা দিচ্ছে কেউ কেউ ; চীৎকার কর

প্রাণপণে। ততক্ষণে ভীড় জমে গেছে পথচারীর, 'চালাও ভাই', 'এই তো চাই'। গান ধরেছে পা ফেলার তালে তালে—যে গান গাইত আজাদ হিন্দ ফৌজ। যে যেমন করে পারে গেয়ে উঠছে সমবেত কণ্ঠে।

হেলে পড়ল সূর্য।...প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ছাত্রদল। উত্তেজনার বশে আক্রমণ করবে মুষ্টিমেয় লালমুখো সার্জেন্টগুলোকে। কে একজন কংগ্রেসী প্রৌঢ় ভদ্রলোক আবেদন জানালেন শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে যতদিন পর্যন্ত না পুলিশ রাস্তা ছেড়ে দেয়। এমনি সহিষ্ণুতা জীবনে দেখিনি : এমন ধৈর্য কখনো আশা করিনি ছাত্রদের তরফ থেকে। দেখছি আর আশ্চর্য হচ্ছি, ঘণ্টার পর ঘন্টা বসে আছি।"

ছাত্র নেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় সেদিনকার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। স্মৃতিচারণার অবকাশে তিনি ঘটনার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে লিখলেন ঃ

"একটার পর একটা ঘণ্টা কেটে গেল—১০টা, ১১টা, ১২টা...সময়ের খেই হারিয়ে ফেলছি ; শুধু শীত বেড়ে যাওয়া থেকে বুঝছি যে রাত্রি গভীর হচ্ছে। বসে আছি ছাত্রদের সঙ্গে ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর।...অন্ধকার রাত্রে গ্যাসের আলোয় ক্লান্ত মুখগুলোর দিকে চেয়ে দেখলাম—সেখানে চাঞ্চল্য নয়, জেগে রয়েছে শুধু অনমনীয় দৃঢ়তা।...একে একে এলেন কত নেতা, কত শুভাকাঙ্ক্ষী। কিরণবাবু এলেন—শরৎবাবুর নামে অনুরোধ করলেন সবাইকে ফিরে যেতে।...কিন্তু কে শোনে তাদের কথা ? ফিরে এরা যাবে না—পুলিশের হুমকির সামনে এরা হটবে না।"

সেদিন দ্বিপ্রহর থেকে প্রায় মধ্যরাত অবধি কলকাতার রাস্তায় যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা ফরাসী বিপ্লবের সময়কার ব্যারিকেড যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। অবরোধকারী জনতার মধ্যে থেকে ইঁট ছোড়ার অভিযোগে পুলিশ লাঠি ও গুলি চালালে জনতার প্রতিরোধ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা পথ চলতি মিলিটারি ট্রাকে অগ্নি সংযোগ করে এবং পুলিশকে নিশানা করে বিপুল বিক্রমে ইঁট ছুঁড়তে থাকে। পুলিশের লাঠি ও গুলি চালানোর ফলেও অনেকে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের জায়গা থেকে একচুল নড়েনি। এই অসম লড়াই এবং মরণপণ প্রতিরোধ মেজাজই ছিল ২১শে নভেম্বারের গণ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট। পুলিশ দিলীপ বিশ্বাস, এস. পি. ব্যানার্জী, অজিতকৃষ্ণ ঘোষ, প্রসাদ চন্দ্র দত্ত, বিজলী কুমার তরফদার, শ্যামলাল সিং, কুঞ্জবিহারী ভৌমিক, মনোরঞ্জন মজুমদার, অজিতকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেক ছাত্র ও নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু ছাত্রদের কোনভাবেই ভয় দেখানো যায়নি। প্রাদেশিক ছাত্র নেতা রণজিৎ গুহ উত্তেজিত জনতার মেজাজ

লক্ষ্য করে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বুঝিবা ইনসারেকশনই (অভ্যুত্থান) শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যত্র আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখলেন ঃ "সে রাত কি কলকাতার মানুষ ঘুমোতে পেরেছিল! অফিস ফেরত লোকেরা কি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়নি ধর্মতলার বুকে এই অলৌকিক দৃশ্যের কথা! গত চার বছরের যত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, অপমান, জ্বালা এবার কি তাহলে বিস্ফোরণ ঘটাতে চলেছে! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের মহড়া কি ঐ ধর্মতলা স্ট্রীটেই শুরু।"

পরের দিন অর্থাৎ ২২শে নভেম্বার (১৯৪৫) জনতার মেজাজ আরও জঙ্গী আকার ধারণ করেছিল। ২৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ দিনের ঘটনার রিপোর্ট দিয়ে সংবাদদাতা লেখেন ঃ

"কলিকাতার পুলিশের গুলী ও লাঠি চালনার প্রতিবাদে গত ২২শে নভেম্বার হাওড়ার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের বিরাট শোভাযাত্রা হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে এবং হাওড়ার সমুদয় ট্রাম, বাস এবং বহু দোকান ও কারখানা বন্ধ থাকে। কলকাতার বহু রাস্তার উপর দড়ি টানাইয়া উহাতে সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির প্রতিকৃতি পুষ্পশোভিত করিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান রাস্তার পার্শ্ববর্তী গ্যাসপোস্টে সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি টাঙ্গানো দেখা যায়।...সহরে যান বাহন বন্ধ থাকায় অফিসের কর্মচারীরা অফিসে যাইতে পারেন নাই বলিয়া অনেক অফিস নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বন্ধ হইয়া যায়।...বুধবার পুলিশের গুলী চালনার প্রতিবাদে ও পুলিশের গুলী ও লাঠি চালনায় নিহত ও আহতদের উদ্দেশ্যে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য বৃহস্পতিবারও কলিকাতার ছাত্রগণ ক্লাসে যোগদানে বিরত থাকে। বৃহস্পতিবার সকাল হইতেই সহরের সমস্ত রাস্তার ট্রাম ও বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন রাস্তায় ট্রাম বাস চালিতেছিল ; কিন্তু বেলা ১১টার পর বাস-ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়।"

সহরের অবস্থা ছাত্র নেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কথায় আরও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেন ঃ

"পরদিন বাইশে নভেম্বার। রাস্তায় পা দিয়েই বুঝলাম ঝড় উঠেছে। ঘরের মানুষ আজ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম-বাস বন্ধ-ইউনিয়নের নির্দেশে।...মোড়ে মোড়ে জটলা পাকাচ্ছে, বিবর্ণ মুখ সব হিংস্র হয়ে উঠেছে। প্রতিকার চাই, প্রতিকার। গত পাঁচ বছরের বহু দুঃখ, দুর্ভিক্ষের দিনের জমে থাকা শোক, আশাহীন ভবিষ্যতের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবার বেপরোয়া লড়াই—সব উথলে উঠেছে। ছড়িয়ে পড়েছে আজ শহরের প্রতিটি কোণে। বড়বাজারের বিহারী ব্রাহ্মণের দোকান আর কলুটোলার মুসলমানের দোকান সব আজ বন্ধ।...ঘুরে

বেড়াচ্ছি রাস্তায় রাস্তায়। এরি মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন করে শোভাযাত্রা ছোট, বড়, ছাত্রছাত্রীর। কোনটা চলেছে আকাশ ফাটানো আওয়াজ তুলে। কেউ বলে দেয়নি কিন্তু সবাই আপনা থেকেই এসে জমা হচ্ছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সকাল থেকে। দশ হাজার, বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার—বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে এসে ঢুকলো ইসলামিয়ার ছাত্ররা লীগের সবুজ ঝান্ডা উড়িয়ে, 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' আর 'পুলিশী জুলুম বন্ধ হোক' আওয়াজ তুলে। ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে হিন্দু ছেলেরা জড়িয়ে ধরল তাদের—'আল্লা হো আকবর' আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে মিশে ভরিয়ে তুলল চারিদিক। তারই মধ্যে এলো লাল ঝান্ডা উড়িয়ে মজুরের দল। এলো খাকসার, এলো গৈরিক পতাকা উড়িয়ে হিন্দু মহাসভার ছাত্ররা।...হঠাৎ চেয়ে দেখি পুলিশ ব্যরিকেডের পিছনেও জেগে উঠেছে পতাকার পর পতাকা, শোনা যাচ্ছে আওয়াজ—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। হাজার হাজার ছাত্র আর নাগরিকের আর এক মিছিল এসেছে উল্টো দিক থেকে। যাঁতাকলের মধ্যে পড়েছে পুলিশের দল। অগণিত মানুষের ক্রোধ ঘিরে ফেলেছে তাদের...পালাচ্ছে, ওরা পালাচ্ছে। একটার পর একটা গাড়ী বোঝাই পুলিশ গণেশ এভিনিউর দিকে রওনা হয়েছে...তারপর লক্ষ লক্ষ লোক হেঁটে গেল ডালহাউসির বুকের উপর দিয়ে, স্লোগানে আকাশ ফাটিয়ে। ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিস খালি করে বেরিয়ে এল কেরাণীবাবুরা। রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দা ছেয়ে গেছে দর্শকে, যোগ দিয়েছে অফিসের যত দারোয়ান আর কুলী। যারা দেয়নি তারাও বারান্দা থেকে, জানালা থেকে রুমাল নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের। এমন বিপুল অভিনন্দন আর কেউ কোনদিন দেখেছি কি?"

বাইশের পরের দিন ২৩শে নভেম্বার তারিখেও কলকাতা সহর একই রকম উত্তাল ছিল। শুধু তা-ই নয় কলকাতার উত্তাপ দূর পশ্চিম ভারতের প্রাণকেন্দ্র বোম্বাই সহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।[৭] ঐ দিন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বোম্বাই-এর ছাত্রসমাজ কলকাতায় পুলিশের হাতে নিগৃহীত ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে একটি বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের করেছিল। বোম্বাইয়ের মত ভারতবর্ষের অন্যান্য ছোট-বড় সহরেও কলকাতার ঘটনার প্রতিবাদ করে নানারকম বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার নানাস্থানে এই দিনও ছাত্র অসন্তোষ ও যুব-জনতার বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতায় বিদ্রোহী ছাত্রদের শায়েস্তা করবার জন্য পুলিশ অন্তত দুই জায়গায় আবারও গুলি চালায়। ফলে অন্তত ২৪জন আহত হয়। এদের মধ্যে ১৮ জনের আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে হাসপাতালের বেডে তাদের ভর্তি করে নিতে হয়েছিল। সহরের অন্যত্রও নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয় এবং সে কারণে আরও ২৭জন আহত হয় এবং

৫জন গুলির আঘাতে অকুস্থলেই মারা পড়ে। এই ঘটনায় হাসপাতালে যাদের আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল পরে তাদের মধ্যে আরও সাতজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুলিশের এই রকম উন্মত্ত মারণ উদ্যোগ বন্ধ করবার জন্য শরৎচন্দ্র বসু গভর্ণর ক্যাসির সচিবের মারফত ২২ তারিখের সন্ধ্যাবেলাতেই এই মর্মে অনুরোধ করে পাঠান যে পুলিশকে যেন ছাত্র-জনতার উপরে নির্বিচারে গুলি চালাতে নিবৃত্ত করা হয়। শরৎচন্দ্র বলেন যে পুলিশ যদি না মারমুখী হয়ে ওঠে তাহলে আবেগপ্রবণ ছাত্র সমাজকে হয়ত অচিরেই সংযত করা সম্ভব হবে। কিন্তু গভর্ণর জননেতার এই সদুপদেশে কর্ণপাত করেন নি। গুলি ও লাঠি চালানোর ঘটনা আগের মতই অব্যাহত ছিল।

২৩ নভেম্বার ছাত্র ও যুব-জনতার বিক্ষোভের পাশাপাশি কলকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বিভাগের শ্রমিকদের ধর্মঘটও কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে ধর্মঘটী শ্রমিক ও বিক্ষোভরত যুব-জনতার মধ্যে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্বাহ্নেই কোনরকম বোঝা-পড়া হয়ে গিয়েছিল বলে কর্তৃপক্ষের নিকট খবর ছিল না। কিন্তু লড়াইয়ের মাঠে নেমে দুই দলই পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে কর্তৃপক্ষের অবস্থা সঙ্গিণ করে তুলেছিল। কর্পোরেশনের এই আন্দোলনে প্রায় কুড়ি হাজার কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে সহরে টানা কয়েক দিন ধরে পরিশ্রুত এবং অপরিশ্রুত অর্থাৎ সব রকমের জলের সরবরাহই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলার উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পাশাপাশি এই বাড়তি উপদ্রবের ফলে কলকাতার নাগরিক জীবন একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

২১-২৩ নভেম্বারের (১৯৪৫) ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে প্রথমেই যে ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তা হল ঐ কয় দিনের আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্র। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা স্থানে ৫-১১ নভেম্বারের মধ্যে আই. এন. এ. দিবস পালিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের জন্য তবু কিছু প্রচার ও প্রস্তুতি ছিল। দেশপ্রিয় পার্কে শরৎ বসু, নেহরু ও প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। কিন্তু একুশ তারিখের আন্দোলনের জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না। অবশ্য গান্ধীবাদী ছাত্র সংগঠন, ছাত্র কংগ্রেস ঐ দিন একটা প্রতিবাদ সভা ডেকেছিল। কিন্তু তাদের ডাকে কলকাতা-মাতানো একটা বিশাল সমাবেশ হবে এমন আশা কারও মনেই ছিল না। বিশেষ, ঐ দিন ইডেনে একটা বড় ক্রিকেট খেলাও ছিল এবং কলকাতা সহরে সচরাচর যা হয়ে থাকে খেলার দিনে ইডেনের গ্যালারিই সবচেয়ে বেশী লোক টানে। তাই সেদিনের সভার ব্যাপার নিয়ে কলকাতা পুলিশের বিশেষ

াথা ব্যথা ছিল না। তাছাড়া নিশ্চিন্ততার আরও একটা কারণ ছিল। সেদিনের সভা ও মিছিলের উদ্যোক্তারা কমিউনিস্ট ছাত্রদের শরিক করতে চায় নি। আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিল কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক পন্থী ছাত্র ও যুব জনতা।

কিন্তু ২১ তারিখের গণ বিক্ষোভ প্রমাণ করেছিল যে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যেমন নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকে না, তেমনই গণ আন্দোলন একবার শুরু হয়ে গেলে লড়াইয়ের মাঠে এবং ব্যারিকেডের অন্তরালে রাজনীতির যাবতীয় তুচ্ছ বিভেদগুলিও সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যায়। একুশে নভেম্বারের রাস্তায় হিন্দু, মুসলমান, বাঙালী, শিখ সবাই এক সঙ্গে সামিল হয়েছিল। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী এমন-কি সহরের নিকৃষ্ট গুন্ডা অর্থাৎ লুম্পেন প্রোলেতারিয়েটরাও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। বন্দী মুক্তির জন্য ১৯৪৪ থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি জোরদার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল।[৮] কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন তাদের যোগদান করতে আহ্বান জানায় নি যেমন সত্য তেমনি কম্যুনিস্টদের নিজেদের দিক থেকেও হয়ত কিছুটা দ্বিধা ও অস্বস্তি ছিল। আগস্ট আন্দোলনের সময় তাদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাদের বিভ্রান্তিকর মূল্যায়ন অনেকেই মনে রেখেছিল। সেইজন্য তাদের যেমন সহজে একুশের আন্দোলনে নিতে চাওয়া হয়নি তেমনি তাদের পক্ষ থেকেও সমস্ত জড়তা ও অস্বস্তি কাটিয়ে সেদিনের অভ্যুত্থানে চট করে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়নি।[৯] কিন্তু জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের জোয়ারে সমস্ত বিভেদের আড়াল ভেসে গিয়েছিল। "ঘনায়মান রাতের প্রতিটি প্রহর ক্রমশ নিয়ে আসছে কমিউনিস্ট ছাত্রদের ব্যারিকেডের সামনের সারিতে। কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট ছাত্রনেতা সবাই এখন পুলিশের মুখোমুখি। সবাই এক নিরবচ্ছিন্ন প্রতীক্ষার শরিক।"

স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনে এবং বিশেষত তার উচ্ছ্বাসের শীর্ষ মুহূর্তে অনেক সময়েই প্রচলিত অর্থের আতিশয্য দেখা যায়। আর সেই আতিশয্য কোন কোন সময়ে রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত নেতাদের অস্বস্তির কারণ ঘটায়। অবন্তী সান্যাল ও গৌতম চট্টোপাধ্যায় দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করেছেন ঃ

"একুশে-র রাত্রিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও ধর্মতলায় উপস্থিত ছিলেন। স্পষ্টত তাঁরা মনস্থির করতে পারেননি। কুমুদ বিশ্বাস বলছেন, ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বরের ঘটনাকে আমরা রিয়ালাইজ (উপলব্ধি) করতে পারিনি। উই ফাম্‌বল্‌ড' (আমরা ইতস্তত করি)—আমরা দ্বিতীয় দিনে যোগ দিই। আমাদের মনে বিস্তর খটকা ছিল। সাহেবের টুপি খুলে দেওয়া—মেমদের গাউন ধরে টানাটানি—সাহেবের দোকানের কাঁচ ভাঙার ঘটনাকে বড় করে দেখি।' তাই

পার্টি পুস্তিকায় লেখা হয় : 'লাল ঝান্ডার গাড়ী পথে পথে প্রচার করতে লাগলো : উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, সকল দলের মিলিত প্রতিবাদ চাই।'[১০]

কমিউনিস্ট পার্টির মত কংগ্রেসেরও ঐ এক দশা। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের সময় ইতস্তত টুকরো হাঙ্গামার মুখে কংগ্রেস ইতিপূর্বেও দিশাহারা ভাব দেখিয়েছে। ৪২-এর আন্দোলনের বাঁধন হারা উচ্ছ্বাসকে স্বয়ং জওহরলাল নেহরুই 'জনতার উন্মত্ত আচরণ' বা improptu frenzy of the mob বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন এবং যে আন্দোলন তাঁরা নিজেরাই শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে তাঁরা এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। একুশে নভেম্বারেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। রাস্তায় অবরোধকারী ছাত্র, যুব-জনতা আশা করেছিল যে কংগ্রেসী নেতারা তাদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় কেউ-ই এলেন না।[১১] আর যাঁরা এসেছিলেন যেমন কিরণ শঙ্কর রায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, সুরেশ মজুমদার, শরৎ বসু প্রমুখ সকলেই শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংযত আচরণের দোহাই পেড়ে ছাত্রদের যে-যার ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র একুশের সমাবেশে ছাত্রদের অনুরোধ সত্ত্বেও উপস্থিত হন নি (তিনি পরের দিন গিয়েছিলেন)। তারপর ছাত্ররা যখন সেইদিনই তাঁর উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতে হাজির হয়ে তাঁকে সমাবেশে উপস্থিত হবার জন্য আবারও অনুরোধ জানিয়েছিল তখন সেই অবকাশে তিনি তাদের রীতিমত তিরস্কার করেন। এই সময় তিনি মিছিলকারী ছাত্রদের উদ্দেশে একটি লিখিত বাণীতে এই বলে অভিযোগ করেন যে, ছাত্ররা নাকি কংগ্রেসী নেতাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন :

"ছাত্রগণ, তোমাদের বিশৃঙ্খল আচরণ আমার মনোবেদনার কারণ হইয়াছে। আমি বারংবার তোমাদের নিকট শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল ভাঙ্গিবার আবেদন জানাইয়াছি এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত অতুল কুমার, শ্রীযুক্ত ইন্দু বিদ্ প্রভৃতিকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি। কিন্তু তোমরা কর্ণপাত কর নাই। তাঁহারা আমার নামে আবেদন জানান, কিন্তু তাহাতেও তোমরা কর্ণপাত কর নাই। তোমরা হাঙ্গামা-প্ররোচকদের ফাঁদে পড়িয়া তাহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছ। তোমরা যুক্তির নির্দেশ গ্রাহ্য কর নাই। তোমরা তোমাদের কার্যে ও আচরণে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। আর আমি কিছু বলিতে পারি না। তথাপি আমি শেষবারের জন্য কংগ্রেসের নামে তোমাদিগকে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল ভাঙ্গিয়া দিতে বলিতেছি। এই শেষ মুহূর্তেও আমি আশা করিতেছি তোমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে এবং আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিবে। আমার এই পরামর্শ তোমরা অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছ।"[১২]

শরৎচন্দ্র তাঁর বাণীতে যে হাঙ্গামা-প্ররোচকদের ফাঁদের কথা তুলে ভয় দেখিয়েছেন সেই ভয় হল কমিউনিস্টদের ভয়। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে াত্র আন্দোলন যে-রকম রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে তা কমিউনিস্টদের প্ররোচনা ভিন্ন সম্ভব নয় এবং এই আন্দোলনে যদি অবিলম্বে রাশ টানা না যায় তাহলে া পুরোপুরিই কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে। বস্তুত এই আমলে কংগ্রেসী াজনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কমিউনিস্ট বিরোধিতা। এই বিরোধিতা ৯৪৫ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পুনা অধিবেশনে াথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় এবং এই বিরোধিতার জের টেনে কংগ্রেসের াক্ষ থেকে কমিউনিস্টদের চার্জ শীট দিয়ে বেশ কয়েকজন শীর্ষ কমিউনিস্ট নতাকে বছরের শেষ দিকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃতও করা হয়। কমিউনিস্ট িরোধিতার এই খর পরিবেশে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের দখলে লে যাক—এই রকম ভবিতব্য স্বভাবতই কংগ্রেসী নেতাদের কাছে অভিপ্রেত িল না। তবে সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ হিসাবে ছাত্ররা হয়ত শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে কছু বেশীই প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু ছাত্রদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, কেননা রৎচন্দ্র তখন প্যাটেল প্রমুখের ঘনিষ্ঠ হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর ভাঙ্গা সম্পর্ক োড়া দেবার চেষ্টায় নিরত এবং এমতাবস্থায় কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করা াড়া তাঁর পথ ছিল না। এই জন্য কোন রকম রাখা-ঢাকা না করে তিনি এক কম প্রকাশ্যেই একুশের ধর্মঘটী ছাত্রদের কমিউনিস্টদের সংশ্রব ত্যাগ করবার ন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৩] বলা বাহুল্য ছাত্ররা শরৎচন্দ্র এবং অপরাপর ংগ্রেসী নেতাদের এহেন আচরণে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিল। কেননা এতদিন রে তারা যে কথাটি বারবার শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তা হল এই যে মিউনিস্টদের বিরোধিতার জন্য ভারত ছাড়ো আন্দোলন বাংলাদেশে ব্যর্থ হয়ে ায়েছিল। কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য সুভাষ বিরোধিতার কথাও ফলাও করে প্রচার রে ছাত্র সমাজের কাছে তাদের দেশদ্রোহী বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু কুশে নভেম্বারের সেই 'অলমোস্ট রেভোলিউশন' বা প্রায়-বিপ্লবের মুহূর্তে যখন মিউনিস্টরাও সুভাষচন্দ্র তথা বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজিদের সমর্থনে আন্দোলনে াগ দেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল তখন কেন-যে কংগ্রেসী নেতারা মিউনিস্টদের ছোঁয়াচ বাঁচানোর জন্য নিজেদের অনুগত ছাত্রদের উপদেশ য়েছিলেন সে কথা তাদের বোধগম্য হয়নি। বোম্বাইয়ের একটি নির্বাচনী সভায় কৃতা দেওয়ার অবকাশে প্যাটেলের মত একজন প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী নেতা কেন- । কলকাতায় ২৪ নভেম্বারের ঘটনার উল্লেখ করে ছাত্রদের তুচ্ছ কলহে trifling quarrels') শাক্তিক্ষয় ('frittering away') করার জন্য তিরস্কার রেছিলেন সে-কথাও তারা বুঝতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং গান্ধীজির

প্রতিক্রিয়াটিও বিশেষ লক্ষণীয় বলে মনে হয়। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বার মা
অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আগস্ট বিপ্লবের গৌরবময় প্রতি
ঘটনার জন্য (যদিও ইতিহাস জানে এবং কংগ্রেসের নেতারা নিজেরাও জানতে
যে ৪২-এর উত্তুঙ্গ ঘটনাগুলোর মধ্যে সর্বতোভাবে অহিংসার স্থান ছিল না।
কংগ্রেসের অনেক সদস্যই প্রকাশ্যে গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই এক
কংগ্রেস এবং বিশেষত গান্ধীজি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য বাংলা
গভর্ণর ক্যাসির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা বৈঠকে বসেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কি
কমিটিও তার ৭-১১ ডিসেম্বার ১৯৪৫-এর অধিবেশনে সম্ভবত নভেম্বার ঘটনা
যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্য অহিংসার আদর্শের উপর পুনরায় আস্থা জ্ঞাপ
করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১৪]

আসলে ভারতবর্ষের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কথা মনে রাখলে কংগ্রে
সহ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির এই স্ববিরোধী আচরণে বিশেষ বিস্ময় সৃ
হয় না। মনে রাখতে হবে যে সুভাষ-কেন্দ্রিক তুমুল আবেগকে যেমন নির্বাচ
জেতার জন্য কাজে লাগানোর প্রয়োজন ছিল তেমনি নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি যা
ভালোয় ভালোয় কেটে যেতে পারে সেজন্য সামাজিক স্থিতি ও তথাকথিত শান্তি
শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদটাও বড় কম ছিল । তাই বন্দীমুক্তির জন্য সোচ্চা
দাবী জানিয়েও সেই দাবীকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কোন তীব্র গণ
আন্দোলন শুরু করবার মত ঝুঁকি নিতে নেতারা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু
যা-ই হোক ২১ নভেম্বারের কলকাতার আন্দোলনে সব দলকেই শেষ পর্য
জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তবুও সাহাবুদ্দিন ও ইস্পাহানি বলেছিলেন যে মুসলি
লীগ সেদিনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। কিরণ শঙ্কর রায়ও কংগ্রেসে
জড়িত থাকার ঘটনা অস্বীকার করেছিলেন। আর গভর্ণর ক্যাসি প্রশাসনের তরফে
অপ্রয়োজনীয় রূঢ়তার অভিযোগ অস্বীকার করেও পুলিশকে দোষারোপ করতে
ছাড়েন নি। তাঁর মতে পুলিশ এবং রাজ্যের আমলাকুল সকলেই নিতা
অপদার্থের মত কাজ করেছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের গুলি ছোঁড়ার
কোন প্রয়োজন ছিল না।[১৫]

নভেম্বারের গণ বিক্ষোভ পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তান্বিত ক
তুলেছিল। সীমান্তের লাট কানিংহ্যাম অবস্থা পর্যালোচনা করে জানালেন
দেশে আসন্ন বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানোর জন্য আই. এন. এ. বন্দীদের সমুদ
বিচারাদেশ এই মুহূর্তে বাতিল করা উচিত। তিনি বলেন এতে সৈন্য বাহিনী
শৃঙ্খলা ভঙ্গের ভয় নেই, বরং এমন একটা সিদ্ধান্ত না নিতে পারলেই জনমানে
তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[১৬]

কিন্তু মরিয়া ব্রিটিশ রাজের চৈতন্যোদয় হয়নি। কানিংহামের পরামর্শ অগ্রাহ

করে এবং নভেম্বারের ঘটনাবলী থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করে ঔপনিবেশিক সরকার তার দুরন্ত জিদের বশবর্তী হয়ে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আবারও চারজনের সামরিক বিচার শুরু করে দেয়। বিচারের জন্য এই চারজন আজাদ হিন্দ ফৌজি সেনা হলেন ক্যাপ্টেন বুরহান উদ্দিন (২/১০ বালুচ রেজিমেন্ট), সুবাদার শিঙ্গারা সিং, জমাদার ফতে খান (৫/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট) এবং ১/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আব্দুল রশিদ। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) তারিখে জানা গেল যে বিচারে রশিদ আলিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলেও সরকার দয়া পরবশ হয়ে তাঁর দণ্ডাদেশ কমিয়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের এই তথাকথিত দাক্ষিণ্য জনতাকে খুশী করতে পারেনি। দণ্ডাজ্ঞার কথা জানতে পেরে তারা স্বভাবতই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মনে রাখা প্রয়োজন যে সামরিক আদালতে প্রথম পর্বের বিচারে দণ্ডিত তিনজন সেনানায়ক ইতিমধ্যে ছাড়া পাওয়ার পর খোদ রাজধানী সহ দেশের চারদিক থেকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা পেতে শুরু করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ৫০-তম জন্মদিন উপলক্ষেও তখন দেশের সর্বত্র যুব সমাজ আবেগ ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় শাহ নওয়াজের সম্বর্ধনা সভায় অগণিত লোক সমাবেশ হয়েছিল এবং সেই সভায় তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের নামে দেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইতে আগুয়ান হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। কলকাতার আর একটি জন সমাবেশে অরুণা আসফ আলি ভারতবর্ষে সব রকমের ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করা হবে বলে হুংকার দিলেন। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৪৬) তারিখে বোম্বাই-এর একটি সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অবকাশে ভুলাভাই দেশাই বলেন যে সামরিক আদালতের বিচার কালে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা গিয়েছে যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার এবং তার আজাদ হিন্দ ফৌজ গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের একটা গৌরবময় অধ্যায় হিসাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভের যোগ্য। ৭ই জানুয়ারী তারিখে পুনাতে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশনে মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি বি. এস. মুঞ্জে বলেন যে পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে তার নিজস্ব সেনা বাহিনী অতি অবশ্যই গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের প্রশংসা করে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত তিন বীর সেনাকে হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। এমন-কি গত বছরের নভেম্বার আন্দোলনের তথাকথিত আতিশয্যে যিনি বিরক্ত হয়েছিলেন সেই সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলও বোম্বাইয়ের একটি জনসভায় (৬ জানুয়ারী ১৯৪৬) আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের

যে প্রতিনিধি দলটি এই সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন তার অন্যতম সদস্য উইলিয়াম সোরেনসেন-ও (Sorensen) করাচীর এক সমাবেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের শাস্তিপ্রাপ্ত তিন সেনাপ্রধানকে মুক্তি দেওয়ার খবর শুনে অকিনলেকের বিচারবোধের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেন যে ফৌজি সেনাদের বিচার করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলে সরকার আখেরে সুবিবেচনারই পরিচয় দেবেন কেননা তার ফলে ইন্দো-ব্রিটিশ সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।[১৭]

কিন্তু ক্ষমতার গর্বে স্ফীত সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। উল্টে শাহ নওয়াজ, ধীলন এবং সেগলকে মুক্তি দেওয়া সত্ত্বেও, রশিদ আলিকে কেন সাত বছরের মেয়াদে দণ্ডিত করা হল তার সাফাই দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে সদাশয় সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের সকল অপরাধ মার্জনা করে দিলেও যে-সব ক্ষেত্রে তাঁরা সহ-যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার করার জন্য (acts of gross brutality) এবং সভ্য আচরণের পরিপন্থী (acts offending against the canons of civilised behaviour) ব্যবহার করার জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন সেক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমা প্রদর্শন করে বিচার ব্যবস্থার প্রহসন ঘটাতে চান না। সরকার পক্ষ অভিযোগ করেন যে আদালতের বিচারে এটা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা গিয়েছে যে রশিদ আলি তথাকথিত দুইজন অপরাধীর একজনকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে উপর্যুপরি দুই দিন একাধিক্রমে লাঠি পেটা করেছিলেন এবং অপর একজনকেও নির্দয়ভাবে প্রহার করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই রশিদ আলি নিজের হাতেই অভিযুক্তদের (তারা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অবধি) পেটাই করেছিলেন। সরকার মনে করেন যে এই রকম নির্দয় ও বর্বর আচরণের দায়ে দোষী ব্যক্তির সাজা পাওয়া উচিত এবং সেই কারণেই রশিদ আলির প্রতি সাত বছরের কারা মেয়াদের বিধান দেওয়া হয়েছে।[১৮]

এইরকম অবিবেচনা প্রসূত আদেশের ফলে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ছয় দিনের জন্য (১১-১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬) কলকাতা আবারও উত্তাল হয়ে ওঠে। কলকাতার জনসাধারণ বিগত দেড় মাস যাবৎ নেতাদের মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজের অকুতোভয় লড়াইয়ের কথা শুনে, সহরের বুকে মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের নাগরিক সম্বর্ধনা জানিয়ে এবং গত নভেম্বারে ফৌজের সমর্থনে সহরের রাজপথে লড়াই করে তাঁদের সঙ্গে এক অভূতপূর্ব একাত্মতার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই বন্ধনের মর্যাদা রাখতে স্বভাবতই তারা আবারও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লড়াই শুরু হয়েছিল সোমবার, ১১ই ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার মুসলিম স্টুডেন্ট লীগের ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বানের মধ্যে দিয়ে। অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস

ফেডারেশান এই ছাত্র ধর্মঘটের ডাক সমর্থন করে। ১১ তারিখে বেলা দুটোর মধ্যেই এই ধর্মঘটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে সমবেত হয়। ছাত্র সমাবেশে শোভিত কংগ্রেস, লীগ ও স্টুডেন্টস ফেডারেশনের পতাকাগুলি দেখে বোঝা গিয়েছিল যে রাজনীতির দল-মত নির্বিশেষে সকলেই এই ছাত্র জমায়েতে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই সমাবেশে 'সাম্রাজ্যশাহী ভারত ছাড়ো', 'রশিদ আলির মুক্তি চাই', 'হিন্দু-মুসলিম এক হও' ইত্যাকার স্লোগান মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছিল। সভায় অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশানে পক্ষ থেকে, প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশানের জেনারেল সেক্রেটারী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের তরফে শাহ আজিজুর রহমান শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। এর পরেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে ছাত্রদের একটি দীর্ঘ মিছিল ধর্মতলা স্ট্রীট পরিহার করে (কারণ পুলিশ আগে থেকেই ঐ রাস্তা ঘিরে রেখেছিল) কলুটোলা স্ট্রীট ও জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট হয়ে ডালহাউসির নিষিদ্ধ এলাকা অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সামসুজ্জোহা এক বিরাট পুলিশ বাহিনী সহ ছাত্রদের পথরোধ করে তাদের পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্থান ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু ছাত্ররা পুলিশের আদেশ পালন করতে অসম্মত হলে ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে গুর্খা রক্ষীরা জনতাকে লাঠি চার্জ করে এবং বহু লোককে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে। পুলিশের এই রকম বিনা প্ররোচনার আক্রমণে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রায় তদ্দণ্ডেই কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় পথ-চলতি সব রকমের যান বাহন গ্যারেজে ফিরে যায়। বিকেল চারটা নাগাদ ছাত্রদের পিকেটিং-এর জন্য অন্যান্য গাড়ীগুলিও রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়। পুলিশের লাঠি চার্জের প্রতিবাদে জনতাও তার সাবেকী রীতি অনুযায়ী পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ফলে যে হাঙ্গামা বেধে যায় তা দমন করবার জন্য পুলিশকে সহরের বিভিন্ন এলাকায় কমপক্ষে ৩/৪ বার গুলি বর্ষণ করতে হয়। প্রত্যুত্তরে সহরের নানা জায়গায় এবং বিশেষ করে মুসলমান অধ্যুষিত মহল্লায় দোকান-পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়। জনতা ফাঁকা রাজপথে ব্যারিকেড তৈরী করে পুলিশের সঙ্গে কখনও মুখোমুখি আবার কখনও গেরিলা কায়দায় লড়াই করতে উদ্যত হয়। পুলিশের জিপে এবং আমেরিকান গোরা সৈন্যদের মিলিটারি ভ্যানে ইতস্তত অগ্নি সংযোগের ঘটনাও ঘটতে থাকে।[১৯] কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ১১ তারিখের ঘটনা সমূহের রিপোর্টিং করে লেখা হয় ছাত্র মিছিলের উপর লাঠি চার্জের খবর পেয়ে সহরের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান জনতা রাগে ফেটে পড়ে। "রাত্রি সাড়ে আটটার সময় রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সম্মুখে দুইটি মিলিটারী লরী জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অন্য অঞ্চলেও বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাম-বাস

হইতে লোক নামাইয়া দেয় ও মিলিটারী লরীতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ কাঁদুনে বোমা ছোঁড়ে। রাত্রি ১০টার সময় পুলিশ রাজাবাজার অঞ্চলে ২৩ বারেরও বেশী রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করে এবং কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে। ইহার পরে মানিকতলা অঞ্চলে আরও অনেকগুলি মিলিটারী লরী পোড়ান হয়। মুসলমান জনতাকেই অধিকাংশ জায়গায় রাস্তার উপরে আসিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে দেখা যায় এবং 'কংগ্রেস লীগ এক হো' ধ্বনি দিতে শুনা যায়।" ১২ই ফেব্রুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় পুলিশের গুলিতে আহত অবস্থায় মেডিকেল কলেজে আনীত কতিপয় হিন্দু মুসলমানের নাম ছাপা হয়েছিল যথা আলি হোসেন (২৫), বঙ্কিম দত্ত (২০), মহঃ ইসমাইল (২৩), জানকী সাহা (২৮), চন্দর সিং (১৮), মেহের খান (২৪), রামচন্দ্র (২৫), মহঃ শরিফ (২৫) প্রভৃতি। সেদিনের ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ১২ তারিখে বেলা ১টার সময় পুনরায় সেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারেই একটি জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আলোচনাক্রমে ঐদিন সাধারণ হরতাল পালন করা হবে বলেও প্রাথমিকভাবে স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু পরে গভীর রাত্রে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মত পরিবর্তিত হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের স্বার্থে হরতালের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেয়। পরিবর্তে ১২ তারিখের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সমাবেশে সহরের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সব কয়টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জনতাকে শান্ত ও সংযত থাকার জন্য বিশেষভাবে আবেদন করা হয়েছিল।[২০]

মঙ্গলবার ১২ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে কলকাতা সহর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। ট্রাম, বাস, রিক্সা মজদুরদের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ইউনিয়নের নির্দেশে সহরের রাজপথে সব রকমের যান-বাহন অদৃশ্য হয়ে যায়। সহরের প্রতিটি স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা একযোগে অনুপস্থিত থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি ও বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যুগ্ম আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতা সহ উত্তরে কাঁকিনাড়া থেকে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত সমুদয় অঞ্চলের সমস্ত কল কারখানার শ্রমিকেরা একযোগে ধর্মঘট পালন করে। এই সকল কারখানা শ্রমিকেরা পরবর্তী তিন দিন যাবৎ মিলে অনুপস্থিত থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের মোকাবিলা করবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করেছিল।

দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও সন্নিহিত অঞ্চলে ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক এক বিশাল জনতা সমবেত হয়। সমাবেশে কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের ত্রিবর্ণ ও সবুজ পতাকা ছাড়াও হাজার

হাজার লাল ঝান্ডা শোভা পেয়েছিল। জনতা আগের দিনের মতই একই স্লোগানের ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করে তুলেছিল। জন সমাবেশে বিভিন্ন দলের বক্তা শ্রোতাদের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য অক্ষুন্ন রেখে দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং রশিদ আলির মুক্তির জন্য একযোগে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান। মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রম খান বলেন ঃ "বিনা শর্তে ক্যাপ্টেন রসীদের মুক্তি, অত্যাচারীদের শাস্তি ও মৃতদের ক্ষতিপূরণ চাই—যদি এই সব দাবী মানিয়া লওয়া না হয়, তবে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য যেভাবে হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, আমরা পুনশ্চ তেমনি আন্দোলন চালাইব। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আমি ঝাঁপাইয়া পড়িব।" লীগ নেতা সুরাবর্দী ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেন ঃ "আমার জীবনের একটা বড় আশা আজ পূর্ণ হইয়াছে—কংগ্রেস, লীগ পতাকার নীচে হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন সতীশ দাশগুপ্ত ও গুণদা মজুমদার। কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী বলেন "আজ বিভিন্ন দলের নেতারা এক হইতে না পারিলেও, জন সাধারণ যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এক হইতে পারে, এই যুক্ত সভা তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। আমরা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের বলিতেছি, আজ তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য আলাদা হইয়া আন্দোলন চালাইবেন না। যুক্তভাবে আন্দোলন চালাইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজকে মুক্ত করিতে হইবে।"

১২ই ফেব্রুয়ারীর বিশদ বিবরণ সে-আমলের বিভিন্ন সংবাদপত্র ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র মারফত সংগ্রহ করা যায়। এইগুলি পর্যালোচনা করে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

প্রথমেই বলা দরকার যে ১২ই ফেব্রুয়ারীর সমাবেশে কলকাতার রাজপথের মিছিলে যে লোক সমাগম হয়েছিল তা আগেকার সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। সঠিক কত লোকের জমায়েত হয়েছিল তার হিসাব পাওয়া দুষ্কর। তবে একটি নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে মিছিলটি যখন ডালহাউসি অভিমুখে যাত্রা করে তখন সেখানে অন্যূন পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল।

আন্দোলনের সংগঠক নেতৃবৃন্দ মিছিলকারী জনতাকে শান্তিপূর্ণ থাকার জন্য অনুরোধ করলেও সেই অনুরোধ সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়নি। অবশ্য জনতার হিংস্র হয়ে ওঠার পিছনে পুলিশের প্ররোচনা কাজ করেছিল। স্বাধীনতা পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে জনতার মিছিল ডালহাউসি ঘুরে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় পুলিশ আচমকা তাদের উপর কয়েক প্রস্থ কাঁদানে

গ্যাসের শেল ফাটায়। গণেশ এভিনিউয়ের কাছে পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের আক্রমণে জনতা রীতিমত বিব্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশের প্রতিহিংসা বৃত্তি নিরস্ত হয়নি। বিকেল ৪টার পরে পুলিশ সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে শুরু করে হাজরা পার্ক পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বারবার গুলি বর্ষণ করে। পুলিশী হামলার ফলে জনতাও যখন পাল্টা আক্রমণ শুরু করে তখন অবস্থা রীতিমত গুরুতর আকার ধারণ করে। জনতার সংহার মূর্তি দেখে পুলিশ বহু ক্ষেত্রেই ভয় পেয়ে ব্যারাক ছেড়ে পথে বেরোতে অস্বীকার করে। বিকেল পাঁচটার পর ভারতীয় পুলিশ ও সেনাদের রাজপথের কোথাও দেখা গেল না। তখন গভর্ণর ক্যাসি এক চরম সিদ্ধান্ত নিলেন। বিদ্রোহী সহরকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব ব্রিটিশ ফৌজের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর শুরু হল ইঁট ও সোডার বোতল-সম্বল জনতা বনাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরতা সাঁজোয়া গাড়ীতে ভ্রাম্যমান টমিগানধারী ব্রিটিশ সেনাদের মধ্যে এক অসম লড়াই। বড় রাস্তার মোড় থেকে ব্রিটিশ সৈন্যরা জনতাকে হটিয়ে দেয়। তখন সাময়িকভাবে লড়াকু জনতা পিছু হটে গলিতে আশ্রয় নেয় ; কিন্তু তারপরেই সুযোগ পেলে আবারও ইঁট হাতে ধেয়ে আসে, গুলি খায়, মরে আর মারে। জনতার আক্রমণে যে-সব পদস্থ পুলিশ অফিসার আহত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সামসুজ্জোহা (এই ভদ্রলোকই গতকালের ছাত্র মিছিলের উপর লাঠি চার্জ করার জন্য গুর্খা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন) এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার আর. এন. গুপ্ত। রাতের খবরে প্রকাশ হয় যে জনতা কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে আগুন লাগায় এবং রসা রোড ও হাজরা রোডের মোড়ে রেলের বুকিং অফিসের দরজা ভেঙে ঘরের আসবাবপত্র ও কাগজ টেনে বার করে এবং সব কিছুতে অগ্নিসংযোগ করে। সহরের নানা জায়গায় আরও অনেক আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতার দমকল বাহিনীকে ১১ এবং ১২ তারিখে মোট ৮০টি জায়গায় আগুন নেভাতে ছুটে যেতে হয়েছিল। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ গুলিই ছিল ১২ তারিখের ঘটনা। এ ছাড়া জনতা এসপ্ল্যানেড ও চৌরঙ্গী এলাকার ব্রিস্টল, ফার্পো, গ্র্যান্ড হোটেল, মেট্রো ও টাইগার সিনেমা প্রভৃতির কাচ ভেঙ্গে দেয়। তাদের হাতে অনেক মিলিটারী লরিও ভস্মীভূত হয়। রাস্তায় চলাচলকারী অনেক এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নর-নারীও জনতার হাতে লাঞ্ছিত হন। পার্ক স্ট্রীট এলাকার দোকান পাটের সমূহ ক্ষতি সাধন করা হয়েছিল। মৌলালীর কাছে ক্রীক রো-তে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের ছয়টি ফ্ল্যাটে আক্রমণের ঘটনা কানে আসে। গত দিনে গুলির আঘাতে নিহত নাজিমুদ্দীনের মৃতদেহ নিয়ে প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট শোভাযাত্রা নাখোদা মসজিদ থেকে মাণিকতলার কবরখানায় যাওয়ার সময় অনেক জায়গায় উত্তেজনা দেখা দেয়। কবর দেওয়ার

সময় লীগের একজন সভ্য কবরের মাটি স্পর্শ করে বলেন "এই মাটি যেন লীগ ও কংগ্রেসের পতাকাকে শক্ত করে বেঁধে দেয়, শহীদের রক্তে এই বন্ধন চিরদিনের জন্য এক হয়ে যাক।"

জনতার গেরিলা আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য পুলিশ, মিলিটারি এবং ব্রিটিশ ফৌজ যে নারকীয় প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছিল তার ফলে বহু সংখ্যক লোক হতাহত হয়েছিল।[২১] ১৩ই ফেব্রুয়ারীর স্বাধীনতা পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে ১২ তারিখে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলে অন্তত দুই শতাধিক লোক হতাহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে মনোরঞ্জন দত্ত নামে এক যুবক ছিলেন এবং আহতদের মধ্যে একজন মহিলারও নাম পাওয়া যায়। স্বাধীনতা লেখে "বিকাল সাড়ে চারটার পর শহরের অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করে। শহরের প্রায় চতুর্দিক হইতে পুলিশের গুলি চালনার খবর আসিতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজে বিকাল হইতে স্রোতের মত হতাহতের ভীড় হইতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ ইন্ডিয়ান ন্যশনাল এম্বুলেন্স কোরের স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা অক্লান্তভাবে আহতদের উদ্ধারকার্য ও সেবা করেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সোস্যাল সার্ভিস বিভাগ মাইক্রোফোনযোগে হতাহতদের সম্বন্ধে অবিরাম খবর সরবরাহ করেন।"

১২ তারিখের (এবং ১১ তারিখেরও) হাঙ্গামার উদ্বেগজনক বিস্তার এবং উগ্রতার রিপোর্ট পাঠিয়ে ১৩ তারিখে কলকাতা থেকে দিল্লীর সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তরে যোগাযোগ করা হয়েছিল। এই রিপোর্টগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে কলকাতার ঘটনা বাংলা সরকারের মনে রীতিমত ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। এই ভয়ের পরিণামেই বাংলার লাট ক্যাসি বড়লাট ওয়াভেলকে ১২ তারিখেই 'একান্ত জরুরী' (most immediate) মার্কা করে একটি তারবার্তা প্রেরণ করে সহরে ব্রিটিশ ফৌজ নামানোর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। তারবার্তাটিতে লেখা হয় যে লরিতে আগুন দেওয়া এবং রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করার ঘটনাগুলি অব্যাহত রয়েছে। তাই সেনাবাহিনীর বুচার, গিবন্‌স এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হয়েছে যে সহরে শান্তি রক্ষার জন্য সেনা বাহিনীকে পথে নামাতেই হবে।[২২]

হাঙ্গামার তৃতীয় দিন অর্থাৎ বুধবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ তারিখে সহরে ব্রিটিশ ফৌজের উপস্থিতি সত্ত্বেও অবিরাম গন্ডগোল ঘটতেই থাকে। এই দিন আলিপুরে ২৪ পরগণার জেলা শাসক স্টুয়ার্টের উপর হামলা হয় এবং জনতা তাঁর গাড়ী ভাঙ্গচুর করে। ২০টি মিলিটারি ভ্যানেও জনতা অগ্নি সংযোগ করে। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার জগুবাবুর বাজারের কাছে রাস্তার উপর আবারও বারিকেড তৈরীর উদ্যোগ দেখা দিলে পুলিশ সেখানে কয়েক

রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে গত সন্ধ্যায় আগুন লাগানোর ফলে এই দিনেও ডিপোর অন্তত নয়খানি ট্রামকে জ্বলতে দেখা যায়। এইগুলি পরে সম্পূর্ণরূপেই ভস্মীভূত হয়ে যায়। কালীঘাটের পোস্ট অফিসেও এইদিন হামলা হয়। এছাড়া খিদিরপুরের মনসাতলা, এবং মধ্য কলকাতার কলুটোলা ও কলাবাগান এলাকাতেও পোস্ট অফিসগুলি আক্রান্ত হয়েছিল। এইরকম আক্রমণের ফলে সহরের বেশ কয়েকটি পোস্ট অফিস আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলি তো কর্মীদের অনুপস্থিতির জন্য এমনিতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সহরের পাঁচ শতাধিক মহিলা টেলিফোন অপারেটরদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা অপারেটর ভিন্ন আর কেউ-ই কাজে যোগ দেন নি। ফলে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ হয়েছিল। সাধারণ যানবাহনের অবস্থাও ভাল ছিল না। আগের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ সহরের ট্রাম-বাস চলাচল সেই যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারপর তারা অল্প দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় কেউ-ই আর পথে বের হয়নি। কিছু রিক্সা এবং অল্প কয়েকটি ট্যাক্সি অবশ্য ইতস্তত রাস্তায় চলতে দেখা গিয়েছিল। প্রাইভেট গাড়ীর সংখ্যাও ছিল খুব কম। অর্থাৎ কলকাতার রাস্তায় সেদিন বন্দুক উঁচানো মিলিটারি গাড়ী ছাড়া আর কোনরকমের যান-বাহনকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায়নি।

সহরের উত্তরাঞ্চল ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। কিন্তু সেখানেও দোকানপাট প্রায় কিছুই খোলা ছিল না এবং রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়াও চলতে দেখা যায়নি। পথে-পথে জনতার জটলা চোখে পড়লেও মিলিটারি ভ্যান এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিকটবর্তী গলির ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। চিত্তরঞ্জন এভেনিউ এবং গিরীশ পার্কের কাছে জনতা কোথাও হাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা করলে পুলিশ সেখানে গুলি চালায়। মধ্য কলকাতার ধর্মতলা ক্রীক রো-এর কাছাকাছি থোবার্ণ মেথডিস্ট চার্চটিও জনতা আক্রমণ করে তছনছ করে। চার্চটিতে আগুন লাগানো হয়। ফলে উপাসনালয়ের বেদী, সিঁড়ি এবং বেশ কিছু ধর্মপুস্তকও পুড়ে যায়।

১৩ তারিখের হাঙ্গামায় কারখানা ও মিল শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির দাবীতে কাঁকিনাড়া থেকে আরম্ভ করে বজবজ পর্যন্ত বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন কলে কারখানায় শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে। ১২ তারিখের পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে কাঁকিনাড়ার শ্রমিকেরা ১৩ তারিখেও কর্ম বিরতি পালন করে। ঐ দিন শতাধিক মিল শ্রমিক কাঁকিনাড়া রেলস্টেশন অবরোধ করে এবং রেল পথে বেলা ১১টা নাগাদ বসে পড়ে শান্তিপুরগামী লোকাল ট্রেনটিকে আটকে রাখে। দ্বিপ্রহর আড়াইটায় রেল পুলিশ অবরোধ সরানোর জন্য জনতার উপর গুলি

বর্ষণ করে। ফলে চার ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই মারা পড়ে এবং ১৪ জন লোক আহত হয়। গুলিবর্ষণের ঘটনায় জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে রেল স্টেশনেই আগুন ধরিয়ে দেয়। তাছাড়া চলন্ত ট্রেনগুলিকে থামিয়ে এবং কামরাগুলি থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ট্রেনের রেকগুলিতেও অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল। কাঁকিনাড়ার হাঙ্গামার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য রেল স্টেশনগুলিতেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। মেন লাইনে কোন ট্রেন চলাচল সম্ভব হয়নি এবং নৈহাটি স্টেশনেও গোলযোগ দেখা দিয়েছিল।[২৩]

এই দিন সহরের প্রায় কুড়িটি জায়গা থেকে গুলি চালানোর খবর আসে। "গুলি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটার শব্দে গোটা সহর যেন কাঁপছে। এই দিন রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ১৬৯ জন গুলিবিদ্ধ মানুষকে হাসপাতালে আনা হয়। তার মধ্যে পনের জন মৃত। তারপর থেকে দেখা গেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মিনিটে একজন করে বুলেট বেঁধা লোক আসছে। কাউকে কাউকে হাসপাতালে না নামিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মর্গে। শোনা যাচ্ছে আত্মীয়-স্বজনদের আকাশ-বাতাস জুড়ে বুক ফাটা কান্না। আহতদের সংখ্যা অগণন, অতএব ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত ভান্ডার নিঃশেষিত। আহতদের জন্য রক্ত দিতে এগিয়ে এলেন অনেকে, ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে অসংখ্য মানুষের লাইন।"[২৪]

গুলি চালিয়ে লোকেদের শায়েস্তা করা ছাড়াও সরকার জনমানসে ত্রাস সৃষ্টি করবার জন্য জনগণের উদ্দেশ্যে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি তথা চেতাবনী প্রচার করে জানিয়েছিলেন রাস্তা-ঘাটে যান বাহনের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কোন ব্যারিকেড তৈরী করা হলে কিংবা উত্তেজনা সৃষ্টি করবার জন্য কোন মিছিল বার করা হলে পুলিশ ও সেনা বাহিনী সেগুলি ভেঙে দেবেন এবং প্রয়োজন হলে তাদের গুলি ছোঁড়ারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তুতিবিহীন স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে ১৩ই ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনেও সেই রকম কিছু অনভিপ্রেত আতিশয্য দেখা দিয়েছিল। যেমন গোর্খা সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বদলা হিসাবে আন্দোলনকারীরা নানা স্থানে-নিরপরাধ নেপালী নাগরিকদের হেনস্থা করেছিল। আবার থোবার্ণ চার্চকে ক্রিশ্চান ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে জনতা গির্জাটিতে আগুন ধরিয়ে মনের জ্বালা মিটায়। তাছাড়া এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নিরীহ নাগরিকদের নিগ্রহ করা তো লেগেই ছিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই সকল ঘটনাতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন এবং সেই কারণে তাঁরা জনতার কাছে প্রকাশ্যে অনুরোধ জানান যাতে এই রকম অবাঞ্ছিত ঘটনা আর না ঘটে। অবশ্য কংগ্রেসের নেতারা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে সেনাবাহিনী রাস্তায় নামিয়ে সরকার যদি জনতার মনে অযথা প্ররোচনা সৃষ্টি না করতেন তাহলে হয়ত জনতার তরফেও কোন রকম

বাড়াবাড়ি ঘটত না। কাজেই সহরে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য কংগ্রেসের নেতারা সরকারকে অবিলম্বে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র বসু ১৪ তারিখে গভর্ণর ক্যাসিকে লিখিতভাবে এই আবেদন জানিয়েছিলেন। আর অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের লন্ডন শাখার পক্ষ থেকে মহম্মদ আব্বাস আলী খোদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলির কাছে একটি তারবার্তা জানিয়ে সরকারকে ভারতবর্ষে অকারণ রক্তপাত ঘটানো বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। আব্বাস আলী বলেন রশিদ আলীর মুক্তিদানে নিরর্থক দেরী করা হলে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা অবধি গোটা ভারতবর্ষেই হয়ত বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে।

কলকাতার ঘটনার উত্তেজনা বহির্বঙ্গের বিভিন্ন রাজ্যকেও স্পর্শ করেছিল। আব্দুল রশিদের মুক্তির দাবীতে কলকাতার ধর্মঘটী ট্রাম শ্রমিকদের উপর পুলিশী অত্যাচার এবং শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা মহম্মদ আমীন খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দিল্লীর ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই এ্যান্ড ট্র্যাকশন কোম্পানীর শ্রমিকেরা বিকেল পাঁচটা থেকে কর্ম বিরতি শুরু করে। দিল্লীর এ্যাংলো-এ্যারাবিক কলেজ ও অন্যান্য মুসলিম বিদ্যালয় সমূহের ছাত্ররাও কলকাতার ঘটনার প্রতিবাদে ক্লাস বর্জন করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজী মহম্মদ ইশা এবং শেখ আব্দুল সালাম শান্তি-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে ছেলেদের নিরস্ত করেন। দিল্লী ভিন্ন মাদ্রাজ এবং পূর্ব বঙ্গের বেশ কয়েকটি স্থানেও কলকাতার পুলিশী অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদ করে নানারকম সভা ও জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৩ই ফেব্রুয়ারীর পরের দিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

হাঙ্গামার চতুর্থ দিনে (বৃহস্পতিবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬) কলকাতার অবস্থা অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক শান্ত হয়ে এসেছিল। তবে এই দিনের একটা বড় খবর হল এই যে গতরাত্রে কাঁচড়াপাড়া থেকে আগত আমেরিকান সৈন্য বোঝাই ৭৫টি ট্রাকের উপর জনতা ব্যারাকপুরের নিকটে আক্রমণ করে বলে কলকাতায় রিপোর্ট আসে। এই সকল আমেরিকান সৈন্যরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে জনতার আক্রমণে তাদের মধ্যে ১৯জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মিলিটারি ট্রাকটি আক্রান্ত হলেও পাছে জনতার মনে ইত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেই ভয়ে ট্রাকটির ভিতর থেকে জনতাকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি বর্ষণ করা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের সময় আমেরিকান সৈন্যরা সর্বত্রই জনতার আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ১২ই ফেব্রুয়ারীতেও পাঁচটি আমেরিকান মিলিটারি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল এবং সেই সময় আমেরিকন বাহিনীর লেফট্যানেন্ট হোরেট্ জে. গাবার্ট (Horate

J. Gabart) জনতার হাতে প্রহৃত হয়ে হাতের হাড় ভেঙে আহত হয়েছিলেন। পরের দিনেও জনতার আমেরিকান সৈন্য বিদ্বেষ অব্যাহত ছিল। এই বিদ্বেষ এতটাই গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে আমেরিকান সৈন্য বাহিনীর তরফে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উইলসন (Wilson) শেষ পর্যন্ত এই মর্মে ঘোষণা করলেন যে ভারতের অভ্যন্তরে গণ-অসন্তোষ দমন করবার জন্য আমেরিকান সৈন্য বাহিনীকে কোথাও ব্যবহার করা চলবে না এবং আমেরিকান মিলিটারি ট্রাক ও সৈন্যদল যে-সব জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে সেই সব এলাকা থেকে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

১৪ তারিখের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কলকাতায় সেনা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে গভর্ণর ক্যাসির নিকট শরৎচন্দ্র বসুর আবেদন। ঐ আবেদনে শরৎচন্দ্র গভর্ণরকে জানান যে দেশের জননেতাদের মতামতের তোয়াক্কা না করে গভর্ণর কলকাতার রাজপথে সেনা নামিয়ে পরিস্থিতিকে যার পর নাই জটিল করে তুলেছেন। এমতাবস্থায় সহরের শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি যেন অবিলম্বে কলকাতার রাজপথ থেকে সৈন্য তুলে নেন। এই দিনের আরও একটি বলবার মত ঘটনা এই যে কলকাতায় পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ করে মাদ্রাজে বীররাঘবনের নেতৃত্বে একটি বিশাল জন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমাবেশে স্থানীয় মুসলিম জনগণ কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে একযোগে রশিদ আলি সহ সমুদয় আই. এন. এ. বন্দীদের মুক্তি দাবী করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টারের বিবরণীতে ১৪ তারিখে সহরের অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল বলে লেখা হলেও স্বাধীনতা পত্রিকায় ঐ দিনের রিপোর্টিং থেকে জানা যায় যে সহরের বহু নিরীহ নাগরিক মিলিটারির হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। বৌবাজার, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ও জগু বাবুর বাজারের মধ্যে ঢুকে মিলিটারি নিরীহ দোকানী ও ক্রেতাদের মারধর করে। সকাল ৯ টায় মট লেনের চা-এর দোকানে চা পানরত জনৈক মুসলমানকে গুলি করে মারা হয়। পাড়ায় পাড়ায় সন্দেহভাজন লোকের খোঁজে পুলিশ ও মিলিটারি বহু বাড়ীতে হানা দেয়। পদ্মপুকুর রোডে একটি গ্রেন শপে ক্রেতাদের তারা অকারণে মারতে থাকে। ৪৮ নং চক্রবেড়িয়া রোডে দোতলায় উঠে সামরিক বাহিনী চারজনকে ধরে মারে এবং তার মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা রান্না করছিলেন—মারের হাত থেকে তিনিও রেহাই পান নি। উত্তর কলকাতার বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, গড়পার প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশ কয়েকটি বাড়ীতে ঢুকে 'মুসলমান অথবা গুন্ডা' লুকিয়ে আছে কিনা খোঁজ করে। জগুবাবুর বাজার, হাজরা ও কালীঘাট অঞ্চলে মিলিটারি খুশিমতো পথচারীদের ধরে মারতে থাকে।

মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে গাড়ীর আরোহীদের আটক করে খানা-তল্লাসি চালানো হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সহ এই কয়দিনের হাঙ্গামায় পুলিশ যতজন লোককে গ্রেপ্তার করেছিল এবং যত লোক হতাহত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের নামের তালিকার উপর চোখ বোলালেই বোঝা যায় যে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরাই ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। "মুসলমান জনতার অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়। ১৯২১ সালের পর কলকাতার মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে এত ব্যাপক হারে কি কখনও জড়িয়ে পড়েছে?...মাত্র সাড়ে তিন বা চার বছর আগে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনেও মুসলমান তরুণ এত ব্যাপক হারে অংশ নেয়নি।"[২৫]

আগেই বলা হয়েছে যে কলকাতায় বিশৃঙ্খলা দমনের নামে পুলিশের নিপীড়ণ ব্যবস্থার প্রতিবাদে বৃহৎ বঙ্গের নানা জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকার একটি খবরে প্রকাশ পায় যে ১৪ তারিখে যে-সব এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল বার করা হয়েছিল সেই সব এলাকা হল বহরমপুর, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, জিয়াগঞ্জ, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, রঙপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কার্শিয়াং প্রভৃতি। খোদ কলকাতা সহরেও অবস্থা উন্নত হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হলেও পরিস্থিতি সরেজমিন দেখবার জন্য গভর্ণরকে পুলিশ কমিশনার রায় (R.E.A. Ray) সমভিব্যহারে সকাল থেকেই বিভিন্ন রাজপথ টহল দিতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সহরের বিশৃঙ্খল অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই দিন বিভিন্ন স্থানে শান্তি মিছিলও বের করা হয়েছিল।

আন্দোলনের পঞ্চম দিনে (শুক্রবার ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬) বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইনের কোথাও কোথাও জনতা রেলপথের উপর জমায়েত হয়ে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু অল্প পরেই জনতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছিল। বেঙ্গল-আসাম লাইনে বজবজের কাছে আক্রা নামক অঞ্চলেও জন অবরোধের জন্য রেল চলাচল কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়েছিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর স্বাধীনতা পত্রিকার সংবাদ সূত্র থেকে জানা যায় যে হাওড়ার ১০ হাজার লোকের বিরাট শোভাযাত্রার মাধ্যমে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলিতভাবে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়। ঐ পত্রিকার শ্রীহট্টের সংবাদদাতা জানান যে সেখানে হিন্দু এবং মুসলমানের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ ছিল। সিনেমা হাউস বন্ধ ছিল এবং দিন মজুর ও রিক্সাচালকেরাও ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। স্কুল-কলেজ থেকে কয়েক হাজার

ছাত্র পথে নেমে মিছিল করে। শোভাযাত্রায় কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট এবং জামায়েতে-এর পতাকা তোলা হয়েছিল। শোভাষাত্রাকারীদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনিতে আকাশ দীর্ণ হয় এবং এত বড় মিছিল শ্রীহট্টের রাজপথে বহু বৎসর প্রত্যক্ষ হয়নি। কার্শিয়াং অঞ্চলেও ঐ দিন পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়েছিল। এলাকার বিভিন্ন জনসভায় গুর্খা নেতারা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে গুর্খা সৈন্য ব্যবহার করার জন্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।

উল্লেখিত ঘটনাগুলি ছাড়া কোথাও কোন বড় রকমের হাঙ্গামার সংবাদ কর্ণগোচর হয়নি। এই দিন কলকাতার কোথাও কোন অঘটনে কেউ আহত হয়েছেন বলেও শোনা যায়নি। তবে সহরের বিগত কয়েকদিনের হাঙ্গামায় যত লোক হতাহত হয়েছিলেন তার যে হিসাব এই দিন অবধি পাওয়া যায় তার থেকে দেখা যায় যে সহরে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৩ এবং আহতের সংখ্যা হয়েছিল ২৩৮। এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য সামান্য আঘাত প্রাপ্ত ২৫১ জনকে গোণা হয়নি। তাছাড়া কলকাতার বাইরে নৈহাটী, কাঁকিনাড়া, বালি এবং দমদম প্রভৃতি অঞ্চলে ১৪ই ফেব্রুয়ারী অবধি যে ৯ জন নিহত হয়েছিল তাদেরও এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়। আমেরিকার এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আন্ডার সেক্রেটারী আর্থার হেন্ডারসনের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে দাবী করে যে সহরে মোট নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৮। এতদ্ব্যতীত ৫২৭ জন অসামরিক নাগরিক এবং পুলিশ বাহিনীর ৮২ জনও হাঙ্গামায় আহত হয়। তাছাড়া সামরিক বাহিনীরও ৫ জন আহত হয়েছিল এবং এদের মধ্যে অন্তত একজনের আঘাত বিশেষ রকম গুরুতর ছিল। হেন্ডারসন জানিয়েছিলেন যে এই রকম ব্যাপক গোলযোগ সত্ত্বেও ১৫ তারিখের মধ্যেই কলকাতার অবস্থার দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। সহরে আন্দোলনের এই তীব্রতা স্তিমিত হয়ে আসায় কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে স্বস্তি বোধ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই স্বস্তিবোধের পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের ক্ষণস্থায়ী জঙ্গি মেজাজ লক্ষ্য করে তাঁরা অপাঙ্গে নানারকম বক্রোক্তি করতেও ছেড়ে দেন নি। ওয়াভেল, পেথিক-লরেন্সকে লেখা একটি গোপন চিঠিতে (তাং ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬) বলেন যে, কলকাতায় যত হাঙ্গামাই বাধুক না-কেন তা শনিবারের মধ্যেই সাধারণত মিটে যায়, কেননা ঐ দিন কলকাতায় ঘোড়-দৌড়ের জমায়েত হয়ে থাকে।[২৬]

ওয়াভেলের উল্লেখিত ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে ব্যঙ্গটি আপত্তিকর হলেও উক্তিটি কিন্তু সত্য ছিল। আন্দোলনের ষষ্ঠ দিনে (শুক্রবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী) কলকাতা সহরের মাত্র এক জায়গায় একটি মাত্র চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। শ্যামপুকুর পুলিশ ফাঁড়ির কাছে একটি বোমা ফাটার সংবাদ কানে আসে। কিন্তু ঐ বিস্ফোরণের

ফলে কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। সহরের সর্বত্র ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতি যানবাহন স্বাভাবিকরূপেই চলাচল করে। অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসার দরুণ গত রাত্রি থেকেই রাজপথের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন সামরিক পিকেটগুলি তুলে নেওয়া হয়েছিল। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মিলিটারি এবং পুলিশের টহলদারী সেদিনও অব্যাহত ছিল। কলকাতার কর্মব্যস্ত রাস্তাগুলিতে লোকজন আবারও স্বাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করতে পেরেছিল। দোকান-বাজারও নিয়মিতভাবে খোলা রাখা হয়েছিল। সহরের বাইরে রাজ্যের অন্য কোন অঞ্চল থেকেও কোন ধরনের হাঙ্গামার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ কলকাতা সহ দেশের সর্বত্র গতানুগতিক ধরনের স্বাভাবিক জীবনধারা ফিরে এসেছিল।

কিন্তু গত বছরের নভেম্বারের ঘটনার পর যেমন বোঝা যায়নি যে মাত্র দু মাস পরেই আবার বিস্ফোরণ ঘটবে তেমনি এবারেও ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মাত্র দু'দিন পরে কলকাতা থেকে ১২০০ মাইল দূরে ভারতের আর এক প্রান্ত বোম্বাইতে যে নোতুন করে আবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে সে কথাও মোটে বোঝা যায়নি। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এ বোম্বাই সমুদ্রোপকুলের 'তলোয়ার' জাহাজের নাবিকদের অনশন ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনী বা Royal Indian Navy-এর বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে কলকাতা সহ সারা দেশে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সঙ্গে নৌবাহিনীর বিদ্রোহের যতটুকু যোগাযোগ তা হল এই যে উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে মানুষের রোষ একটি ব্যাপক আন্দোলন বা বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির ভারতীয় জাহাজী সেনাদের প্রতি সরকারের বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণ এবং ডিউটিরত ভারতীয় নাবিকদের খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের চরম ঊদাসীনতা তাদের মনে বহু দিন ধরেই ক্ষোভ সৃষ্টি করে চলেছিল। তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাদের কাঠগড়ায় তোলার ঘটনায় গোটা দেশ যখন বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে তখন এই সব জাহাজী সেনারাও উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। আর তাই কলকাতার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসার মুখে বোম্বাইয়ের এই সকল বিক্ষুব্ধ নৌসেনারা বিদ্রোহ শুরু করে। কলকাতার ফেব্রুয়ারী আন্দোলনের মত বোম্বাইয়ের এই বিদ্রোহেও জাহাজী সেনাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ হাত মিলিয়ে রক্ত ঝরিয়েছিল। ন্যাভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি জনতার এই অকুণ্ঠ সহযোগিতায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ঘোষণা করে ঃ "আমাদের জাতীয় জীবনে এই হরতাল একটা ইতিহাস রচনা করেছে। এই প্রথম সর্বজন স্বীকৃত স্বার্থরক্ষার তাগিদে পথের মানুষ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল সৈনিকেরা একযোগে রক্ত ঝরিয়েছে। আমরা প্রতিরক্ষা

বিভাগের কর্মীরা এ-কথা কোন দিনই ভুলতে পারব না। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক। জয় হিন্দ।"[২৭]

লক্ষ্য করার বিষয় যে বিদ্রোহী কমিটির এই কৃতজ্ঞতা বাণীর শেষ ছত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মরণীয় 'জয় হিন্দ' ধ্বনিটিই উচ্চারিত হয়েছিল। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে কলকাতার ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভের মত বোম্বাইয়ের নৌবাহিনীর বিদ্রোহও সাম্রাজ্যবাদী সরকার অচিরেই দমন করতে সমর্থ হয়েছিল।

কিন্তু সরকারের দমন নীতি সত্ত্বেও বিদ্রোহের দীপ শিখা বড় সহজে নির্বাপিত হয়নি। বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল করাচীতে। এমন কি সুদূর মাদ্রাজেও ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। দু দিন বাদে (২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬) মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরেও সেনাবাহিনীর এক বৃহৎ অংশ, আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন বুরহান উদ্দীনের উপর জারি করা দন্ডাজ্ঞার প্রতিবাদ করে এবং রয়্যাল ইন্ডিয়া নেভির বিদ্রোহী নৌসেনাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ধর্মঘট করে। ধর্মঘটীদের মধ্যে ইন্ডিয়ান সিগন্যাল কোর এবং ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিকাল এন্ড মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপোর কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যদিও তাঁরা শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস পদ্ধতিতে তাঁদের দাবী না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তবুও স্থানীয় লোকেরা এবং বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এটি আর একটি সিপাহী বিদ্রোহ বলে ধরে নিয়ে যে-যার দোকান-পাট ভয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। ধর্মঘটী সেনারা সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতিকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করে—তাদের মিছিলেও কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগের ঝান্ডা ওড়ানো হয়েছিল। তারা দেশের সব কয়টি রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই মর্মে অনুরোধ করে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জন মানসের এই পরিণত মুহূর্তে তাঁরা যেন একযোগে সকল বিরোধ ও বিভেদের উর্ধ্বে উঠে জনতার লড়াইকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। বিদ্রোহী সেনারা আমৃত্যু লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করে বলে যে তারা পরাধীন হয়ে জন্ম নিলেও এইবারে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বস্ব পণ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঃ "Although, we all were born as slaves we do not want to die as slaves and we will shed the last drop of our blood for our country's sake."[২৮]

১১ই ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী তিন সপ্তাহ ব্যাপী ভারতবর্ষের নানাস্থানে এক টানা বিরোধ-সংক্ষোভের ঘটনা সত্ত্বেও উদাসীন ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের উৎসব পালনের মত্ততায় অধীর হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের এই রকম অবিবেকী বিজয়োল্লাস জনতার ক্ষোভে ইন্ধন সৃষ্টি করেছিল এবং ৭-৮ মার্চে (১৯৪৬) দিল্লীতে এই উৎসব পালনের সময় তারা আবারও বিদ্রোহী

হয়ে ওঠে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, টাউন হল, রেড ফোর্ট, কনট প্লেশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, চাঁদনি চক প্রভৃতি অঞ্চলে জনতা ফের মারমুখি হয়ে ওঠে—'হাম লোগ ভুখা মরে তো ইয়ে লোগোঁকে ইয়ে তামাসা নেহি চলেগা'। তামাসা চলুক বা না চলুক, দু দিনের ঐ সব বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশ আবারও গুলি চালায় এবং আবারও বহু লোকের রক্ত ঝরিয়ে সরকার উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনে।[২৯]

১৯৪৫ সালের নভেম্বার মাসের শেষ সপ্তাহে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাদের বিচার প্রহসনকে উপলক্ষ করে যে গণ জাগরণ শুরু হয়েছিল পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাসে তা নোতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে গোটা বছর ধরেই ইতস্তত নানা জায়গায় এবং নানা সময়ে বিস্ফোরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু প্রতিবারেই রাজশক্তি এই আন্দোলনের ব্যাপকতা, সংহতি এবং ধ্বংসাত্মক শক্তি প্রত্যক্ষ করে ভয় পেলেও শেষ পর্যন্ত এগুলিকে দমন করতে সমর্থ হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই পরাক্রমের মধ্যে হয়ত বাহাদুরি আছে। কিন্তু এটাও সত্য যে আন্দোলনের নিজস্ব অনেক দুর্বলতা ছিল। ফেব্রুয়ারীর ঘটনাক্রম ধীরভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে আন্দোলন ছিল অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত এবং সম্ভবত সেই কারণেই আগাগোড়া পরিকল্পনাহীন। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের জঙ্গি মেজাজে জনতা যখন মেতে ওঠে তখন ধ্বংসের নেশায় তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে। অরুণা আসফ আলি বলেছিলেন যে সংবিধান রচনার প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের ঐকমত্য না হলেও ব্যারিকেডের ওপারে তাদের সহজেই একত্রিত করা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু গান্ধীজীর কাছে এই ধরনের ঐক্যবোধ মূল্যহীন। তিনি জানান যে কেবল সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যই যদি হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করা হয় তাহলে তাকে তিনি একান্তভাবেই অশুভ বলে মনে করেন।[৩০] আর জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা দেখেছিলেন যে জনতার উচ্ছ্বাস আর উম্মত্ততা একাকার হয়ে গিয়েছে—তাঁরা এই হিংসা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার রাজনীতিকে নিন্দা করেছিলেন। এমন-কি যে মুসলিম লীগ রসিদ আলির দন্ডাজ্ঞা বাতিল করার দাবীতে যাবতীয় গণ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই লীগের প্রাণপুরুষ জিন্নাও বড় লাটের সঙ্গে এক নিভৃত আলোচনায় রশিদ আলির প্রাণদন্ডাদেশের যৌক্তিকতা স্বীকার করে এসেছিলেন এবং বড়লাটের কাছে শুধু এই মর্মে গোলামের বিনীত প্রার্থনা জানিয়ে এসেছিলেন যে দন্ডাদেশ যুক্তিসঙ্গত হলেও মেহেরবান সরকার যেন অন্তত ব্রিটিশ-মুসলিম সম্পর্কের স্বার্থেও রশিদ আলিকে সর্বপ্রকার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[৩১] আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে

রশিদ আলির মুক্তির দাবীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদ্রাজে বীররাঘবনের নেতৃত্বে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশে স্থানীয় মহামেডান কলেজের ছাত্র নেতা মহঃ মেহ্‌কারি (Mehkari) জনতা কর্তৃক উচ্চারিত আজাদ হিন্দ ফৌজের 'জয় হিন্দ' ধ্বনির পাল্টা স্লোগান হিসাবে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আওয়াজ দেওয়ার জন্য জিদ করে।[৩২] শুধু কংগ্রেস বা মুসলিম লীগই নয়, জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টিও প্রথম দিকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারীর স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা 'প্রস্তুত হও' শীর্ষক নিবন্ধটিতে পার্টির এই ভুল-ত্রুটির কথা অকপটে স্বীকার করা হল। সোমনাথ লিখলেন যে বিগত দুই দিনে কলকাতার যাবতীয় ঘটনাবলীর যথার্থ মূল্যায়ন করতে না পারায় কমিউনিস্ট পার্টি ঘটনাস্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি। তারা বুঝতে পারেনি যে নেতারা যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন জনতা কিন্তু ঠিকই তাদের সকল বিভেদ ও বিরোধকে পাশ কাটিয়ে ব্যারিকেডের ওপারে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শেষ পর্যায়ের লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়েছিল। এই দ্বিধা ও সন্দেহের জন্য আন্দোলনের প্রথম দুই দিন অবধি কমিউনিস্ট পার্টিও কংগ্রেস ও লীগ মুখাপেক্ষিতার মানসিকতা ত্যাগ করতে পারেনি। পার্টির অন্যতম নেতা বীরেন রায়-ও স্বীকার করেছেন যে যুদ্ধোত্তর যুগের অভ্যুত্থান ও তাৎপর্য পার্টি বোঝেনি। "লক্ষ লক্ষ লোক ডালহৌসি মার্চ করেছিল ; তখন কমিউনিস্ট পার্টি যদি বলত লালবাজার দখল কর, তাহলে দু' হাজার মানুষ প্রাণ দিত।" কিন্তু তা হয় নি তার কারণ দ্বিধাগ্রস্ত পার্টি তখনও অবধি কোন স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করার দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি। পার্টি তখনও স্রেফ বুর্জোয়াদেরই পিছু পিছু ছুটে চলেছিল।[৩৩] অবশ্য অল্প দিনের মধ্যেই এই দোলাচলচিত্ততার অবসান ঘটে। আর তখন এই অভূতপূর্ব গণ আন্দোলনের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিই বিরাজ করেছিল।

ফেব্রুয়ারীর গণ-বিক্ষোভে মুসলিম লীগের অংশ গ্রহণের পিছনেও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সত্য বটে যে ১২ই ফেব্রুয়ারীর ওয়েলিংটন স্কোয়ার সমাবেশে সুরাবর্দ্দী উপস্থিত থেকে একটি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনারের একটি গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সেদিনের মিছিলকে সহরের নিষিদ্ধ এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতে দেওয়া হবে বলে পুলিশী সিদ্ধান্তের সংবাদটি তাঁর আগেভাগেই জানা ছিল (অবশ্য পরে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছিল)। আর তাই তিনি নিরাপদে জনতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করবার জন্য ওয়েলিংটনের সমাবেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এর ফলে আসন্ন নির্বাচনে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষপন্থী জনতার সমর্থন পাবেন বলে আশা করেছিলেন।[৩৪]

ছেচল্লিশের আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের মনেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বিস্ময় এই কারণে যে ফেব্রুয়ারীর সঙ্ঘর্ষে জনতার তথাকথিত হিংস্রতা ও আতিশয্যকে নিন্দা করে শরৎচন্দ্র বসু, নেহরু, আজাদ এবং প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দান করেছিলেন। গান্ধীজির মন্তব্য ছিল আরও কঠোর এবং তিক্ত। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের এই সব নেতারাই কিন্তু জনতার হিংসাত্মক বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সম্ভাবনা আন্দাজ করতে পারলেও ঝুঁকি নিতে অস্বীকৃত হন নি। গান্ধীজি তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটিশ রাজত্বের সুশৃঙ্খল মাৎস্যন্যায় দূর করবার জন্য দেশে যদি কিছু সময়ের জন্য আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে তা হলেও তিনি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।[৩৫] আর গান্ধীজীর ভাব-শিষ্য-নেহরুও আগস্ট আন্দোলনের হিংসাত্মক তীব্রতা দেখে কয়েকবার আফশোষ করলেও আন্দোলনকারীদের বীরোচিত সংগ্রামে গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেসী নেতাদের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ছেচল্লিশের গণ বিস্ফোরণ সম্পর্কে তাঁদের নিন্দাসূচক উক্তিগুলি অসঙ্গত এবং পারম্পর্যহীন বলে মনে হয়।

কিন্তু তবুও বিস্ময়ের বিপন্নতা বোধ কেটে যায় যখন মনে আসে যে কংগ্রেসের পক্ষে আগস্ট আন্দোলনকে মদত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে ঐ আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোন যোগাযোগ ছিল না। আর ১৯৪৫-৪৬ এর আন্দোলনের তীব্রতা সৃষ্টিতে কমিউনিস্টদের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশী। বস্তুত কংগ্রেসের পক্ষে এমনটি হওয়া ছাড়া সম্ভবত গত্যন্তরও ছিল না। কেননা দেশের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা যতই উজ্জ্বল হয়ে আসছিল ততই নিজেদের বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ এবং দেশের ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থ সুরক্ষিত করার তাগিদে কংগ্রেস এই সব আন্দোলনকে কখনোই লাগাম ছাড়া রকমের তীব্র হয়ে উঠতে দিতে পারেনি।[৩৬] তাই শৃঙ্খলার নামে এবং দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে কংগ্রেসকে এই উত্তাল গণ আন্দোলনের রাশ টানতে হয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষে এটা ছিল গদি লাভ তথা অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার প্রশ্ন। র‍্যাডিক্যালিজিম-এর ঝোঁকে এই বিপুল সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দেওয়া কংগ্রেসের মতে যুক্তিসম্মত ছিল না। এই জন্যেই প্যাটেল বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের তল্পি গোটানোর মুহূর্তে এমন কিছু করা কারও পক্ষেই উচিত হবে না যাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দূরে সরে যায়। আবার এই কারণেই সিমলা সম্মেলনের (জুন, ১৯৪৫) পর থেকেই কংগ্রেস মহলে 'Wavell is sincere' নামক আত্মপ্রবঞ্চনামূলক প্রচারটি চালু করে দেওয়া হয়েছিল।[৩৭]

রশিদ আলি দিবস ও পরবর্তী কয়েকদিনের কলকাতা যেন উনিশ শতকের বিপ্লবী প্যারিসকেও হার মানিয়েছিল। আর এইখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও

তার প্রাণ পুরুষ সুভাষচন্দ্রের জিত।[৩৮] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানীর উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন তখন অনেকেই তাঁর কর্মসূচীকে রাজনৈতিক হঠকারিতা বলে মনে করেছিলেন। তারপর জনযুদ্ধের সন্ধি মুহূর্তে তিনি যখন অচিরেই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ভারত অভিযান করেন তখনও তাঁর বিরোধিতা করতে এবং তাঁর নির্দয় সমালোচনা করতে কোন দলই বাকী রাখেনি। কমিউনিস্টদের সুভাষ সমালোচনা নিশ্চয় খুব তিক্ত ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সমালোচনার মধ্যেও ঝাঁঝের অভাব ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর না-জানি তাঁর আরও কত রাজনীতির ক্ষুরধার-জ্ঞান-সম্পন্ন সমালোচকের ওষ্ঠে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছিল!

তবু কেতাবী অর্থে এই ব্যর্থকাম মানুষটিরই জয়-জয়কার ঘোষিত হয়েছিল ৪৫-এর নভেম্বরে আর তার পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে। হয়ত কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টির মত রাজনৈতিক দলগুলির কেউ আসন্ন নির্বাচনের স্বার্থে কিংবা আরও কিছু গূঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধির প্রত্যাশায় এই সময়কার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। হয়ত এ-কথাও সত্য যে এই সব আন্দোলন ছিল নিতান্তই মুহূর্তের আবেগ সঞ্জাত, তার মধ্যে বিপ্লবের পরিকল্পনা-লব্ধ দৃঢ়তা ছিল অনুপস্থিত। আবার এ-কথাও হয়ত সত্য যে নভেম্বার ও ফেব্রুয়ারীর সেই প্রমত্ত দিনগুলির অনুপম শৌর্য ও মহৎ স্বার্থ ত্যাগ সত্ত্বেও এ-দেশের রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তনকে দীর্ণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তবু কে ভুলতে পারে সেই জনগণমন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের কথা—যিনি অনুপস্থিত থেকেও হয়েছিলেন সর্বত্রগামী, আর যাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল?

সূত্র নির্দেশ

১। এ-কথা বলার অর্থ এই নয় যে জনতার দাবী অনুযায়ী সরকার আজাদ হি ফৌজের সেনাদের প্রতি সর্বত্র এবং সর্বদা খুব সদয ব্যবহার করেছিলেন। কি গোড়ার দিকেব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' (Waging wa against the King)-এর মত অস্পষ্ট অভিযোগের পরিবর্তে এখন থেকে কেব যুদ্ধবন্দীদের হত্যা এবং তাদের উপর সভ্য সমাজ পরিপন্থী বর্বর নিপীড়ণ করা অভিযোগেই ফৌজি সেনাদের বিচার করা হবে বলে স্থির হয়েছিল। আ সেনাপ্রধানের নির্দেশে অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকের সাজা মকুব করা হলেও আর অনেককে যে গুলি করে বা ফাঁসি দিয়ে মারা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তাই ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখেও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রী এন. জি. রঙ্গার একটি প্রশ্নের জবাবে বিদে সচিব ফিলিপ ম্যাসন (Philip Mason) জানিয়েছিলেন যে সম্প্রতি আজাদ হি ফৌজের বন্দীদের মধ্যে নয় জনকে জেলের মধ্যেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্ট Mitra H. Mitra N. (ed.) *The Indian Annual Register*, Vol. I., 194(New Delhi, 1990, p. 38.

২। *T.P.* Vol. VI, Document no. 246, pp. 552-54.

৩। *ibid.* Document no. 326, p. 724.

৪। Sarkar Sumit, *Modern India : 1985-1947*, Calcutta, 1983, p. 421

৫। প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য অবন্তীকুমার সান্যাল ও গৌত চট্টোপাধ্যায়, 'রক্তের স্বাক্ষব', কলকাতা, ১৯৪৫। উদ্ধৃত অংশটি যে বই থেে সঙ্কলন করা হয়েছে সেটি হল ঃ অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ ঃ অসমা বিপ্লব', কলকাতা, পৃঃ ৪৫-৪৬ (প্রকাশনার তারিখ দেওয়া নেই)। আরও দ্রষ্ট Govt. of Bengal Home (Pol) Deptt. 463/1945. Press note on Calcutt disturbances that took place in connection with observance of I.N.A Day.

৬। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩-৫২

৭। ২৩ নভেম্বার ১৯৪৫-এর ঘটনার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য Mitra H & Mitra N. (ed.), *The Indian Annual Register*, Vol.II., 1946, Ne Delhi, 1990, p. 29–'Chronicle of events.'

৮। অমলেশ ত্রিপাঠী, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস', কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৯৩

৯। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬, ৪৮

১০। ঐ, পৃঃ ৪৮—প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে কুমুদ বিশ্বাস ১৯৪৩-৪৮ এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন।

১১। ব্যাতিক্রম শুধু জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ও বীণা দাস (ভৌমিক)। তাঁরা ছাত্র সমাবেশে বহুক্ষণ অতিবাহিত করেন।

১২। আনন্দবাজার পত্রিকা, শুক্রবার, নভেম্বার ২৩, ১৯৪৫, পৃঃ ১—'ছাত্রদের প্রতি শরৎচন্দ্রের বাণী'।

১৩। সুধী প্রধান, 'সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি', কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ২৭০-৭১

১৪। Sarkar Sumit, *op. cit.*, pp. 421-22.

১৫। অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৩

১৬। ঐ, পৃঃ ৩৯৩—Moon P., *Viceroy's Journal*, Delhi, 1977, pp. 188-89 থেকে উদ্ধৃত

১৭। *The Indian Annual Register*, Vol.I, 1946, pp. 27-31.

১৮। *ibid.* p. 282.

১৯। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এর ঘটনা সমূহের নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদনের জন্য দ্রষ্টব্য *Essays in Honour of Prof. S.C. Sarkar*, New Delhi, 1976 শীর্ষক বইতে Gautam Chattopadhya-এর লেখা The Almost Revolution (A. Case Study of India in February 1946), pp. 429-31 এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ', কলকাতা, ১৯৮০

২০। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০-৬১

২১। হতাহতের বিস্তারিত তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য ঐ, পৃঃ ৬৪-৬৬

২২। Govt. of India, Home (Pol)/F.N.5/22/1946. Confidential telegram–R/3655.

২৩। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এর ঘটনার বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ *Indian Annual Register*, Vol.I., 1946, pp. 275-80.

২৪। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮

২৫। ঐ পৃঃ ৭৩

২৬। *T.P.*, Vol. VI, Document no. 442, para 5, p. 1008.

২৭। *The R.I.N Strike* (by a group of victimised ratings), New Delhi, 1981, p. 75 এবং Sarkar Sumit, *op. cit.*, p. 425.

২৮ । *The Indian Annual Register,* Vol. I., 1946, p. 328.

২৯ । *ibid.* p. 329.

৩০ । *ibid.* p. 425.

৩১ । *T.P.*, Vol. VI, Document no. 526, p. 1190.

৩২ । *The Indian Annual Register,* Vol. I., 1946, p. 279.

৩৩ । অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯

৩৪ । *Essays in Honour of Prof. S.C. Sarkar,* p. 444.

৩৫ । *T.P.*, Vol. II., p. 96.

৩৬ । Sarkar Sumit, *Popular Movements and Middle Class Leadership in Late Colonial India,* Calcutta, 1985, pp. 63, 64.

৩৭ । হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর', কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ৩৯৪

৩৮ । ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এই উত্তাল গণ আন্দোলন সম্পর্কে কলকাতার পুলিশ কমিশনার, বাংলা দেশের তৎকালীন মুখ্য সচিব স্টিভেনস (H.S.E. Stevens)-এর কাছে ৮ই এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখে ফুলস্ক্যাপ কাগজের টাইপ করা মোট ৮১ পৃষ্ঠার একটি বিস্তারিত বিবরণী ('Detailed Report on the disturbances in Calcutta in February 1946') পেশ করেছিলেন । দ্রষ্টব্য— Govt. of Bengal, Home (Pol) Deptt., 463/1945.

পরিশিষ্ট

Address of Counsel for defence

by *Bhaulabhai Desai*

Red Fort, Delhi.
December 1, 1945.

On 2nd July 1943, Sri Subhas Chandra Bose arrived in Singapore. He later took command of the Indian National Army and there was a conference of what is called Greater East Asia, attended by Indians, with delegates belonging to the Indian Independence League from different parts of the Far Eastern countries. One of the resolutions at that Conference was that a Provisional Government of Free India should be established. The next event of importance is that on the 21st October 1943 there was proclaimed a Provisional Government of Free India which for brevity I will call 'Provisional Government'. That Proclamation is one to which I shall refer later, but now I will try to give the Court events of importance which the Court will have to bear in mind. On the Proclamation of that Government the different Ministers concerned with the functions of the State took Oath of Allegiance, of course headed by Netaji Subhas Chandra Bose as the Head of the State. The next event of importance is the Declaration of War by that Government on Britain and America. The next event of importance thereafter is that so far as the I.N.A. was concerned, it began to carry out its functions under the orders of the new State. Thereafter the events of importance so far as the actual facts are concerned, are only three: the movement of this Government from Singapore to Rangoon; the movement of the Indian National Army from Burma into, beyond and within the territories of India right up to Kohima; and the rest, dealing with the retreat of that Army back again until the event which took place at Rangoon slightly before, at the time, and slightly after the occupation of Burma by the British Forces. These Sirs, are the main undisputed events with which the Court is concerned. Bearing in mind these events, I shall now place before the Court the conclusions of facts which we submit have been established either in cross-examination of the evidence of the prosecution or in the affirmative evidence which we have called in defence.

The first conclusion of fact which we ask this Court to accept is

that the Provisional Government of Free India was formally established and proclaimed. I submit, Sirs, there can be no doubt about this event and no cross-examination of witnesses who have been called to prove that event, as far as I can see, has been seriously attempted. You have to remember, Sirs, the picture of the Proclamation of that Government and Exhibits put in on that point. Before I proceed any further, I wish to call attention to that proclamation. It is Exhibit FFFF before this Court. I do not wish to read the whole of that document; the only passages which I wish to read are passages which bear on the issue before this Court.

Reads the following from the documents :

"Forcibly disarmed by the British after 1857 and subjected to terror and brutality, the Indian people lay prostrate for a while – but with the birth of the Indian National Congress in 1885 till the end of the last World War, the Indian people, in their endeavour to recover their lost liberty tried all possible methods – namely, agitation and progaganda, boycott of British goods, terrorism and sabotage – and finally, armed revolution. But all these efforts failed for a time.Ultimately in 1920, when the Indian people haunted by a sense of failure, were groping for a new method, Mahatma Gandhi came forward with the new weapon of non-co-operation and civil disobedience.

"Thus, on the eve of the present World War, the stage was set for the final struggle for India's liberation. During the course of this war, Germany, with the help of her allies, has dealt shattering blows to our enemy in Europe – while Nippon, with the help of her allies has inflicted a knockout blow to our enemy in East Asia. Favoured by a most happy combination of circumstances, the Indian people today have a wonderful opportunity for achieving their national emancipation.

"For the first time in recent history, Indians abroad have also been politically roused and united in one organization. They are not only thinking and feeling in tune with their countrymen at home, but are also marching in step with them along the path to freedom. In East Asia in particular, over two million Indians are now organized as one solid phalanx, inspired by the slogan of "Total Mobilisation".

I stop here to submit to the Court that evidence have been adduced as to the numbers of Indians in East Asia and the figure mentioned here is more or less what is borne out before this Court.

"Having goaded Indians to desperation by its hypocrisy, and having driven them to starvation and death by plunder and loot, British rule in India has forfeited the goodwill of the Indian people altogether, and is now living a precarious existence.

"It will be the task of the Provisional Government to launch and to conduct the struggle that will bring about the expulsion of the British and of her allies from the soil of India. It will then be the task of the

Provisional Government to bring about the establishment of a permanent National Government of Azad Hind constituted in accordance with the will of the Indian people and enjoying their confidence. After the British and their allies are overthrown, and until a permanent National Government of Azad Hind is set up on Indian soil, the Provisional Government will administer the affairs of the country in trust for the Indian people.

'The Provisional Government is entitled to and hereby claims, the allegiance of every Indian. It guarantees religious liberty, as well as equal rights and equal opportunities to ail its citizens. It declares its firm resolve to pursue the happiness and prospertity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the nation equally and transcending all the differences cunningly fostered by an alien government in the past.

"In the name of God, in the name of bygone generations who have welded the Indian people into one nation, and in the name of the dead heroes who have bequeathed to us a tradition of heroism and self-sacrifice, we call upon the Indian people to rally round our banner, and to strike for India's freedom".

Then follows the signature of the members of the Government. The reason why I called attention to this document is the purpose for which the Proivisional Government was formed, and the means by which that Provisional Government intended to carry out its purpose. The fact that it failed to achieve its purpose is entirely irrelevant to the issue before this Court. That is the first fact which we say has been established. The second fact which we say has been established is that it was an organised Government. It does not require many words to establish that proposition. Witnesses have spoken before the Court as to the allocation of duties which appear at the end of the document which I have just read to the Court, and it is also in evidence before the Court that the Indian Independence League became the executive of the Provisional Government which organized, so far as it was possible to do in those warlike conditions, the care of the people who owed allegiance to it. In the month of June 1944, as the evidence is quite clear – it is also in the Exhibit – in Malaya alone, 2,30,000 persons actually took written Oaths of Allegiance to the Government. That was in June 1944, and it is in evidence that thereafter the process continued. The object of stating the figures is that it was not a case of a Government of what you may call, or what somebody being my opponent may facetiously call, a set of rebels, a desultory sort of crowd of no consequence. I wish to give a lie to that kind of suggestion, and that is the reason why I suggest that the Provisional Government was an organized Government to whom the whole of the two million odd people owed allegiance, and out of whom 2,30,000 persons actually took the Oath of Allegiance in Malaya.

Then, Sir, the next fact which I submit is established before the Court is that this Government was recognized by the Axis powers. I use that expression briefly because it is quite unnecessary either in law or in fact to prove that the recognition must be by a particular class of Governments. The recognition is proof and more than proof that it had the right to declare war for the purpose for which it intended to fight, and having the right to declare war in so far as its armies were concerned they became subject to the international laws of war.

On the question of recognition, I wish to call attention to certain cross-examination by my learned friend. Of course in so far as recognition by Germany or Itlay was concerned there could be no cross-examination and none was attempted. But with reference to certain East Asia matters in those days, a suggestion was made that those Governments were under the control of Japan. I for my part, with very great respect fail to understand the significance of the suggestion. Supposing Japan had an Empire, that is to say succeeded in keeping the territories it conquered without giving them liberty, the recognition would be nonetheles effective because it makes no difference whether and which Government recognised this particular Government of Free India. The point still remains, and I assert that the recognition is but a proof of what I may call a statehood which gives it the capacity of declaring and making war for the liberation of its own country-men. The material point therefore is whether it had attained that degree of statehood which gave it that power. Once you have a State which can and is entitled to declare war, the war itself is its own justification. There is no question that any two independent States have a right to declare war. Any act done in the prosecution of that war is justified by the mere fact of the war itself. Barring this, it may be asked why trials are going on in parts of Asia and elsewhere, and in Germany. In fact they themselves emphasize the truth of the correctness of the proposition that any act done in due prosecution of war cannot be the subject of any municipal court by way of examination. What has happened is that in addition to the due prosecution of war according to civilized laws, individuals have been guilty of acts outside the pale of civilized warfare, which we popularly call now war crimes. But the very fact that you can only deal with and do deal with war crimes, emphatically and clearly proves that in so far as the normal civilised conduct of war is concerned including the use of an atomic bomb, is outside the pale of examination by way of right or wrong by any municipal tribunal. Then, Sirs, the next fact which I submit is established is that this State had an army which was properly organised, having its own distinctive badges and emblems, functioning under regularly appointed officers. I am obliged to the prosecution in this matter

for I was spared the necessity of having to prove this proposition. They put in document after document to show that the Indian National Army was properly organised. First, that it was regulated by an Indian National Army Act. The only point as far as I could see from the cross-examiation which was made was with reference to certain items of corporal punishment. On that it is necessary to point out to the Court that for the moment those who pursue that course forget the course of legislation in British India itself. It is true that Lieut. Nag told the Court that apart from the Indian Army Act certain provisions relating to corporal punishment were incorporated in the Indian National Army Act.I was probably forgotten that a little while before. in the Indian Army Act were incorporated provisions in Section 45 of that Act, headed "Corporal Punishment". I am reading from Section 45 of the Indian Army Act of 1911:

"Where any person subject to this Act, and under the rank of warrant officer—

(a) On active service, is guilty of any offence; or (b) at any time is guilty of the offence specified in clause (c) of section 31 or (d) at anytime is guilty of a civil offence which would be punishable with whipping under the law of British India, and is triable by court-martial under this Act, it shall be lawful for a court-martial to award for the offence corporal punishment not exceeding thirty lashes".

It is true that about the time of this war this particular provision was omitted.But it is a mistake to think that a similar provision in the Indian Statute Law did not exist. As a matter of fact, in so far as the Defence of India Act and certain Ordinances are concerned, the provision was definitely made, making corporal punishment as part of the punishment applicable to the personnel of the Indian Army. Ordinance 37 of 1943 practically replaced the provisions of the Indian Army Act which were not found in it; a certain amount of effort was made as if under an Act governing a civilised army corporal punishment was not permissible as against the provisions which were to be found in the Indian National Army Act. I am quite certain that it was done under misapprehension.

The Military Operation Areas Special Powers ordinance, Part II, Sections 22 and 23 read :

"Sec. 22 : Whoever commits an offence punishable under Section 121-A. 122, 125 or 131 of the Indian Penal Code (XLV of 1866) may, in lieu of any punishment to which he is liable under the said code, be punished with death.

"Sec. 23 : Whoever contravenes any of the provisions of Rule 36 of the Defence of India Rules or is deemed under the provisions of the said Rules to have contravened such provision, may, in lieu of any punishment to which he is liable under the said Rules, be punished with

death, or with whipping, in addition to any punishment to which he is liable under the said Rules". I will be able if necessary to read out all the Rules which clearly show that under the Indian Law, taken as a whole, the punishment with reference to whipping exists, such as the provision which was made in the Indian Army Act.I have got, Sirs, a summary made out of the provision with reference to whipping which I shall afterwards hand over to the Court. Shortly stated, my submission to the Court is this that the only attack made by the Advocate-General on the making and framing of the Indian National Army Act, was the provision with reference to whipping, and I submit to the Court that was done under a misapprehension, for it is as much a part, though not technically quite, in the Indian Army Act but in the Defence of India Rules and the Ordinance. It makes no difference. But taking in the aggregate, Indian legislation does sanction corporal punishment throughout the period with which we are concerned and therefore it is that I say and submit to the Court that this was a properly organised army, having a code of its own, which for all practical purposes is the Indian Army Act and any condemnation of the rules under which that army functioned is a condemnation of the Indian Army Act itself, which I submit is not the purpose of the prosecution in this case. Therefore, we come back, Sirs, to this point that this was an organized army functioning under a civilised code. As regards the appointment of officers and the regular method by which it was done, as regards the different branches and the functions, you, Sirs, are more competent than myself to judge from the documents which have been placed before you. They are in the shape of army orders or orders of the day and so on, which have been placed before the Court. On a question of fact we have arrived so far that there was a state which declared war for the purpose of fighting for the liberation of the country and it had an organised army organised under a code which for all practical, substantial purposes. accorded with the aggregated law on the same subject prevailing in British India. I use the word aggregate, because I must bring in the other laws also which provided for and permitted the infliction of corporal punishment in all these cases.The next fact which is established beyond all dispute was that the object of the declaration of war by the Provisional Government of Free India was the liberation of India.

The next important fact which I think must be mentioned is that the Indian National Army was formed with two pruposes. The main purpose was the securing the liberation of India and no doubt, Sirs, from the most important witness that the prosecution called, it has never been difficult to establish that was the object with which that Army was formed and that was the object with which the individuals who joined it.The other

object also was which was somewhat subordinate, but useful purpose, the protection such as could be afforded to the Indian inhabitants of Burma and Malaya, particularly during the days when law and order in those parts of the country was poorly looked after, the lives and the honour and the property of the people was not quite so easily protected. The first object is the one which the army was called upon to fulfil as a part of its duties. Again taking the evidence as a whole, I submit it has been amply proved before this Court the I.N.A. was formed with the object of fighting for the liberation of India and also with the object of protecting the lives, honour and property of people residing in East Asia at the time.

The next point which is established, I submit, is this though I speak with less confidence because I do not see it admitted - but the fact has been proved and it is my duty to examine the evidence on it, is that the Japanese Government or the Nippon Government as it is called, ceded to the new Indian State the islands of Nicobar and Andamans, that the Indian State acquired territory in the form of Ziawadi, which was about fifty square miles in area, and that it administered for a period of four to six months the Manipur and Vishnupur areas.

As regards the first, in so far as Lieut. Nag was concerned, he has given definite evidence that the two islands were ceded. The evidence falls under three parts : the first is a declaration to that effect by the Japanese Government, announced by a document which has been proved before this Court. That document is a statement by General Tojo that they were about to concede the islands of Andamans and Niccobar to the Free Indian Government. That document is UUUU. (Counsel reads relevant portions of the document). This was on the 5th November 1943.

Document Ex. UUUU
Statement by Prime Minister General Hideki Tojo regarding the Independence of India.

(Delivered before the Assembly of Greater East Asiatic Nation. November 6, 1943).

"Not only India but all Greater East Asia was, without doubt, highly invigorated by the speech just given by His Excellency the Head of the Provisional Government of Azad Hind, in which His Excellency made it clear that the Indian people under the Provisional Government, with the future destiny of India and of Asia at heart, have risen resolutely to realise their long-cherished aspiration to regain India's freedom, inde pendence and p sperity.

As has been reiterated in the various statements already issued,the Empire of Japan means to give India every possible aid so that she may free hereself from the American and British yoke and attain her long-cherished ambition. Now that the foundation of the Provisional Government of Azad Hind has been solidified still further and the Indian patriots under the same Government, bound in close units as never before are firmly determined to accomplish their steadfast aim, I take this occasion to declare that the Imperial Government of Japan is ready shortly to place the Andaman and Nicobar Islands, Indian territory now under the occupation of the Imperial Japanese Forces, under the jurisdiction of the Provisional Government of Azad Hind, as the initial evidence of her readiness to help in India's struggle for independence.

The lofty ideal that guided Japan's national founding of enabling all peoples to have each its proper status and to enjoy well-being has been and is being steadily carried out. The Japanese Empire today has been strengthened further in its determination to extend all-out co-operation to India in her fight for freedom. Japan is anxious that the Indians on their part shall extend redoubled efforts in that direction.

From the spirited utterances by Their Excellencies the representatives of various countries of East Asia at yesterday's and today's sessions of this Assembly, I note with assurance and satisfaction that these countries, in concert with Japan, are extending every support to the cause of India's independence. I trust and hope that they will give even greater support to that cause in the future".

Then followed events which clearly showed that purpose was carried out. You have in evidence that declaration was made and that the new Indian State was called upon to administer it by means of a Commissioner, that a Commissioner was in fact appointed, that the Commissioner in fact went, and you have evidence of a definite ceremony at which the naval and military authorities then in charge handed over the islands to the Commissioner on behalf of the Indian State at Port Blair. These are points on which as far as I am able to see the evidence, very little criticism has been made by way of cross-examination.

The point on which there has been a difference between the Prosecution and ourselves is the actual form and extent of the administration of the islands. But it is clearly a misconception to confuse the ceding of a territory and taking over every item of administration of that territory, particularly under the conditions then prevailing. The fact is – and it is commonsense I submit – that a house might well be sold and completely sold, sold outright and yet possession for a time may not be wholly given. It is a familiar illustration I am giving so that it is easy to appreciate. In the somewhat elaborate cross-examination for this purpose of Col.

Logonadan, it was intended merely to point out that the whole of the administration was not taken over –which is not denied – he said it over and over again; and I think it is established and I ask the Court to hold it is established that he went for the purpose of taking over the administration. It is true that he did not take over more than two items – one, education and the fact that the area was small and the people ignorant is hardly an argument that he had not taken over the administration. I daresay in other countries where the standard of literacy is something like 99 per cent, there are many more schools than in this unfortunate country where the standard of literacy is probably 15 per cent. Therefore the argument that schools were few and the expenditure was so little – I think there is very little point in the cross-examination on this matter. I did enter a protest but it was overruled and it is not for me to say anything more about it. But you do not detract from the cession of a territory in quantity or time by pointing out that the whole of the administration was not and could not be taken over. Colonel Logonadan told the Court again and again – almost painfully over again – of the fact that until he got complete control of the police in the matter of spies (which seemed to be a sore point with the local inhabitants), he was not prepared to take over any other part of the administration. But there is one significant thing that my learned friend got out of Colonel Logonadan, and that is that one of the officers who went with him, administered what you may call very elementary justice which it was possible to do in the conditions then prevailing in the islands. So much so that having asked it and got it, he tried to shake it off but he could not, and it was proved to the hilt that Justice and Education were taken over. True, police was not taken over because the Japanese from the point of view of defence were keen on retaining control over what you may call the spy population of these islands. But one thing remains and that is the most significant, and that is the renaming of the islands. So that any amount of examination as to why or how month by month or day by day further acts of administration were not made, cannot possibly get rid of three important facts; first, the clear solemn declaration that the islands would be handed shortly. A suggestion was made – it remained as a suggestion only – that they would be handed over after the war. Where my friend got the words "after the war" I do not know. I hope he will point it out and that is why I read out this document. The document clearly shows that they were to be very shortly handed over.

The second fact was that it was to be administered through a Commissioner, which was a definite proposition made at that time. A Commissioner was in fact nominated by the Provisional Government and the Commissioner in fact reached there and began to function. No doubt,

as in every case of this kind, I presume this Court will take almost judicial notice of the fact as to how Germany and other countries are being administered today. No doubt the man will be qualified, and he may be the best educated man from amongst his staff, and he may hope that the local machinery would soon adapt itself for the purpose of continuing the administration, because it is unthinkable that you can transfer quickly and at one stroke the whole administrative machinery from one country to another. Anybody who is familiar with the administration of this very country, is aware that Britain administers this country through practically the entire machinery of the Indian people themselves. So that the number of men and all the rest of it, I submit, is so much, without any disrespect, hot air. The real point is, were or were not the islands ceded ? And I say there is so much evidence that they were.

The last point is the renaming of the islands: Shahid and Swaraj.

I submit that it is clearly established on the evidence before this Court that though by reason of the exigencies of the situation,it may not have been possible to take over the complete administration, in law and in fact the islands were given over to the Indian State, or to what I would call the Provisional Government.

Next I deal with the question of Ziawadi. The position is this, according to the evidence on the record: that this was a property, about 50 sq.miles in area, with 15,000 inhabitants who were Indians. It had on it a sugar factory and various other means of production, agricultural or otherwise and every branch of administration of that territory was carried out by men appointed by the Indian National Army and belonging to the Azad Hind Dal.

My learned friend did not even venture, in the course of cross-examination, to challenge the truth of the statements made before this Court by witness Shiv Singh and Arshad on this head. Shiv Singh said that every branch of administration was taken over. He gave the name of the person who was the officer in charge of every branch of administration, Revenue, Police, P.W.D. Justice, both civil and criminal. Under these circumstances, the legal position is simple. I shall come to it in greater detail afterwards. Japan conquered Burma. By right of conquest it was in a position to dispose as it liked of the whole or any portion of any territory and as the witness told you clearly, by reason of the agreement between the Provisional Government: this territory was handed over as a part of the liberated territory to the I.N.A. and the Azad Hind Dal. At this stage let me point out to the Court that the Azad Hind Dal, it has been proved,was an organisation of men trained for the purpose of administering areas as soon as they came under the control or occupation of the I.N.A. or as soon as they were handed over to them. I must

also remind the Court that it has been proved beyond question because as far as I see there was no cross—examination or effective cross—examination any way, that as soon as the I.N.A. crossed the borders of Burma into India a proclamation was issued in two parts, one signed by the Head of the Indian State and the other signed by General Kawabe under the orders of the South Eastern Command. In that it was distinctly stated that any part of the Indian territory which would be acquired by conquest or otherwise by the Japanese Army would be handed over to the I.N.A. for the purpose for forming part of the liberated territory and to be administered by them. That is the history of the ceding.

Then we come to Manipur and Vishnupur areas. Evidence has been given before the Court without any reasonable demur to the effect that during the time, the Japanese and the I. N. A. were operating, those portions of India were in fact administered by the I.N.A. through its organisation, the Azad Hind Dal and the area was 150,000 square miles. The duration of administration has no bearing on this issue, for indeed it can happen, as it did happen in this war, that territories were as easily acquired as lost. This Court is not concerned with the question of duration. I would ask the Court to hold that the two islands, Andamans and Nicobar, were in fact ceded, that Ziawadi became a part of liberated Indian territory, and that, though for a short period of time, Manipur and Vishnupur areas were exactly in the same position.

The next point to which I wish to refer is the resources of the State. In order to judge the existence of the State the resources of the State is also one of the matters to be considered. It has been proved before the Court that some 20 crores of rupees were in fact donated to the State, out of which was maintained the civil government and the army. Dina Nath, who impressed this Court, gave extremely clear evidence on this head. He was one of the Directors of the Azed Hind Bank and he told the Court that between Burma and Malaya, during that short period of time, the State had resources to the tune of 20 crores of rupees, in addition to the produce of Ziawadi. It is a remarkable thing to notice that on the reoccupation of Burma and Malaya every single document which was in the possession of this Indian State was found intact. It was amazing. See the monthly reports which the Prosecution was able to produce with reference to the administration of the Andamans and Nicobars! It only emphasizes—and I wish to make a point of this– that there was a complete organisation, and that organisation was as good as could resonably be expected. That alone accounts for half the documents which my learned friend was able to produce. . . . .

. . . . The point is that we were a little handicapped owing to the lack of certain documents. As the evidence before the Court shows, this Bank

was closed after the occupation of Rangoon, and in fact it is in evidence that some 35 lakhs worth of property was sequestered. I am not complaining of the sequestration. That I think was the right of the conquerors. What I am saying is that in so far as the resources of the State were concerned, they were full and adequate for the purposes which the new State had then in view.

Here I wish to refer to a bulletin. It is not what I might call technical evidence before the Court but it may be my duty to submit that it is a document of which the Court should take judicial notice. The document is dated the 10th November 1945 and called Stamp Collecting.

Mr. N. P. Engineer : My learned friend is reading from a document which has not been accepted.

Mr. Desai : I am only making a submission to the Court. Is it my friend's contention that if I read a book on law, it should be put in as an exhibit?

Judge-Advocate : The document itself cannot be admitted at this stage.

Mr. Desai : All I am doing now is to make a submission to the Court. Section 57 says :

"The Court shall take judicial notice of the following facts:

"In all these cases and also in all matters of published history, literature, science or art the Court may resort for help to appropriate books or documents of reference."

And if the learned Advocate General solemnly suggests that every single book of history, literature, science, and art is to be an exhibit before it can be referred to, I am very sorry that it is a statement which defeats itself.

Judge-Advocate : Mr. Desai, will you read out what you want the Court to take judicial notice of ?

Mr. Desai : May I not apply that the Court may consider it? and I am asking is that this application be considered. Of course the Court may reject it; I am not suggesting that the Court is bound to accept it. My submission is that under Section 57 it may be taken judicial notice of.

I was referring to an issue of November 10, 1945, of a weekly publication called "Stamp Collecting" published in London and edited by Douglas Armstrong, a well-known philatelist. In that issue at page 136, column 1, the following appears :-

"Imphal Stamp that failed.

"So confident were the Japs that they would occupy Imphal, when they invaded Southern Assam that they actually prepared a special issue of stamps for use there. Needles to say these stamps failed to materialise, but our correspondent, Flying Officer T. A. Broomhead, informs us that he has seen proof impressions in the hands of the man who was respon-

sible for the printing (in Rangoon). Two denominations appear to have been prepared, viz., 3 pice plum and 1 anna red, both in the same design and roughly perforated $11^1/_2 \times 9^1/_2$ (approx). The subject of the vignette (illustrated is the old Moghul Fortress at Old Delhi accompanied by the slogan "On to Delhi." Bi-lingual inscription reads "PROVISIONAL GOVERNMENT OF FREE INDIA." When it became evident that Imphal stamps would not be required, the dies were destroyed and the bulk supply of sheets printed in readiness was burnt with the exception of a small quantity salvaged by the printer".

At the top corner on the left-hand side is a facsimile of the stamp referred to in the above quotation.

It is submitted that this document should be taken judicial notice of in support inter alia of proof that Provisional Government of Free India had got prepared, issued or were about to issue postal stamps of that character. As appears from the above quotation, the dies were prepared under the direction of the Japanese.

Counsel for the Prosecution : I submit.

Judge-Advocate : Would it not be more convenient to deal with this point in your arguments, and so shall I. There is no point, when the document is read whether the Court accepts it or not.

Mr. Desai : I frankly submit to the Court that it is not a matter of such importance, but as the document was brought to my notice I thought it was my duty to put it before the Court. Nobody should question books of history, science, literature and art. It is a very accepted magazine in England dealing with this subject, edited by a very well-known man indeed.

Then, Sir, it appears from the evidence that this Indian State had a Civil, and what I may call, an Army Gazette of its own. That is also established before this Court.

On these facts, Sir, the first question of law which I wish to raise is this : Having regard to the condition in which this Free Government of India had been formed and was functioning, it was entitled to make war and it did make war for the purpose of liberating this country. That is the first and the main issue before the Court. This Court is trying civil offences under the Indian Penal Code, and there are two ways of looking at this question. One is that when two States declare a war-and I may assume for the purpose of this argument, because I cannot do more than place evidence before this Court for its acceptance, that the condition in which the new Indian State found itself, it was in a position to declare war – and having declared war, in so far as any acts in the prosecution of that war are concerned, they are outside the pale of municipal law. I will tell you, Sir, what I mean because I will elaborate this sufficiently

to make myself understood by the Court. Supposing a German during the prosecution of the war had shot two or three or ten Britishers in England and was found in England, the question is, could he be charged with having committed murder. I submit never, for the simple reason that those acts were done during the due proseuction of the war which, unfortunately, in the present world of infirmities the International Law accepts. That is to say, what International Law accepts is that two independent countries or two States, as they are called, may make war on each other, and those who carry out any action in due prosecution of the war (apart from war criminals) is outside the pale of municipal law. Alternatively, if that is not sufficient for this Court (though I submit it should be in view of what I am going to read to you from accepted authorities on International Law) under Section 79 of the Indian Penal Code the acts done in due prosecution of the war were no offences. Section 79 of the Indian Penal Code reads thus:

"Nothing is an offence which is done by any person who is justified by law". And my submission to the Court is that under the term 'law' is covered 'International Law', and for that reason in so far that German –continuing the example which I was giving who was arrested in England was concerned, his defence would be :

"My country, my State, was at war with your State. Under the orders of my State, and in due proseuction of the war, I did the acts which under ordinary normal circumstances might be offences, but which having regard to the circumstances are no offences at all".

Sir, it is unthinkable that any member of any organized army could be charged with an offence merely because he fought one or ten or a million men belonging to an army of the State with which he is at war. It is perfectly obvious to anybody that during the prosecution of the war, the municipal law relating to that country does not apply, except, I quite, agree, when one soldier steals the pocket book of another soldier. That I appreciate. But the question which we have got to bear in mind is the very important distinction. Was that act done in due prosecution of the war which one State declared upon another.

Once you get to that state, it is perfectly obvious that municipal law must and is bound to remain in abeyance. It is impossible to arraign any individual for carrying out as a matter of duty acts which might otherwise be offences – killing a man every day, destroying property every day. In fact it is a very part of the war itself. Therefore the agreement is twofold. The alternatives are either that any act done in due prosecution of war is outside the pale of municipal law – that is why I pointed out to you is the commencement that the charge against these young men before you is not as if they had committed an act of private murder by

reason of some private quarrel. The documents accepted by the prosecution clearly bear out that whatever they did, they did as part of the prosecution of war. Remember that always, because without that the law cannot be appreciated with reference to the facts in issue.

But there is another way of looking at it, if you must. That is whether the exception provided by Section 79 is not equally applicable to the case. My submission to the Court is that whether you accept the one or the other

from those acts being offences at all; because the very language of Section 79 is : "Nothing is an offence which is justified by law". The Section assumes that in private life it might otherwise have been an offence. If you, gentlemen, in the due prosecution of war committed murders, could the civil laws as propounded by the other side be put into action against you, when in all honour you acted in prosecution of your duties as members of an organised army of a State that had declared war? It stands to reason – and it must – that any act done by a member of an organised army fighting under the order of one State against another State between which war exists, is an act entirely outside municipal law. But assuming for the purpose of argument the Court requires some nearer justification. In the eye of the Court in so far as the administration by the Court is concerned, it is fortunate that I am able to find the exception in the Indian Penal Code itself, because the young men are being charged either under Section 121 or Section 302 of the Indian Penal Code and I am relying on Section 79 of the same Code which says in terms that it is not an offence. Supposing war was declared between two States and when peace time returned every individual soldier is called upon to say whether he killed so and so. I am quite sure that as I am addressing men of commonsense, you would laugh at the idea. But then I quite agree that I would have to satisfy you that the new Indian State that declared war was entitled to do it in the sense of international law.

And now I will proceed to quote from books of international law on the question of right to make war. I am reading to you Vol. II of Dick Corbett's Cases of International Law under the heading of "War", 1937 Edition.

"International war is a contest carried on by an armed force either between States or between a State and some community or body which is treated as a State for the purpose of the conduct of hostilities. International war differs from other kinds of war in that it has the effect of setting up a new relation in law both as between the belligerents themselves and as between each of them and the other States. As between the belligerents, the state of war although it departs from normal relations, is nevertheless a State of regulated violence in which the conduct of

hostilities is governed by certain principles and rules which rest part on custom and part on convention, and which are sanctioned in the last resort by the action of international society however uncertain may be their operation".

I next call attention to Wheaton's International Law. I am reading Wheaton's "International Law", 1945 edition. Vol. II, page 98 :

"War in the absence of any international authority competent to suppress effectively international wrongs has always been held legal by international law".

Remember that as a definite proposition that so long as there are two States, if they declare war against each other, there is no justification required for it. And once you have a war, any person being a member of an organised army or one of the warring States, cannot be called upon individually to account for the acts, which in civil matters or normal times if done individually in a private capacity for private motive, be considered to be an offence.

"War, in the absence of any international authority competent to suppress effectively international wrongs, has always been held legal by international law. Even the creation of the League of Nations leaves war in certain cases legal, there is now on record the unanimous Assembly condemnation of aggressive war. War is essentially a struggle between States, involving the application of force. Mere armed occupation, as in the seizure of Strassburg by Louis XIV in 1680-81 or as in that of Corfu by Italy in 1913, is not war unless the State affected declares it so, and similarly, as regards pacific blockade. The States need not necessarily be fully sovereign; in 1876, Serbia and Montenegro warred on Turkey, though vassal States : in 1877, Rumania followed suit. In 1855, Bulgaria warred on Serbia, then fully sovereign, and in the treaty of peace of March 8, 1886, though Turkey as suzerain took part. Bulgaria appeared independently as a party. So the South African Republic warred on the United Kingdom in 1899.

So, the first step in the argument is that the State which declares war is and must be in a position to do it. But once it declares war against any other State, then there can be no question of its propriety, or right. In the particular case before the Court, and notwithstanding their territories which are occupied, I do say that this war at all events was completely a justified war. International law in the question of war is not static. It is law that has grown from time to time with the progress of civilization.

Therefore the question really is, once it comes to war, there is no question of justification. But hitherto at all events now in the global war a great many events have occurred of which international conscience

takes note. I will read out to you two passages, one from Mr. Winston Churchill from the Hansard and another from Mr. Eden. The position now is that international law has reached this stage that if liberty and democracy are to have any meaning all over the world, and not merely just for a part of it, and this is not politics, it is law – any war made for the purpose of liberating oneself from foreign yoke is completely justified by modern international law. And it will be travesty of justice if we were to be told as the result of any decision arrived at here or otherwise, that the Indian may go as soldier and fight for the freedom of England against Germany, for England against Italy, for England against Japan, and yet a stage may not be reached when a free Indian State may not wish to free itself from any country, including England itself. We maintain that this particular war, according to the decisions, requires no justification. If one State can declare war, then the other State can also declare war and fight, and anything done in its due prosecution has no civil consequences of any kind. In other words, not one of these men now charged before you can be called upon to account for his actions. We can show that they have done nothing outside the scope of the due prosecution of war on a civilized basis. That is an emphasis which I always wish to put. It is not alleged against these men that there was any question about the acts with which they are charged. They were acts carried out in due prosecution of the war, under what you may call civilised rules. Therefore the question before the Court is a very narrow one.

To continue what I was reading :

"A civil war between different members of the same society is, what Grotius calls, a mixed war. It is according to him public on the side of the established Government and private on the part of people resisting its authority. The general usage of nations is as regards such a war as entitling both the contending parties to all the rights of war as against each other and even as respects neutral nations. It seems to be now settled that it is unnecessary in order to constitute war that both parties should be acknowledged as independent nations or sovereign States."

There was at one time the old idea that you had to be an independent State or a sovereign State in order to be able to declare war. Of course that created a vicious circle, that a subject race will remain in perpetuity a subject race. It can never make a legitimate war for the purpose of liberating itself. Hence modern international law has now recognised the right of subject races which are not for the time being or at the moment independent, to be so organized, and if they are organised and fight an organized war through an organised army, the individual members of that army are unanswerable before any municipal court for what was done in due prosecution of that war.

It seems to be now settled that it is unnecessary in order to constitute a war that both parties should be acknowledged as independent nations or sovereign States. A war may certainly exist between a State and its suzerain as in the Boor War. May I appeal to this Court and all of you who are familiar with British history – what about Charles I and his death? What about the Magna Charta? What about James II? It is all recorded in history. In other words, you do reach a stage where the organisation, call it rebel if you like, call it insurgent; – insurgents or rebels may reach a stage of organisation for the purpose of liberating themselves when what they do after declaring war is subject to the laws of war.

"A war may certainly exist between a State and a suzerain as in the Boer War. Moreover, a war may exist where one of the belligerents claims sovereign rights as against the other, whether in a federal or a unitary State".

But it is quite an unnecessary requisite. If ever a subject race finds itself in a position where its organisation is able to declare war, then acts done by the armies on either side come under this. I put a very simple question : What about the acts of those who fought on the side of the British in this War? They killed lots of people. Would they be put up before this Court under Section 302? Most amazing! It was a properly fought war, no doubt as in other wars one or the other side lost, and the fact that a war is lost has no effect on the immunity from the consequences in acts done in due prosecution of the war.

He says further :

"Whether the struggle is a war or not is to be determined, not from the relation of the combatants to each other, but from the mode in which it is carried on. The Government of the State may recognize its subjects as belligerents, in which case other States will normally but need not follow the same course. Or other States may recognise belligerency, in which case the parent State will all but certainly follow suit".

That is the crux of the matter. I quite agree that if ten persons in a village declare war on Britain, they are rebels, and I am not here to justify it. What I am saying is this : in a struggle between two organizations a stage must be reached where the organisation of the State and the organisation of the army are such that it is a war recognised by civilised nations; and if it is once recognised, then the immunity follows. As the books point out, we had the instance of the war between the South and the North of America and you have a declaration from Abraham Lincoln downwards that it was a proper war and there was nothing more to be said about it as soon as the hostilities ceased. It goes on to say :

"Among the tests are the existence of a de facto political organisation of the insurgents sufficient in character, population and resources to

constitute it, if left to itself, a State among nations capable of discharging the duties of a State; the actual employment of military forces on each side acting in accordance with the rules and customs of war. If all these elements exist, the condition of things is undoubtedly war; and it may be war before they are all ripened into activity".

Therefore what I wish to say is this : that the test by which you will judge this case is, have we or have we not proved the existence of a defacto political organization of insurgents? I do not deny that they were insurgents. Apart from the other question to which I shall come presently, I will assume against myself that the people who declared war and who declared the Provisional Government of Free India were a set of insurgents, a set or rebels – I will assume that against myself.

"As President Grant said in his message of June 13, 1870 : "The question of belligerency is one of fact not to be decided by sympathies for or prejudices against either party. The relations between the parent State and insurgents must amount, in fact, to war in the sense of international law",

I call upon you to do the same. It is not a question of prejudice; it is not a question of prestige or what happens to the army, to this or the other person. Please remember that you are here as judges; you are not politicians, I agree, and I do not want you to be such. If you find that there is a de facto political organization sufficient in numbers, sufficient in character and sufficient in resources to constitute itself capable of declaring and making war with an organised army, your verdict must be in favour of these men – no more and no less than the verdict on your own men for killing others, of which act you are justly proud.

That is the position in law.

Then I wish to call attention to another book on International Law – an accepted book and what is more it is borne out by all the earlier cases in which war was waged by what you may call insurgents against their own sovereign, if you must use that expression. This book is by Lawrence – page 309. The whole question before the Court under this particular head is whether or not there was a properly declared war in prosecution of which the accused before you did the acts which they did. And if they did that in due prosecution of that war, then there can be no question of any civil offence, as I think all of you in your own person will easily realise. I am not obliged in my civil life to kill anybody except on pain of conviction, but you are.

Lawrence says :

"War may be defined as a contest carried on by public force between States, or between States and communities having with regard to the contest the rights of States; the parties to it having the intention of ending

peaceful relations, and substituting for them those of hostility with all the legal incidents thereof".

These were no private acts done with a private motive or done for private individual benefit. They came to be done by them as members of an organised army, having declared war and the law says to them that no such consequences as the government demands can arise. Lawrence goes on :

"It is true that two States are said to be at war as soon as one of them has received a declaration of war from the other."

Here there was in fact a formal declaration of war. Then I call attention to a well-known work of Oppenheim on International Law. Oppenheim was Professor of International Law at Cambridge University. He says this (Vol. II page 166) :

"War is a contention between two or more armed States through their armed forces for the purpose of overpowering each other. War is a fact recognised, and with regard to many points, regulated but not established by International Law".

Once you get to the stage of war, naturally it is the primary purpose of each party to overpower the other. Therefore in due prosecution of it, acts which might be called offences under civil law are not offences : the very purpose is to destroy men and property : the very thing which would otherwise be unlawful becomes right, becomes patriotic, becomes a duty.

"In any case it is universally recognised that war is a contention, i.e. a violent struggle through the application of armed force.

To be war, the contention must be between States...On the other hand, to an armed contention between a suzerain and its vassal State the character of war ought not to be denied, for both parties are States, although the action of the vassal may, from the standpoint of constitutional law, be rebellion." (Para. 50)

I have already said that States are those which have the right to make war *like* States.

The first proposition for which I stand before this Court is this, that the two States sufficient in number, in organisation and in resources may make war against each other, that is the proposition to which I stand, and if they made war against each other, then there is complete immunity for what might otherwise be a private offence. That must necessarily follow from the acceptance of war as a necessary evil in this infirm world, and no individual member can be called upon to answer for the consequences of his acts so long as it is a properly declared war. I shall call the Court's attention to Mr. Hyde's book on 'International Law,' Vol. III, page 1792, para. 648.

"So soon as a man is armed by a sovereign government and takes the soldier's oath of fidelity, he is a belligerent; his killing wounding or

other war-like acts are not individual crimes or offences. No belligerent has a right to declare that enemies of a certain class, colour or condition, when properly organised as soliders, will not be treated by him as public enemies".

In other words the position is simple. Any act done by members of an armed force against any opponent, which in ordinary times in a personal case would be a civil offence, ceases to be an offence altogether. Otherwise, war and recognition is not a possibility.

There is a very important decision of the Federal Court of the United States expressing the same thing. I may be pardoned for multiplying authorities, but I do so because I feel that instead of paraphrasing the idea myself, if I do it through the medium of an accepted authority, I might be able to carry better conviction. It is Vol. 168 United States Reports, page 250. It is the case of Underhill v. Hernandez. I am reading the judgement of Chief Justice Fuller. The opinion of the Court is as follows:

"Nor can the principle be confined to lawful or recognised Governments or to cases where redress can manifestly be had through public channels. The immunity of individuals from suits brought in foreign tribunals for acts done within their own States in the exercise of Governmental authority, whether as civil officers or as military commanders must necessarily extend to the agents of governments ruling by paramount force as a matter of fact. Where a civil war prevails, that is, where the people of a country are divided into two hostile parties, who take up arms and oppose one another by military force, generally speaking, foreign nations do not assume to judge of the merits of the quarrel. If the party seeking to dislodge the existing government succeeds, and the independence of the Government it has set up is recognised, then the acts of such government from the commencement of its existence are regarded as those of an independent nation. If the political revolt fails of success, still if actual war has been waged, acts of legitimate warfare cannot be made the basis of individual liability".

Chief Justice Fuller was deciding the case arising out of the war between the North and the South. A war might exist between what you might call an existing State and insurgents, and yet the insurgents as they were called by the Federal Government, may have such organisation,force and strength that the relation between the two parties is one of the existence of war. Once the war exists, what is the legal position? If the party seeking to dislodge the existing Government suceeds, it is now accepted law that a successful rebellion is a Government established by law. The question is — what is the position in case of an unsuccessful rebellion. The law is, I submit, that if the stage is reached where the rebels or insurgents are sufficiently organised and are sufficiently resourceful to make war, then it

is entitled to be regarded as war, and there will be no individual consequences to persons who take part in it. If actual war has been waged, and my learned friend himself was at pains to prove that a regular war was being waged, and he put forward document after document to prove it, then the question is: What is the distinction between a private individual waging war on his own and his waging war as a member of a force or organized State. That is the real distinction which makes one immune from the consequences. If actual war has been waged, then acts of legitimate warfare cannot be made the basis of individual liability.

There is another case belonging to the same period. It is Ford U.Surget, 97 United States, page 594, (equal to 24 Law F.D.).

"The Confederate Government can be regarded by the Courts in no other light than as simply the military representative of the insurrection against the military authority of the United States.

"To the Confederate Army was however conceded, in the interest of humanity and to prevent the cruelties of reprisals and retaliation, such belligerent rights as belonged, under the laws of nations, to the armies of independent Governments engaged in war against each other; that concession placing the soldiers and officers of the rebel army, as to all matters directly connected with the mode of prosecuting the war on the footing of those engaged in lawful war and exempting them from liability for acts of legitimate warfare".

The first proposition is this that in view of the fact that a state of war existed between the Provisional Government of Azad Hind and the British, any act done in prosecution of that war has not the consequences which the Crown claims or might have claimed in the case of a private individual.

In International Law it is permissible for these who are subject to a foreign authority to organize themselves, and having reached that stage of organisaion and having an organized army to fight for liberation, whether it is succçessful or not, during the process while the war is being carried on, there is immunity, so far as individual members of the organized army are concerned for all acts done in due prosecution of war on a civilized basis (other than war crimes like those which are the subject of trial now in different parts of the world). That being so, my submission is that the accused men before you are entitled to be declared innocent in that there is no civil or criminal responsibility for those acts. In terms of the language of the books on law, the liability is one the State under whose direction they fought, and such liability in international law on the cessation of hostilities does not exist. Of course if a rebellion is successful, then it becomes a new Government, and there is the end of it and there will be no tribunals, but it is only in a case in which it is not

successful that the question arises and the answer is given in my clients' favour by International Law.

The next point to which I wish to advert is the alternative point which I made under Section 79 of the Indian Penal Code. The issue which arises, apart from the Indian Penal Code, is an issue of great international importance.It has arisen, if I may say so, in its actual form for the first time though the authorities directily or indirectly support the principles on which my contention is based.At the same time, appearing before this Tribunal, it becomes my duty to justify it on what I may call a narrower ground to the extent to which it is necessary, for I do feel that before a Tribunal constituted as this is, it is equally important that I should put myself within the narrow sphere of the Indian Statute itself. Then I submit, assuming my submissions are correct and accepted, that the hands of the Tribunal are fairly strengthened. The words which I referred to in Section 79 of the Indian Penal Code are 'Justified by law'. The question is what is the meaning of the word 'law' appearing in Section 79 of the Indian Penal Code. If I can satisfy this Court that the law there comprehends and includes international law, I submit my Honourable Friend on the otherside would have hardly any case to present to Court at all. If the word 'law' in Section 79 includes international Law so far as the immunity which I have described before is concerned, then I submit the three men at your bar are entitled to plead they were so justified in the actions which in ordinary private personal life might have been offences under the Indian Penal Code. I wish to call your attention to a certain number of authorities on the question. The first authority to which I call your attention is Blackstone's Commentaries in Book IV, but it is volume II in this binding. It is accepted at all event by British lawyers that Blackstone's Commentaries are the fountain-sources of Common Law of England and it is a matter which I wish to particularly assert before this Court.The page that I am reading is 2237 (Vol II, edited by W.C. Jones). Most of us who are not lawyers are familiar with Blackstone's Commentaries and know that he is father, to a very large extent, of Common Law. Blackstone's Commentaries are relied upon in British Courts as a very authoritative exposition of the law on the particular question which he has dealt with.

"In arbitrary States this law, wherever it contradicts or is not provided for by the muncipal law of the country, is enforced by power; but since in England no royal power can introduce a new law, or suspend the execution of the old, therefore the law of nations (wherever any question arises which is properly the object of its jurisdiction) is here adopted in its full extent by the common law, and is held to be a part of the law of the land".

So that, as soon as the Court has ascertained what is the international law on a particular poiht before the Court, it is the bound duty of the Court to administer that part of International Law as a part of the law of the land and hence it is that I am submitting to the Court that the word 'law' in section 79 should be given that extensive meaning which the law has by the Common Law of England.

The next work on which I rely for the purpose of the meaning of the word 'law', meaning thereby that 'nothing is an offence which is justified by law', is Openheim's International Law. The question is what is law, and it is in support of that I am submitting next Oppenheim's International Law, Vol. I fiftieth Edition, page 36, article 21a:

"In view of this wide divergence of the doctrine it is necessary to inquire into the actual legal position in the principal countries in the matter of International Law and Municipal Law.

(1) As regards Great Britain, the following points must be noted.

(a) All such rules of customary International Law as are either universally recognised or have at any rate received the assent of this country are per se part of the law of the land. To that extent there is still valid in England the Common Law doctrine, to which Blackstone gave expression in a striking passage, that the Law of Nations is part of the law of the land. It has repeatedly been acted upon by Courts. Apart from isolated obitar dicta it has never been denied by judges. The unshaken continuity of its observance suffered a reverse as the result of the dicta of some judges in The Franconia Case in 1876, but West Rand Central Gold Mining Co. v. The King decided in 1905, must be regarded as a reaffirmation of the classical doctrine".

So that ever since the time of Blackstone, until the last edition of Oppenheim, which belongs to the year 1937. there has never been any question that on any issue in which the doctrine of international law is accepted to be the international law it becomes a part of the law of the land, law of the land in England, and law of the land here.

Next, I call attention to the work of an American Jurist Hershey on International Public Law and Organisation page 14, 1927 Edition.

"International Law is a part of our law, and must be ascertained and admitted by the Court of Justice of appropriate jurisdiction as often as questions of right depending upon it are duly presented for their determination. For this purpose, where there is no treaty and no controlling executive or legislative act or judicial decision, resort must be had to the custom and usages of civilized nations, and, as evidence of these, to the works of jurists and commentators who, by years of labour, research, and experience, have made themselves peculiarly well-acquainted with the subjects of which they treat. Such works are resorted to by judicial

tribunals, not for the speculations of their authors concerning what the law ought to be, but for trustworthy evidence of what the law really is".

So, you will see from this quotation which has come from Justice Gray in the case which is cited-195 United States Reports, page 113 and page 163, that it has been accepted that while administering justice it is your bounden duty to find out, recognise and apply the principles of international law where a person at your bar seeks justice on the ground that the act with which he is charged is an act justified by law and that for the purpose of ascertaining it you may have resort as it is stated by the learned judge himself to "the usages and customs of civilized nations, and as evidence to this to the work of jurists, commentators, who by years of labours, research and experience have made themselves peculiarly well-acquainted with the subject of which they treat

Therefore I plead that when the time comes for your deliberation you will carefully, of which I have no doubt, and diligently, of which I am perfectly conscious study and apply your mind to the citations which I have already given and which I am about to give. Because, according to the well-accepted canons the commentators who by years of labour, research and experience have made themselves peculiarly well-acquainted with the subjects of which they treat, and such works are resorted to and have to be resorted to by judicial tribunals. I have got, Sirs, the original judgment from which this quotation is given. The judgment is reported in 175 United State Reports in the judgments at page 700. The case is Paquet Habana, Appeals from the District Courts of the United States for Southern Districts of Florida. The judgment of Mr. Justice Gray on this question is to be found at page 700. I do not wish to read it again, because I have already read it from the text book in which it is now accepted. At the same time I may be pardoned for pressing this point upon the Court because then the issue before this Court becomes exceedingly narrow. If I am able to persuade this Court, as I submit I hope to do, that in administering the law you are bound to have regard to international law, there will be no difficulty whatever in the way of the defence which I am presenting. Then the Statute law has made it incumbent upon you, and in fact has declared that nothing is an offence which is justified by law. If therefore the acts which are said to be offence are declared not to be offence and if I am able to show that the law so declares them it will be your duty to declare that, notwithstanding apparent confusion of thought, words like treason and so on, will have no value.

The law of treason in India is codified. It is to be found in Chapter VI of the I.P.C.(Offence against the State) in Sec. 121 and following Sections. Therefore let me caution the Court against the general use of words like "treason". The question is whether my clients who have been

charged under Section 121 and 302 have or have not, in doing those acts, been justified by law, i.e. the law of nations, and if they are so justified the law of this country declares that it is not an offence. In other words the law of this country recognises that there may be acts which if done in private are not an offence. A Judge is not liable as an abetter of murder because he orders a man to be hung, because he is justified by law. Similarly and equally, if not more emphatically, the member of an armed force having declared war, if during the state of that war he has committed acts which in private life might be offences, the law says nothing shall be an offence.Therefore I do wish in so far as in me lies, to press this point upon your attention, because the first line of argument which I submitted to the court stands, and I submit to the Court that is the law. In order words the law is that in the prosecution of war the acts which take place are beyond municipal law. But assuming for the purpose of argument, I have to take my stand on a narrow ground. Then the law of this country, the Indian Statute Law itself enjoins upon you that if I can show justification by means of international law for those acts, then my clients are entitled to a verdict in their favour. I say this to you in the language of one of your greatest poets that if in so far as God grants me the tongue of persuasion and you ears of hearing, I have not the least doubt that even you have considered the cases before you, you will have no difficulty or hesitation to decide in my favour on that narrow ground.

The next point to which I wish to call attention is Moore's International Law and Digest page 2, Vol. I, and this is how it is stated :

"It is thus apparent that from the beginning the scene in question denoted something more that the positive legislation of independent States and the term international law which has in recent times so generally superseded the earlier titles served to emphasize this fact. It denotes a body of obligations which is in a sense independent of and superior to such legislation. The Government of the United states has on various occasions announced the principle that international law as a system is binding upon nations, not merely as something with, which they may be tacitly assumed to agree but also as a fundamental condition for their admission to the full and equal participation in the intercourse of civilised nations".

I therefore cannot more emphatically assert that the ground on which I appear before the Court and I have no doubt that it will rise superior (in the language of one of the cases that I read) to all question of prejudices and come to the right conclusion in considering Section 79 and the immunity granted by it.

Just one more passage to which I wish to call attention. It is the judgement of the Privy Council on the question. The last under these

heads is a judgment of Their Lordships of the Privy Council, reported in a recent number, 1939 appeal cases page 168. There a question of international law arose. The name of the case is Chang Chi Chu. It was a case of murder committed on a Chinese Ship and that is how the question arose of the liability of the prisoner to be tried. And the question arose to what extent in international law it was necessary to consider whether the prisoner was liable. The contention shortly stated was that the Chinese ship was so much floating Chinese territory. That was the claim made under the international law. Their Lordships of the Privy Council held that under international law. Their Lordships of the Privy Council held that under international law it is probably not correct to say that a floating ship of foreign power is so much, what you may call, island foreign territory. But they have ruled by reason of the respect accorded to comity of nations, that anything that occurs on a foreign ship is not within the authority or jurisdiction of municipal law. In this particular case what they held was that inasmuch as the ship itself accepted the authority of the power which was exercising authority in those waters, they held it became an exception. But in considering the applicability of international law to the question whether or not the Court had jurisdiction to try this particular Chinaman, the question arose to what extent international law has to be considered and the judgement of Their Lordships delivered by Lord Aitkins is very important from this point of view. I would not enter into the question of details which arose in this case though by themselves they are interesting enough. But I may say this that the observations which I propose to read are necessary and essential because the whole defence to the charge of murder, and the want of jurisdiction of the Court, were based on the ground that under international law the Court had no jurisdiction and for the purpose the Court went into the question of what was the appropriate international law on the question. Their Lordships said with reference to the necessity of the application, or rather with reference to the obligation to ascertain and apply international law ourselves was a part of the law. That is how that part of the case is stated.

Page 167 : "Their Lordships entertain no doubt that the law is the correct conclusion namely, that a ship is not so much floating part of a foreign territory, but that immunity is granted for whatever happens in that ship in so far as jurisdiction is concerned. It more accurately and logically represents the agreement of nations which constitute international law, and alone is consistent with the paramount necessity expressed in general terms for each nation to protect itself from internal disorder by trying and punishing offenders within its boundaries".

It must always be remembered that in so far as, at any rate, the courts

of this country are concerned, international law has validity in so far its principles are accepted and adopted by domestic law. There is no external power that imposes its rules upon our code of substantive law or procedure. The Court acknowledge the existence of a body of rules which nations accept among themselves. On any judicial issue they seek to ascertain what the relevant rule is, and having found it, they will treat it as incorporated into the domestic law so far as it is not inconsistent with the rules enacted by any Statute or finally declared by their tribunals. What then are the immunities of public ships of other nations accepted by our courts and on what principle? I say that in this particular case not only there is no Statute to the contrary, but in fact the Statute imposes that obligation, coming back to the action of Section 79 viz., nothing is an offence which is justified by law. Therefore what you have got to do, Sirs, is to ascertain the relevant body of international law, and having done so, apply it to what is described as domestic law. Therefore, there can be no reasonable doubt that in the construction and application of Section 79 the submission which I have already made on the immunity of individual members of an armed force fighting in a war properly declared, that immunity is a part of international law and therefore is a part of national law. And I submit that your own experience whenever emergencies of war have arisen should bear ample testimony to that position. Each time a soldier fights under the orders of a state in a war properly declared, if he were to consider what would be his liabilities, I am afraid the efficiency of war should be a very difficult process indeed. It is an assumed part of the law of nationals that once you become a member of a fighting force of a properly qualified State entitled to make a war, there is an end of all individual liability for the acts which if they were private acts for a private purpose might be an offence within the law. Though according to my submission the first is an essentially correct ground, in any case the justification by law is a sure ground on which I stand before this Court. Hence I submit that nothing is an offence which is justified by law, and I therefore say that the acts with which the accused are charged before the Court and justified by law, that is to say by the international law, and therefore, there can be no question of a personal or individual liability.

This question has been considered in a different form or perhaps in different language because I wish to point out to you, as you have seen in the earlier works to which I referred, the law of war is often described as the law of belligerency. I wish to point out to the Court, as I shall presently do, what is the law of belligerency; in other words, who are entitled to be treated as belligerents in the light of international, and what I may call, municipal or domestic law.

For that purpose I wish to call attention to the authorities which clearly show where and how the law of belligerency rests. I again refer you to Oppenheim on International Laws, 1944 edition, Vol. II : he was professor of international law at Cambridge and falls within the description which I gave of men who have by their labour and research and experience and knowledge, contributed to the formulation of international law on many questions. The present question is dealt with in page 200-Article 76A :

"Recognition of belligerents by other States is not as a rule binding upon the State. Notwithstanding such recognition, it is entitled to treat the insurgents as traitors; but the position is controversial with regard to recognition as a belligerent power granted to separate armies which comprise subjects of the enemy who are fighting to free their nationals from this rule and which are responsible to an authority recognised as representing the nation in question".

That really epitomises the whole of the issue–: but the position is controversial with regard to the recognition as a belligerent power granted to separate armies which comprise subjects of the enemy who are fighting to free their nation from this rule and which are responsible to an authority recognised as representing the nation in question".

To translate it according to law, the accused before you were members of an army responsible to the Provisional Government of Free India, fighting to liberate themselves from the rule of the army of those who were fighting against them, and I submit that is precisely the case before us. The author goes on and gives instances of case of that kind, and I want to draw your particular attention to those historical instances which unfortunately have occurred before, so that I stand before you on much more solid ground than if this were perhaps actually the first instance :

"Thus, in the year 1918, during the world war, Great Britain, France, Italy and the United States of America recognised Czeche-Slovaks as co-belligerents. Similar recognition was granted in the year 1917 to the Polish National Army, composed to a substantial degree of the subjects of the enemy powers. It has been maintained that as in the case of insurgents in a civil war (quotations of which I have already given) – the enemy is entitled to disregard such recognition and treat the members of the insurgency army when they fall into his hands, in accordance with the provisions of the criminal law. The better opinion is probably that when such recognition is granted by an adversary to large bodies of men effectively organised on foreign soil in anticipation of independent nationhood, a point is reached at which the belligerents, confronted with disaffection and desertion of a considerable number of

his subjects engaged in hostilities against him, can no longer, without exposing himself to justifiable retaliation, assert the provisions of his own criminal law as the only legally relevant element in the situation."

I want to draw your attention pointedly to the conditions which are here laid down and which, I submit, we have more than amply fulfilled. I ask this Court to declare that is the better opinion, and I do say that we have reached a stage far in advance of the illustration given by Oppenheim. In this case not merely men were effectively organised, but the Prosecution – thank to them for that. They have amply proved that there was a regular army, properly organised army – on foreign soil it is true – but with this added qualification in my favour, that Indians residing in places where the army was organised, numbering not a few hundreds, even a few thousands, but two million men and women and children, through 230,000 adult men and women swearing allegiance to that Provisional Government, for the purpose of liberating their country – which unfortunately failed, but nonetheless the condition required that you may at your peril call to aid the criminal law of the country against such an organisation – effectively organised on foreign soil in anticipation of an independent nationhood. It is true – and that is why I read the Proclamation to this court – I read it with a view to show to you that the object with which on foreign soil and independent government was formed was the liberation of their country : It was undoubtedly in anticipation of independent statehood; and of course if the independent state had been established by the successful prosecution of force, as I said, this tribunal would not have been there to try them. It was because it was done in anticipation, which failed, and which does not detract from the point, that a stage is reached in which a belligerent confronted with the disaffection and desertion of a considerable number of his subjects engaged in hostilities against him, can no longer assert the provisions of his own criminal law as the only legally relevant element in this situation. In other words, the legally relevant element in this situation is that we, meaning the two armies. had reached a stage where, having reached a stage of war – there can be no question at all that under Section 79 we are entitled to the justification which the laws of war give to belligerent armies. And that no acts done during the course of the prosecution of the war are matters of what you may call domestic law, pure and simple; which would be as if any one of these three accused went and did any of these acts out of private motive. Therefore, it is essential to remember that in all these cases the substance of the law is this : two independent States can always make war and the members of their combatant forces are unanswerable for their acts. Only the question arises, or the intermediate stage arises, whether without having reached

the stage of independent statehood (to take the words of Oppenheim) you have attained a stage, and whether having founded a state for the purpose of liberating your own country, you are so organised, both the state and the army, that it assumes the proportions of a state and as a result of the war-as much a war between two independent states. I am pleading before you that we have proved before this court, and the documents which otherwise we would not have had the benefit of and have generously been produced by the prosecution all of them distinctly and clearly showed that we had reached that stage and this court would not only be justified, but, I submit, bound in law and in conscience to regard the accused as belonging to that organisation, and as members of such a belligerent army they are entitled to all the privileges of the laws of war. In other words, immunity for personal acts carried out in due prosecution of the war, as you yourself in your own person would claim.

The next book to which I would call attention is the British Year Book of International Law, 1937, page 18. It says :

"What we call belligerent recognition is not so much recognition even temporary and provisional, of a new government, as the recognition of the existence of a war".

I may explain what is meant here, because the recognition comes at a stage when it has not yet succeeded in establishing its own government. Of course, if for instance perchance this very army had succeeded in its aim, as the maxim of international law is, the successful revolution is the government established by law. But earlier than that there is the stage at which it is in a state of war and that is all that is necessary for the purposes of my case. If I can establish that they were making war, which is regarded as a stage of belligerency by international law, they are entitled to the same privileges and immunities as would be accorded to the armies of two independent nations. It continues :

"The existence of war is purely a question of fact; but if we recognise the fact that a war is being carried on, then the recognition of the insurgent government follows as a necessary consequence. Wars can only be carried on by governments, and there must be at least two parties to every war. Much of the confusion which obscures the current discussion of the Spanish problem arises from the failure to observe this correct logical consequence. The true doctrine is that recognition of the insurgent government is the necessary and logical consequence of recognising the fact of war".

Therefore I submit that once you recognise, as I submit this court is bound to do on the evidence before it, that there was a regular properly declared and properly prosecuted war, then I submit there can be no question that the acts of these men, done in due prosecution of that war, are completely justified by international law and therefore by law.

The instances are given in the Year Book of International law. This is what it says :

"Lest this should seem to be merely doctrinaire, that is the kind of criticism with which we people are sometimes apt to run away, – and theoretical opinion, I shall try to fortify my doctrine by authority. In 1828 Don Miguel, the Pretender to the throne of Portugal, was carrying on war by sea and land against his niece and nominal fiancee the child-Queen Donna Maria, who was recognised by Great Britain and other powers as the ligitimate Sovereign of Portugal. At no time during the struggle was Don Miguel ever recognised by Great Britain under any form de jure or de facto. In 1828 he proclaimed naval blockades of Oporto and of the Azores. This blockades were notified to the British Government which published the notices in the London Gazette and communicated them to the commitee of Lloyd's. The Kings Advocate Sir Herbert Jenner advised the British Government that the blockades, if effectively maintained, might be recognised as valid, although no form of recognition had at any time been conceded to Don Miguel".

In other words the distinction that is sought to be made is that you may recognise the state of belligerency without necessarily recognising the State.

Refusal to recognise the blockade, so Jenner advised, would be a departure from the neutrality which this country had professed in the civil war. Twenty years later the Palmerston Government, following the advice of Sir John Dodsor – and I hope the Judge Advocate will advise you accordingly – then the Queen's Advocate decided to recognise the blockade of Trieste by the Italian insurgents during the Revolution of 1848, although there had been no other act of recognition of the insurgent Government.

The point I am trying to emphasize is this that you need not necessarily recognise your opponent as a government, and yet during the course of the war, once you recognise that it was a proper state of belligerency, then the immunities and privileges which I described before follow, because the men, and in modern times the women, who are fighting for the insurgent government, are recognised for the purpose of these immunities. It goes on :

"Upon the point which we are now discussing Dodson's opinion is very clear. It is sufficient' he says 'to justify a blockade if duly maintained that a de facto war is carried on by Sardinia and Venice on one side and Austria on the other'."

Even more clear is the opinion of a later Queen's Advocate Sir John Harding when advising the Government in 1860 upon the question raised by Garibaldi's rebellion. This is perhaps nearer in its application. This is the quotation from the opinion of Harding:

"If Her Majesty's Government considers that a civil war actually exists between the dictatorial Government of Southern Italy and that of His Majesty the king of the two Sicilies in which Great Britain is to be strictly neutral and that the dictatorial government has in fact attained (howsoever) an independent and sovereign existence and governs de facto a portion of the Neapolitan dominions, then Her Majesty's Government may without encouraging piracy, so far recognise the acts of this de facto government as to admit the validity of an effective blockade, maintained by a competent naval force acting under its orders, for to acquiesce in the capture and condemnation by it of articles of contraband of war designed for the use of the king of the two Sicilities".

The belligerency which existed was between what you might call the King of Italy and the insurgents, and the advice of Sir John Harding was that if there was a de facto war between the two, then the rights of the belligerents should be accepted and acknowledged. In other words, supposing they took as prize of war ships belonging to what you might call the constituted King of Italy, it would still be a perfectly good prize.

In the course of the same opinion, Harding pointed out that Garibaldi and his officers could not possibly be regarded as pirates, since they were carrying on war in a regular manner and had been dealt with on equal terms by British naval officers. The three opinions which I have just cited are those of British law officers ranging over the period from 1828 to 1860.

Without further multiplying citations, I will therefore summarise their effect by saying that what we recognise in these cases is the existence of war. The recognition of the insurgent government is merely incidental or consequential since a war implies the existence of some independent authority which carries on the war.

The next thing to which I wish to call your attention is the recognition this matter has received from the British Government through the then Foreign Secretary, Mr. Eden. I am reading from the Hansard which is the recognised report of the Debates of the House of Commons. I am reading from the debates of the 14th April 1937, page 1133. This is what I have here .

"The Leader of the Opposition spoke earlier today as though the Government had given something up in this case. Of course, we have not given anything up, because you can never grant belligerent rights to one side only; they must be granted to both sides, if they are granted at all". This issue arose on the question of the Spanish war.

"The Honourable Gentleman remarked that he thought that never in history had there been any question of granting belligerent rights early in a dispute. As a matter of fact, in the American Civil War we did grant belligerent rights within six weeks of the outbreak of the Civil War".

"Mr. Noel Baker said : The Government themselves declared a blockade, which, as all international lawyers will agree, compels them to grant belligerent rights to both sides".

"Mr. Eden : We ourselves made, in point of fact, a declaration of neutrality out of which arose the granting of belligerent rights to both sides. That is what we did in the American Civil War. Of course, that does not stand alone. It is not the only example. The Honourable Gentleman is probably familiar, I think, as I know something of his associations in this respect, with the Greek rebellion against Turkey in 1821-25. At that time also–remember that in each case these were insurgents against their parent State fighting for their liberation, and it was during the course of that struggle that the rights of belligerents were granted by Britain. At that time also, belligerent rights were granted and His Majesty's Government voiced this opinion to which I would draw the attention of the House the character of belligerency was not so much a principle as a fact that a certain degree of force and consistency acquired by any mass of population engaged in war entitled that population to be treated as a belligerent and even if this title were questionable, rendered in the interest well-understood of all civilised nations so to treat them".

The position of British politicians and British law on the question of the recognition of belligerency even as between what I might call the parent State and the rebel States has always been recognition of belligerency.

At that time Canning was the Foreign Secretary of this country and Professor Philips in his History of Europe deals with this very interesting chapter of modern Greek independence. He says :

"Curiously enough as in the affairs of Spain, so now his (Canning's) attitude was frankly based upon the interests of England. The interests of England in his opinion demanded peace. The recognition of the belligerent character of the Greeks was necessitated by the impossibility of treating as pirates a population of a million souls and of bringing within the bounds of civilised war a contest which had been marked at the outset on both sides, by disgusting barbarities.

"Those were both cases in which belligerent rights were granted. A third and perhaps, in a way, even more remarkable case, was the revolt of the Spanish American Colonies against the Spanish Government, from which resulted the establishment of the South American independent Republics as we know them today".

So that you have instances on both sides of the line. You have instances where those who rebelled against a State for their own independence ultimately succeeded, but while they were in a state of war both were recognized as belligerents. Those others in which they did not

succeed but nonetheless during the interval of the struggle, they were both recognized as belligerents.

"A third, and perhaps, in a way, even more remarkable case was the revolt of the Spanish American Colonies against the Spanish Government, from which resulted the establishment of the South American independent Republics as we know them today. In that dispute we recognized the rights of the belligerent colonies."

People were actually revolting against their own Government for their own freedom, and one need not be apologetic in this period of world history to say that the subject race may free itself.

"In that dispute we recognized the rights of the belligerent colonies long before we recognised them in any other way, and, when I heard the Right Hon. Gentleman below the Gangway speaking earlier this afternoon, I bethought me that he might well have remembered the enthusiasm shown by the Liberal Party of that day for those new States across the Atlantic to whom we accorded belligerent rights, though they were rebels against their own mother country".

Sir, I say that I could not quote a stronger authority for your adoption than the action of the British Government as stated authoritatively by the Foreign Secretary of Britain and I would like to read it again in order that I may not miss the point :

"I bethought me that he might well have remembered the enthusiasm shown by the Liberal Party of that day for those new States across the Atlantic to whom we accorded belligerent rights, though they were rebels against their own mother country".

And I say that the same point arises for you. It is true that those who fought were rebels from the point of view of constitutional law as against their own King – and later on I will come to the question of allegiance – it will be my duty to analyse before you what that means, though it is irrelevant to the issue as I shall point out. The very fact that those colonies were fighting against their mother country as it is called, shows that at that time there was what you may call 'legal allegiance', but legal allegiance cannot be a matter of perpetuity because if it becomes a matter of perpetuity no subject race will ever attain freedom. For the moment, the point with which we are concerned is merely freedom. For the moment, the point with which we are concerned is merely this : that while in a state of belligerency Britain recognized the rebels as proper belligerents, those who were fighting against their mother country, and if that belligerency is recognized, I venture to submit it will be far too much to ask this Court to refuse it to this Provisional Government of Free India and the Armies fighting under them. Mr. Eden goes on—because he wanted to make the point that the State will be recognized not only

when it comes into existence, but while still the struggle goes on. Now I read :

"What I wish to deduce from these three examples is that the natural thing, "mark the words —

"..when a struggle has reached the large dimensions of the present war in Spain, would have been to recognise its belligerent character, and for States whose maritime interests are involved, as ours are, to grant belligerent rights to both sides".

In other words, as he put it before, it is essentially a matter of fact. If we find that the struggle,—call it rebellion, call it insurgence, call it what you like,—has reached such proportions that you cannot control it by normal means, then you must recognize that it is a state of war, and once you recognize that it is a state of war, those who fight in pursuance of the declaration of war and in prosecution of it are entitled to all the rights of belligerency. Then he goes on :

"That would have been the natural thing to do. Recognition of belligerency is, of course, quite distinct from recognising anyone to whom you give belligerent rights as being the legitimate Government of the country".

And that is what I want to impress upon you, that if it is asserted on the other side that it is required for the purpose of immunity from all acts done in due prosecution of the war that the Provisional Government should have been recognized by Britain, it is a completely futile argument. In fact, the very hypothesis cannot exist. The hypothesis is this : The rebels as I have called them – I do not mind it – are fighting for their freedom against another country. If they succeed, the Government will be recognized, but, in the meantime, during the course of fighting, the Government won't be recognized, but what is recognised is belligerency. I shall presently point out what it involves, – immunity from all acts done in due prosecution of the war.

"Recognition of belligerency is, of course, quite distinct from recognising anyone to whom you give belligerent rights as being the legitimate Government of the country".

It is a fact that the Provisional Government was not then and did not become the actual Government of India, but that does not matter at all. What are the rights and privileges during the course of the struggle, and if I am right in my submission to the Court, there can be no doubt that during the course of struggle there was only one duty owed by men like the accused before you, and that is to prosecute that war under the orders of the Provisional Government, – and anything that they did by way of prosecuting that war gives them complete immunity.

"It has nothing to do with it. It is a conception simply concerned

with granting belligerent rights which are of convenience to the donor as much as they are to the recipients. I will not go into the reasons, but for a variety of reasons in the present dispute we are not granting belligerent rights".

So that you have here recognition of an adoption of the principle supported by precedents as stated by the Foreign Secretary of that day.

Then there is a quotation from Mr. Churchill's speech during the course of the same discussion to which I wish to call your attention. That is on the 14th of April 1937, page 1068 :

"When I hear my Right Hon. friend opposite speaks of rebels, I must remind him, sitting there as he does in the seat of the Whigs, he is departing from Whig principles. The sacred rights of rebellion was one of their first doctrines. In regard to liberal statesmen, there the Right Hon. Gentleman sits, the successor to Mr. Gladstone, striving to uphold the great principles for which his party stands. But what was Mr. Gladstone's record? He was a strong supporter of rebels. He was a strong supporter of the rebels in the war of American secession. There, we had a civil war in which the rebels were not only rebels but slave owners. Mr. Gladstone went about the country, and in a famous speech either at New Castle or Hull proclaimed that the Confederate States (i.e., the Southern States) had not only founded an army, but that they had founded a navy, they had founded a Government, and more than that, they had founded a nation. (An Hon. Member : "He was a Tory then".) He was not a Tory then. Therefore, before one takes the view that rebels are like mad dogs to be put down and shot at sight, we should remember these things".

In other words, in that debate the Government of the day in England recognized that while a rebellion may or may not be successful, while it has attained a stage of war, you must recognize and give immunity to those people who fight on either side, for what justification is there on the part of one set of them to fight and claim immunity as against the other side? If the I.N.A. shot, I daresay the British Indian Army equally shot from the other side. The justification is equal in both cases in so far as this particular struggle is concerned. Mr. Churchill goes on :

"If we search the history of the 19th century we shall find many cases where the British Government have actually espoused the cause of rebels. The Hon. Member (Mr. Maxton), the leader of the Clydeside party, with his customary candour and frankness, made no bones about supporting rebels. He declared the question was whether or not they were rebelling for the thing you wanted".

I am quite certain that we have proved to the hilt that they were rebelling for a thing they wanted which is fully approved of by any civilised human being. There cannot be two different laws for two

different sets of people. "Everyone will support rebels who are fighting for the things of which they approve and they will criticise the Government which is for the things which they dislike. Therefore do not let us have too much of an attempt to make out that the Government in Spain have all the right on their side and the rebels none".

The Court will appreciate that I am pleading for a very limited right. I am not here before this Court on the question of the recognition or non-recognition of the unfortunate failure of the Provisional Government to obtain the independence of India. That is not the issue. There is a very narrow issue. It is this. While they were fighting and struggling, were they or were they not entitled to the rights of belligerents ?

Mr. Churchill goes on : "Therefore do not let us have too much of an attempt to make out that the Government in Spain have all the right on their side and the rebels none. It is one of the most evenly balanced struggles and one of the most unpleasant and certainly it is the least cause for us to espouse. If we were to take the course which is recommended by the Right Honourable Gentlemen and to break the blockade, if we throw the might of the British Navy into the scale, could he guarantee or could he be sure that we might not provoke that very alignment and crystallisation in Europe along those unnatural and idiotic – perhaps I had better say ideological – lines which it is our whole message and mission to rupture, or least to avoid". So that Sir, even up to the very last war, up to the year 1937, just on the eve of the last war, it is perfectly obvious that a distinction has been maintained, a distinction which I cannot too often insist upon between a state of belligerency which may be recognised and the rights accorded without the ultimate success of those who fought for the cause for which they could fight. They may fail but nonetheless in the interval they are entitled to the rights of belligerency.

Then, Sirs, there is a further point and I tell the Court that it is a question of fact. This Court should find that this Provisional Government had ceded to it the territories which I have described. But while insisting on that finding of fact, because we submit that it was a fact, I wish to point out to you that from the point of view of belligerency it is quite unnecessary that the particular Government for the time being need have any territory in its possession at all, and for that purpose, I wish to give you illustrations in history. Take Belgium in the last war and all the emigre Government residing in London during the last but one war and the last war. What were those emigre Governments? Not an inch of territory which they could call their own at that time and yet who ventures to say before this Court that a member of the Dutch Army or for that matter the Polish or the French or the Yugoslavian Army may not fight

to liberate its own country and not have the right to claim, even if they failed, all the rights and immunities as far as their soldiers are concerned of belligerency. I think, Sirs, the last war has illustrated more than any other that some of these old principles may be overdone and that it is quite unnecessary in order that you may have a state of war, that country that is fighting a war on one side need to necessarily at the time have, what I may call in the common English parlance, a local habitation though it may have a name. Many of these emigre Governments were deprived of their territory and the fact that they were deprived of their territory temporarily, or the fact that the Indians were deprived of their territories for 150 years, makes not the slightest difference to the point that we are submitting to the Court. What we submit to the Court is this. They were all liberating armies, trying to liberate their country and therefore were entitled to the immunities of those who were fighting. The next question before you, Sirs, is this. There is not such thing as the law of limitations in dealing with nations so that if either the Dutch or the French or anybody else was trying to fight for the liberation of their country while having lost their territory to the enemy, can it ever be argued in a British Court that those who were fighting to liberate their country were not fighting a struggle where they were entitled to the rights of belligerents. Supposing any one of them failed, is it to be said in a British Court that they were not fighting a struggle to which all the laws of immunities and privileges of a fighting army exist? I therefore urge upon you not to take the instance that you have before you as any different because we happen to be Indians. Remember that. They were trying to liberate their country. I am not here to espouse the cause of the Provisional Government. I am pleading for men who fought under the orders of their Government for the liberation of their own country. If therefore they were entitled to fight for their own country for the purpose of liberating their country, I am entitled to tell this Court that they are entitled to the privileges of belligerency. One more instance on which there was a certain amount of struggle in proving the facts is the case of the Maquis in France. Remember the facts. At the time when the Maquis were fighting, the de facto and the de jure Governments in France was Marshall Petain's Government and the latter were allied with Germany. The Maquis were fighting in order to release France from their own French Government which was allied with Germany, and what did Eisenhower say ? I am going to read that to you because it is a very short document and it is very important. At that time it was apprehended that the Maquis might be dealt with unjustly by the then French Government, because it was the de jure Government of the time and would shoot as rebels, very much the same as the Advocate-General will later on argue to say about the

persons who took part in the Indian Army. But you have the pronouncement of no less a person as Field Marshal Eisenhower that that shall not be. In other words, if persons with a view to liberate their Government fight against their own Government, they are entitled to the rights of belligerents. That was the reason why I was very anxious that I should be able to prove that statement. Sirs, this is the statement which has been proved and I may incidentally agree to what my learned friend insisted upon that I should put in also the German view of the matter. If he prefers that it is his look-out. I do not. I prefer the American and the British view.

"There is conclusive evidence that the German forces in France are –

(I am obliged to my honourable friend for saying that he does not doubt the authenticity of the source, meaning that it came from General Eisenhower. Of course he insisted that I should put in the second passage and I leave it to you to judge which of the two you should prefer, with the submission that you should prefer Eisenhower to General Keital).

"Now recruiting members of the French resistance group as France Tireurs and today an announcement issued from SHAEF in the name of General Eisenhower makes these four points :

1. That the French forces of the interior constitute a combatant force commanded by General Koeniggaud forming an integral part of the Allied Expeditionary Forces.

2. That the French forces of the interior in the Maquis bear arms openly against the enemy and are instructed to observe the rules of war. They are provided with a distinctive emblem and regarded by General Eisenhower as an Army under his command.

3. Reprisals against resistance groups violate the rules of war by which Germany is bound".

This is what I ask you to do : that anything done against the members of the Indian National Army fighting for their freedom according to the rules of war – I submit that any action taken against them is a breach of international law.

4. "Every effort will be made to trace the authors of any atrocities against members of the forces under General Eisonhower's command. Steps to this end are already being taken".

Then the rest reads :

"General Eisenhower in a declaration broadcast to the B. B. C. tried to legalise the French partisans as a fighting force.."

The question that arose was somewhat delicate from a constitutional point of view, because for the time being the then French Government was still under the thumb of Germany. The people of France for the time being fighting against their Government which was pro-Germany were undoubtedly guilty of fighting against their own Government,

but the ground of immunity accorded was that they were fighting alongside the allies for the purpose of freeing France. What is the distinction, I ask, between those who fought on the side of, even if we say Japan, for the purpose of freeing their own country? With very great respect it is difficult to understand any distinction. In other words, if the Maquis were entitled to all the privileges and immunities of a good fighting force for liberating their own country, I cannot see how you can fail to accord a similar treatment to those standing in the position of the Indian National Army.

Then, I read on :—

"General Eisenhower in a declaration broadcast by the B.B.C. tried to legalise the French partisans as a fighting force. From responsible circles in the Wilhelmstrasse the following statement has been given out:

"This attempt by the Allied High Command is unjustified. French partisans revolt against the legal French Government and violate the French laws, which enforce capital punishment for such violation".

Now you are asked solemnly to adopt what the Germans said in a similar situation. With what face could ever such an argument be presented to a British Court?

"The activities of the French partisans do not constitute regular war conduct."

(Precisely the kind of argument that is likely to be advanced).

"The activities of the partisans do not constitute a regular war conduct but a malicious system of ambush fighting against the occupation power. Thus the partisans have forfeited the right to be treated as regular troops". I submit that the view put forward by General Eisenhower is the more correct of the two. But the other view clearly shows what I have to establish before you in order to claim immunity, namely, that it is a regular organised army, fighting according to the laws of war, and not guilty of any personal atrocity beyond and outside merely fighting a regular war, and it is fortunate in this case, the first test of its kind, because the issue is neat. There is not even a charge of any personal atrocity. My submission to the Court is that the British, and I mean no empty compliment, civilised instinct has recognised that if a struggle for freedom is waged, then if it reaches a stage at which there is an organised Government and an organised army, it must be accorded all the rights, privileges and immunities of a fighting army, and that is what I plead for.

The question which arises under Section 79 of the Indian Penal Code is that by all rules of civilised warfare what you claim for yourself you must accord to your opponents, even though you may have succeeded in defeating them. You are entitled to come to your own conclusion on

the merits of the controversy at issue before you. But the Government says this :

"The policy of the Government of India is, however, that only those cases will be brought to trial where there are serious charges, apart from that of waging war against the King".

As I said, it is not law and in no manner binds you, I must frankly confess that much, because it must not be said that I was trying to take refuge behind any executive statements. But the fact remains that behind that statement is almost a reluctant admission that waging war is in this case not an offence, or at least seriously treated as an offence. That is perfectly obvious, not because waging war per so is not an offence, but because in the circumstances of the case, where, with an organised government and an organised army, a war was carried on, then waging that kind of war is not an offence. I am not denying that if ten individuals in India collected arms and began to fight the Government of India, waging war is not or would not be an offence. But what is meant is that waging war, meaning the prosecution of war in the circumstances of the case, namely, of the Indian National Army under the Provisional Government, – that is not an offence. But it is a matter which I want to be judged entirely on the merits of the legal and factual submissions which I have made.

The next issue which really, I submit, does not arise, but inasmuch as I have only one address before this Court I must try and anticipate things and answer them, – sometimes it is unjust to one's self, because one may raise more things than the opponent is likely to think of and I may make a present of an argument to him – but having regard to the rules of this Court, I am obliged to resort to that course – it cannot be helped; otherwise I should have preferred to have a short reply to any new point which may be raised by my learned friend on the other side. The short way to deal with the issue is this : the cases which I have cited and the authoritative works which I have quoted to the Court, clearly show that in judging this case, no question of allegiance arises. All insurgents, while they are fighting, are still held by allegiance, and all the books which I have read will be worth nothing if the question of allegiance had been raised, —because until you successfully throw if off, the prima facie allegiance, if I may so call it, exists; and nonetheless while it is not successfully thrown off, while it is in that ambulatory stage, the rights of fighting and the rights of war, if it is a properly declared war and a properly conducted war (I will not repeat that qualification again, you will assume it from me that when I talk of the rights of war I am talking of a properly declared war and a properly prosecuted war as to which I have made my submission) —in such a case ex hypothec the

allegiance exists. The rebels want to throw off the foreign yoke, and the result is that undoubtedly if the question of allegiance arose or had ever arisen. no grant of immunity to insurgents fighting for liberty against the parent State would have ever arisen; but the fact remains that notwithstanding the fact of allegiance remaining, the right and freedom to liberate their own country being recognised at the same time, it is given effect to by recognising belligerency; that is to say, when an organised force is fighting under an organised government for its own freedom, while they have not completely succeeded and token allegiance remains, they are still entitled to fight. That is recognised by the law of nations. But should such a question ever be raised by my learned friend – which I submit is irrelevant – I have important submissions to make. First, that on the events which took place at Farrar Park on 17th February, there was no allegiance left and hence it is very important that I try to concentrate my attention on what occurred at that meeting.

The fact, which probably may remain unnoticed, but which was most important, was that the British officers and British other ranks were separated from Indian officers and Indian ranks. It is an extremely important fact to remember, in order to be able to appreciate the events and the occurrences of that day. They having been separated, the Indian officers and ranks, numbering anything between 30,000 to 45,000, were all asked to assemble at Farrar Park – Colonel Hunt made a short statement or speech, saying that he was handing them over on behalf of the British Government to the representative of the Japanese Government, Colonel Fujiwara. Colonel Fujiwara then made a speech in Japanese which, as the evidence now shows, was translated both in English and in Hindustani; and the statement of Col. Fujiwara amounted to this — using my own language — that those of the Indian prisoners of war who wanted to join an army for the purpose of liberation of their own country were free to do so, and handed over to Captain Mohan Singh. Captain Mohan Singh then addressed them saying that he was prepared to organise the Indian National Army for the purpose of fighting for the liberation of India; and we had the evidence-uncontradicted-that he was acclaimed by the whole of the Indian prisoners of war present. I wish even at the risk of repetition to submit that when an insurgent fights against the then constituted government to free his own people and his own country from the alien, the question of allegiance does not arise, I want in that connection to take the statement of Captain Arshad – it is a most emphatic statement he made.

"We believed that the only allegiance we owe is allegiance to our country". I cannot describe better than in his words the result of that day's proceedings.

That brings me up to a somewhat difficult subject like the case of any subject people, in particular India. All of you are aware that every charges of treason in England is a charge of working against the King and the country. The last one is the reported case of John Amery. In the situation in which an Indian finds himself, the question is under what circumstances and to what extent this question of allegiance can be raised at all, because once you divide the King from the country, it becomes a very difficult issue altogether for any human being to decide, and hence I would prefer to rest my argument on the occurrences of 17th February. The position of an Indian in a case of this kind is difficult and I am going to submit to the Court on first principles what its true solution is. Where the King and the country coincide there is no question of an alternative. If you fight against the King and also fight against the interest of your own country, the question does not arise, but the question does arise where there is a fight for freedom, and I propose to read passages to show to what extent the world has progressed in the matter of the recognition of human rights. When you are nominally fighting against the King but really fighting to liberate the country, then the point is whether the question of allegiance can arise at all. Unless you sell your own soul, how can you ever say that when you are fighting to liberate your own country, there is some other allegiance which prevents you from so doing. That means that if that happens there is nothing but permanent slavery.

Therefore it is that in the circumstances of this case a choice was presented by the force of circumstances to those prisoners of war who were surrendered by Britain – I do not say wrongly-because there are reverses in the fortunes of war. Who am I to say whether it is rightly or wrongly done? At the same time you cannot disregard this most important fact that for the time being by reason of the exigencis of the war Britain found itself unable to give any protection to her soldiers to fight for the country and that being so, they found themselves in a very unenviable position. My learned friend may say : 'you ought to have remained prisoners of war, and he may argue that they may do anything under the circumstances short of making war. I concede that proposition where allegiance to the King and country coincide, but where the two do not coincide, a different situation arises altogether. My learned friend may say that they were fighting on behalf of puppet Government or they allowed themselves to be used as stooges of the Japanese. Even accepting this somewhat unenviable expression of stooges or otherwise, the question is one of fact, namely whether or not it was a regular army honestly believing that it is fighting for the freedom of its country. The question of a bad name that may be given has really no relevancy to the legal issue but inasmuch as a great deal of dirt has been thrown by expressions of

this character-puppet Government and puppet army and words to that effect-and the question of the strength of that army may be raised, it is my duty to tell the Court how the evidence stands on record. The evidence that stands on record is that the No. I, I.N.A. was formed and was dissolved in December. I shall forget that for the purposes of this case, because waging war which is the subject of the argument applies to what you might call I.N.A. No. 2, I have attempted to prove that I have established that the I.N.A., though small in numbers, was fighting as allies of the Japanese Army and there is no ignominy in admitting that or in doing that, because the objectives at that time of both the armies was undoubtedly to free India from Britain. The objective was no more and no less than that of the allies in fighting to free France or Belgium or any other country, and if in that process there was unified command or a single strategy, you, Sirs, will not say with your knowledge of military affairs that makes one army the stooge of the other. It is a phrase with which my learned friend will not be able to walk away if he uses it, and that is why I want to tie his legs, if I can. If the British and the American armies fought under the command of General Eisenhower, Britain may not be called the stooge of the Americans, and I hope my learned friend will not descend to the level of calling the I. N. A. stooges of the Japanese. The evidence given by Lt. Nag is very important from this point of view. He was extremely prolific in the result and he came to prove at the instance of the Prosecution that there was a very organised army, and that a big war was fought. My submission is that he was hoisted with his own petard. If he proved that a regular war was fought that is precisely my defence. He was qualified to speak about it. He was legal adviser of the I.N.A. and he told this Court in effect–I am quoting his words-that the two armies fought as Allies. Whether the alliance was right or wrong is not before this Court. The only thing that is before this Court is whether or not this army fought as an organised army. My learned friend will not be able to support any allegation that they fought for any other objective except the liberation of India. If an allegation of that kind is made, it is a false allegation, and we have given a complete lie to it. The prosecution witnesses from beginning to end admitted that the object of the I.N.A. was to fight for the liberation of India, and everyone, whether volunteer or non-volunteer, willing or unwilling, has admitted that they had no other objective except the liberation of their own country. That being so, my submission to the Court is that in so far as any allegation is made to the contrary it is only put forward as a point of prejudice, and I had to meet it with a view to remove the prejudice, because as I said it is not in human hands to choose your allies under the circumstances which may be forced upon you. And whether you fight

with the aid of X, Y or Z for the purpose of liberation of your own country, the fact that Y was otherwise a bad person has got nothing to do with the case. But in all human discussions there is always an argument at a tangent; many human minds confuse the issue, and hence it is that I have attempted to cross-examine, at all events in the briefest possible way, to make this point clear. The point that I tried to bring out was that the I.N.A. was, though small, a very organised army, inspired by the best of motives, and fought for that purpose, though unsuccessful for the time being.

There is one other thing which I ought to have mentioned and I regret I omitted it while I was talking on the first issue. That was with reference to the Minister sent by Japan to the Government of Azad Hind. I ought to have stated earlier, because the points which I have mentioned were proclamation, recognition, declaration of war, followed by possession of territory, and also the Minister of the Nippon Government accredited to this Government. The last is not essential, but still in point of fact it was alleged, and I will state how the facts stand under that head. The fact is that a Minister was sent in fact. No less a person that Mr. Sawada of the Foreign Office told the Court that it was decided to send a Minister to the Provisional Government of Azad Hind, while he was the Vice-Foreign Minister and he was competent to speak about their decision that a Minister in fact was sent. As it happened he came without letters of credit or his credentials, and as if it mattered the whole argument was to show that a Minister ceases to exist because he did not bring the papers. Supposing one of you, Sirs, sent me your agent, and I choose not to demand from him his letter of authority and I accept him, it is a most extraordinary argument that the agent ceases to exist. That is a sort of logic which my learned friend wishes to apply to this case. But a good reason was given founded on diplomatic practice which you should accept. The evidence says that being a Provisional Government, in accordance with the dignity of nations or comity of nations, no credentials are required. In other words, the important point is whether the man came and was recognized by the person for whom he was intended. During the evidence, my learned friend got an answer from one of the witnesses to the effect that the head of the State, Netaji Subhas Chandra Bose, did not receive him. But there is further evidence which really destroys any other points on this question : Thereafter credentials were asked for, the head of the State according to his conception required it, and you have the evidence that credentials were prepared and that they were signed by the Japanese Emperor and were despatched but under the then conditions of war they did not reach. But because the Japanese Minister was duly accredited I submit it is a reinforcing argument in my favour. When he came, the two Governments-meaning the Provisional

Government of Azad Hind and the Japanese Government-took a different view of what you may call diplomatic practice, but that does not affect the issue. The sending Government in the end, when so required, actually sent letters of credit, and the fact that it reached or did not reach does not affect the issue: at all events it completely cured such defect or deficiency as there was in the procedure. And in point of fact I ask the Court to hold that there was a duly appointed Minister, which is all that arises here. The reason why we brought in the evidence was among other things that the Provisional Government of Azad Hind was properly organized Government, and accepted, and the acceptance does not require necessarily the sending of an envoy, or an ambassador, or a Minister, or whatever the position or the relation between the Governments may be.

What is it that the I.N.A. embarked upon in collaboration with the Japanese? According to their agreement which I submit I have proved, any part of Indian territory which may be liberated would be immediately handed over to the I.N.A. If you, as men of affairs, understand things rightly, it is the only thing to do. Where is the question of being an instrument. If, however, there was any instrument, it was the Japanese, because it is they who were assisting in liberating India, with a view that the liberated parts of India would be handed back to the I.N.A. The facts of the case are that two proclamations were issued by the representatives of both the Governments-Gen. Kewabe on behalf of the Japanese Government and Mr. Subhas Chandra Bose on behalf of his Government. You may say nobody fights a philanthropic war. But whether or not it was philanthropic remains to be seen. I can well understand, and I submit it for your consideration, that Japan, as indeed one of the witnesses said, that the East would be better protected by a free India or that they might have better prospects of trade which is their only means of maintaining their standard of life, which incidentally is also the means of Britain. It was not a philanthropic war at all. So far as the freedom of India was concerned, it was, I submit, the object of that war, and you have it in evidence on oath before the Court. It may well be, I presume it was, that a free India might better be able to assist by means of trade and otherwise to enable the Japanese to maintain their high standard of life. Therefore it is idle, unless people appreciate the true issue for them, to say that unless you conquered territory there can be no other object in assisting in getting its freedom. It is that idle argument which I wish to meet before this Court. But we are not left to speculation. My learned friend cross-examined one of the witnesses. He said, Oh yes, you are assisting the Indian National Army with a view to attain your Japanese war aims, and he thought he had got away with it. But when we asked what were the

war aims, then I am afraid all this cross-examination fell to the ground. He said it was with a view to assist war aims which was to free India. There may be many who doubt promises in this country but I am not one of them. I am one who looks on the brighter side of life and believes that if India could be freed in that way, why honest men should not believe it, it is difficult to understand. The question before the Court shortly is this. What were the relations between the I.N.A. and the Japanese Army. That is the short point. It is a point of prejudice and yet it is my duty in defence of the honour of those whom I am defending and the group to which they belong that they were not the stooges of the Japanese, as cheaply might be said by the opponents. That is the short history of the position of the I.N.A. vis-a-vis the Japanese Army.

I was speaking about the quality of allegiance, and I submitted to the Court that in a case of this kind where you have got to administer the law as a matter of justice, equity and good conscience, you may have a case where the country and the King do not coincide and where there is an imposed allegiance on a subject people; and I am not talking merely as a matter of theory. I am going to give you an instance of a case of this kind which has occurred in the days when the British Commonwealth was called the British Empire; and the statement that I wish to read is the Declaration of Independence by the United States of America on the Declaration of war and before they had attained any statehood, as it is called in the cases which I have given. I am reading from a book called "Speeches and Documents on Colonial Policy", edited by Keith and published by the Oxford University Press in London. It is at page 70. It says :

"When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them with another, and to assume, among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitled them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness"- (and here I would like to point out that the recent pronouncement of Mr. Truman and of Mr. Churchill are to the same effect)-

"that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed, that, whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles, and organizing its

powers in such form, as to them shall seem likely to effect their safety and happiness. Prudence, indeed, will dictate that government long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shown, that mankind are more disposed to suffer while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But, when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a sign to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such government and to provide new guards for their future security. Such has been the patient sufferance of these colonies, and such is now the necessity which constrains them to alter their former systems of government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having, in direct object, the establishment of an absolute tyranny over these estates. To prove this, let facts be submitted to a candid world :"

(Then they cite the grievances—I will not read them at all). Then the statement says :

"Nor have we been wanting in attention to our British bretheren. We have warned them, from time to time, of attempts made by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them, by the ties of our common kindred, to disavow these usurpations, which would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity which denounces our separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, enemies in war, –in peace, friends. We, therefore, the representatives of the United States of America, in General Congress assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for the rectitude of our intentions, do, in the name and by the authority of the good people of these colonies, solemnly publish and declare" – (and this is the point)– "That these United Colonies are, and of right ought to be, Free and Independent States", –(and then comes the important sentence)–"That they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved; and that, as Free and Independent States, they have full power to levy war, conclude peace, contract allianees, establish commerce, and to do all other acts and things which Independent States may of right do. And for the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of Divine Providence, we mutually pledge to each other, our lives, our fortunes and our sacred honour".

Here you have a case in which this quality of allegiance came to a test. They owed allegiance in the familiar sense to the King of England. They owed allegiance to their own country, and they realised that the time had arrived when the question became one of conflict between the allegiance to the King and the allegiance to the country. So that in accepted history, we have got a classical instance of a case where the choice between allegiance to the King and the allegiance to the country was presented to the world, and men of honour chose allegiance to their own country to the imposed allegiance to a foreign king, Therefore I venture to stand before this Court today with the most classical illustration, the illustration of a race, of a country, that has saved the world today, and in the last war and did marvels in the cause of civilisation; and if that illustration is not going to be respected, I submit would be denied completely. I submit that what happened at Farrar Park, by reason of the actual state of events in this country, was perfectly legitimate, and indeed legitimised by what I may call the course of history. Indeed it is amazing how from the year 1776 to today the words are as true as they were then:

"We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness".

And I commend this to you, Sirs, in order that you in your wisdom will consider it just, if ever any question arises. This declaration took place on the 4th July, 1776 and ultimately a war fought, which resulted in 1781 in establishing what is today the United States of America as an independent republic of the world. I venture to submit this a historical instance, important in its character, valuable as showing the way in which the world has functioned. I want to call attention to the oath of allegiance to the Provisional Government of Azad Hind and its context, for it is important that you should know it.

"Indians in East Asia today are no more the subjects of an alien power; they are the proud citizens of the Provisional Government of Azad Hind. To bring this home to the mind of every Indian in Malaya and to rouse our community to full realisation of the responsibilities of the new status, it has been decided to ask each member of the Indian Independence League to take an oath of allegiance to the Provisional Government of Azad Hind. Detailed directions regarding this have already been sent to all the State branches along with the form of the oath. Each member, on taking the oath will be given 'oath of allegiance card', and the 'Indian Independence League membership card', he or she now holds will be taken back by the office administering the oath and destroyed. The privilege of owing allegiance to our government will be extended only to members of the Indian Independence League as any Indian who is not

a member of the League cannot be considered as a true Indian. As Netaji said in his speech in Syonan on 25th October 'we' will not treat them as Indians or friends. There is no place for them in India".

What I wish to point out is that in so far as these documents are concerned they evince the same interest as was evinced by those who issued the Proclamation of Independence of the United States of America.

The next point to which I wish to call attention in this context is the law of treason with reference to India. So far as India is concerned, it is a loose expression. The whole of law on this subject has been codified in the Indian Penal Code and I call attention to Chapter VI of the Indian Penal Code – Penal Code Offences against the State. There you find codified what is the law of treason in other countries. Section 121 is waging or attempting to wage war against the Queen, 121A is conspiracy to commit offences punishable by 121. 122 is collecting arms; 123 is concealing with intent to facilitate design to wage war, 124 is assaulting Governor-General etc, 124A is sedidion; 125 is waging war against any Asiatic power in alliance with the Queen, 126 is committing depredation on territories of a power at peace with the Queen' and 127 is receiving property taken by war or depredation mentioned in Sections 125 and 126; 128 is public servant voluntarily allowing prisoner of State or war to escape; 129 refers to a public servant negligently suffering such prisoner to escape. These are the offences against the State.

My submission to the Court is this. In so far as the question of the law of treason is concerned in this country, my learned friend cannot talk of treason. For what would be called treason in the common law of England, my learned friend would have to look to the language of Chapter VI of the Indian Penal Code. In other words my submission to the Court is this – that generally speaking, apart from Section 121, my learned friend will not have any right to resort to what he calls the principles of treason.

The next point to which I shall call attention is a classic book on the Law of England written in old English. I have got a transcript of it here. It is on page 95 :-

When a nation has placed itself under the protection of another that is more powerful or has even entered into subjection on it with a view to receiving its protection – if the latter does not effectually protect the other in case of need, it is manifest that, by failing in its engagements, it loses all the rights it had acquired by the convention and that the other being desengaged from the obligation it had contracted re-enters into the possession of all its rights, and recovers its independence or its liberty. It is to be observed that this takes place even in case where the protector does not fail in his engagements through a want of good faith but merely

through inability. For the weaker nation having submitted only for the sake of obtaining protection-if the other proves unable to fulfil that essential condition, the compact is dissolved-the weaker resumes its right, and may, if it thinks proper, have recourse to a more effectual protection. Thus the Dukes of Austria, who had acquired a right of protection and in some sort a sovereignty over the City of Lucerne, being unwilling or unable to protect it effectually, that city concluded an alliance with the three first cantons; and the Dukes having carried their complaint to the Emperor, the inhabitants of Lucerne replied "that they had used the natural right common to all men by which everyone is permitted to endeavour to procure his own safety when he is abandoned by those who are obliged to grant him assistance".

This is the law which has been enunciated and accepted in England ever since. This was in 1797.

My submission is that the insurgents are in the position of rebels up to a stage, but a stage is reached where if the State has an organised army it becomes possessed of the right of belligerency, even though they may ultimately fail. The question of allegiance does not arise then, but I would not be surprised if with a view to divert the discussion into a wrong channel any such statement is made.

Before I go further, I wish to make quite clear a point about the prisoners of war. The prisoners of war may submit even to the extent of assisting the enemy that is passive assistance up to the point of labour. You will find in the same books that they may not actually join the enemy and in this connection I wish to submit to the Court what was the relation of the I.N.A. to the Japanese. You belong to the profession of arms and will appreciate what I am submitting to you. I have stated the position as much against myself as possible. I am now assuming that the events which took place at Farrar Park did not take place. I am assuming against myself that they were just prisoners of war. The question still remains what is it that they did. The question arises whether they even allowed themselves to be used as what I might call tools of the enemy or any other instruments, whatever the phrase used. Having been surrendered as prisoners of war, if the Japanese chose to leave the Indians to secure their liberty– I am willing to agree that it suited them–that by itself does not bring the I.N.A. and the accused before us within the prohibition imposed upon the prisoners of war. It is a point that I wish to elaborate up to a stage. I wish to state that there is no obligation whatever which prevents a person who is a prisoner of a war from fighting on his own for the liberty of his own country. I submit that my learned friend will not be able to controvert that, and therefore I wish to make it quite plain that the question of the relation between the Japanese Army and the I.N.A., the

question of the objective of the Japanese as regards India-these points have got to be re-emphasized before this Court. Unless they are borne in mind, the Court may easily go into a wrong track.

The point is this. I quite agree that the Court or any members of it may say : "They were fools in believing the Japanese". That has nothing to do with the case. Other men may have been wiser. The question is whether-those who formed the I.N.A. did believe in a bonafide manner that they would be able to secure the freedom to the country. If they bona fide believed it. the fact that there are wiser men on earth does not alter the issue so far as the renouncement of the guilt of that army fighting for the liberation of India is concerned. Hence it is that I wish to submit that the evidence which I submitted yesterday and a few more passages to which I wish to call attention today is relevant for that purpose. You have it in evidence and it is a matter again in which the question is of one's own belief. The question is not whether that belief was something which probably the Court or any member of it may think was of very credulous people. That has nothing to do with the point. You have it definitely in evidence before this Court, in the evidence of prosecution withnesses, that if any nation or any class came into being to oppose the independence of India, they were prepared to fight that, including the Japanese. That is why I was very anxious to point out that it is only when a story is completely pieced up and comes before the Court that its significance can be appreciated. The whole point of it is that the question is not so much as to whether you or I or anybody else would have relied upon it as a promise. From that point of view probably we are a credulous race. We have relied on many promises of others and of Japanese also. But that had nothing to do with the point. The point is that if these people honestly believed, as I say they did, that they were securing the independence of India, then the question of what a prisoner of war cannot do, does not actually arise and will not arise.

In this connection I would like to read the evidence of Nag. The question that I put to him was : Do you remember ever attending a meeting in Singapore at which Capt. Mohan Singh told the prisoners of war that if need be they would fight the Japanese in addtion to the British? He said he would fight anybody who stood in his way even if this were the Japanese or anybody else. The next is P.W.O. Havildar Sucha Singh, and this is the passage to which I wish to refer : "He said that the I.N.A. has already been started in Singapore and a good many people had joined it; and that I.N.A. will only fight for the freedom of India and for no other cause. If we go to India and the Japanese go with us; we are equipped with arms, and we will fight the Japanese if they turn round against us. This is a golden chance for us and we may not get such a chance again."

The next witness is P.W. 18. He said : "After I was posted to Bose Brigade, Captain Shah Nawaz Khan delivered a lecture which I heard. He said that the Bose Brigade which was formed was to go first of all to the front, and this Brigade is composed of picked officers and men," And then the passage goes on : "He also said that if and when we fight with our allies the Japanese nation, it should not happen that we remain as second rate in the fight and thus disgrace our nation. When we reach India we shall meet Indian men and women, and those who are elders to us we should consider them as mothers and those who are younger we should consider them as our daughters and sisters, and if anybody will not obey these instructions he will be shot dead : and if and when India is freed and the Japanese who are now helping us tried to subdue us, we shall even fight them. He also said that even now if a Japanese gives you one slap, you should give him three in return, because our Government is parrallel to their Japanese Government, and we are in no way subservient to them, and that when we reach India, if we notice any Japanese maltreating any Indian lady he should be first warned by word of mouth not to do so, but if he continued to do so, we were at liberty to use force and even shoot him in order to prevent it, because the fight which we are making now is for the freedom and well-being of India and not for the benefit of the Japanese. This lecture was delivered in Taiping." Then, I come to P.W. 19. He said : "I was aware of the declaration of the Provisional Government of Free India. Prior to my joining the I.N.A., I was in a prisoner of war camp." Then I come to the other passage which is relevant for the purpose. "I know after joining the army that the sole ambition of the I.N.A. was to fight for the freedom of India against any army in the world, but my own idea was not to fight but escape. By 'any army in the world' is meant also the Japanese". Then I come to P.W. 24. He said : "In August 1943 I was in Neesoom Camp. Captain Shah Nawaz came to address the heavy Gun Battalion there. He said that the I.N.A. had been formed for the liberation of India and it would fight not only British Imperialism but also those who would put obstacles in the way of India's freedom or any other party which wished to subjugate India."

I had hitherto avoided reading any evidence because there was no substantial contest as to the facts which have been proved. The record of evidence clearly shows that in so far as the I.N.A. was concerned, they acted on their own. No doubt, they accepted the alliance with Japan on promises which they, at all events honestly and sincerely believed, and if they believed them, I submit there can be no question of any obligation. There are so many matters which have been gone into and which in patience we suffered in the belief that there was no relevancy to the charges before the Court. But now that they are before the Court, I must

separate them as best as I can and, while separating them give answer to every single suggestion that was made or is likely to be made. Hence it is that I am here before the Court to point out that in doing what the I.N.A. did, there was no question of any breach of any obligation or the prisoner of war obligations or duties, remembering the extreme obligation which, I submit, I have stated as strongly against myself as it is possible to do.

The next point to which I wish to call attention is this. In addition, there is the evidence of the last witness, P.W. 12 and that sets out more or less fully the point of view of those who honestly believed in doing what they did. I am not saying that the Court is not called upon to examine the matter in its own light. At the same time, the Court has got to see not so much what any individual member might have done as that whether you believe what is said before this Court and that was their object.

This witness said "My reason for joining I.N.A. were many, I admit that it was a difficult question to decide whether I should join the I.N.A. or not, because there were many factors which I had to consider. It was a momentous decision. Until that time I was not greatly interested in politics or the political welfare of India because I was educated that way, and moreover when I joined the Indian Army in 1936, I felt that politics was not encouraged in the Indian Army and hence I stayed away, but when the question of I.N.A. arose and we had to decide whether we should join or not, I had to think deep, but it was such a big question that I could not make a decision myself."

The reason why I am reading this to the Court is this. He was a witness of truth and the very fact that they had a conflict in their minds is illustrative of the extreme bonafides of the men who chose to take the course which they did. Hence it is that I shall read a few more lines of that evidence : "I remember sometime in the beginning of July 1942, when we were being asked whether we were going to volunteer for the I.N.A. or not, I was staying at Mount Pleasant, Singapore, where Capt. Mohan Singh had his Headquarters. I know Capt. Sahgal for the last 12 or 13 years; we were in College together and we were friends there. I felt that if I had a discussion with him along with a few other officers, we may come to some decision regarding volunteering for the I.N.A. So in the beginning of July, he and two or three other officers came to my bungalow at Mount Pleasant and we went through this question of joining the I.N.A. We discussed all the pros and cons. We unanimously decided that under the circumstances we all owed our allegiance to our country.

"We also felt and agreed upon that so far concering our career in the Indian Army, there had been distinctions between the British Officers and the Indian Commissioned Officers. The Indian Commissioned Of-

ficers had not been treated as well as our English comrades or brother officers. We also felt that if the senior officers present in Singapore or in Malaya did not join the I.N.A., it was quite possible that the Japanese would exploit the Indian prisoners of war, because then the Indian prisoners of war would be split up into small groups. Some people would join and some would not, and the Japanese would take advantage of that and enroll people from amongst the prisoners of war who would be willing to do any service for them. We felt that would be a disgrace to Indians. We agreed that if the senior officers joined the I.N.A. and formed a strong party and organised the I.N.A. as a regular army and fought the Japanese on every point regarding the army, we would have a far stronger position with the Japanese than otherwise. We also felt that if we created an army of our own, we may be able to establish a certain amount of standing with the Japanese, and by doing that we may be able to stop the Japanese from committing any atrocities on the Indians in Malaya. We had seen what the Japanese were doing to the Chinese and Anglo-Indians and the Malayans. They were not treating them very well. Certain atrocities had been committed on the Chinese and also on the Eurasian community, and we thought that if the Indians refused to join the I.N.A., it was quite possible that the whole of the Indian community in Singapore or in Malaya might suffer. So we had a discussion on all these points. But then arose the question that if we did join the Indian National Army, what would be the reaction of our people in India?"

My suggestion to the Court is this that, apart from the process, the thought which the last witness brought to bear upon it and the discussions which he had with other people, clearly show that they did not take the steps either dishonestly or hastily. They took this step after taking into account the whole of the situation in existence at that time, and the future as they saw it.

And if that is the condition in which they did it, I ask the Court to hold that they honestly believed in the propriety of the step they took and the justice of the cause for which they took it. And hence it is that I wish to point out to the Court that it was not a case, as the text-books say, of a prisoner of war joining the enemy in order to fight his battle. That, I quite agree according to the text-books, he may not do. But where a prisoner of war already released, as I have told you earlier, finds himself in the situation in which he did and then fights for himself and for his own country, being prepared to fight against the Japanese themselves if they ever became untrue to them, in such circumstances, I submit, there was no question and there could be no question of the Indian National Army being guilty and of those who joined that army being guilty of any act which may be regarded as contrary even to what you may call the

code of duties imposed upon a prisoner war. I have already submitted and at the risk of repetition I will say, that it is entirely irrelevant and there is no such thing as a charge against these men before you of a breach of duty as prisoners of war. In fact there is no such charge in the Indian Penal Code, so far as I can see. There may be a charge under the Indian Army Act but no such charge is at present before you. There is not even a charge of desertion and indeed there cannot be for when the prisoners of war were surrendered there was no occasion for desertion. So let us not be carried away by what you may call the popular language of desertion, breach of duty and all the rest of it. Let us concentrate, and I ask the Court so to do, on the charge on which the accused are on trial before the Court, and on that only. The rest is a matter of prejudice; and if one has a complete answer even on a matter of prejudice, it is a matter of satisfaction. It is a matter which I understand—and I appreciate—that tribunals of this kind are likely to take account of, namely, that general bonafide, honestly and integrity all goes to the credit of individuals who are on trial as so much in their favour.

Then, Sirs, there is one piece of evidence in so far as this particulars matter is concerned, a piece of evidence of extreme importance, and that is how the first I.N.A. broke up. As to how it broke up you have evidence before the Court and it is unanimous as to the reasons for which that event occured. Rash Behari Bose was for many years in Japan and he was too easily inclined—to put it most mildly—to believe in the Japanese. Mohan singh on the other hand was very cautious. Mohan Singh in fact has himself evinced by his conduct that should anything happen to him, that is to say, if he is arrested or removed, the army should be dissolved. And the real reason is this, that while on the one hand Mohan Singh was anxious that there should be an army formed for the liberation of India, at the same time he was equally anxious that the army should not serve as a mere instrument of Japan. And it is because he had his suspicions, is because—of the Resolutions in the Bangkok Conference with regard to making clear the aims of the Japanese for the purpose of fighting the war so far as India was concerned—that Mohan Singh began to lose faith in the promises of the Japanese. And as soon as the Japanese realised that through the agency of Rash Behari Bose—and you have picturesque evidence here—Rash Behari Bose came along, collected all the senior officers and declared that Mohan Singh had been removed. I could not quite appreciate, with all the thought that I devoted to it, the point that my learned friend made or attempted to make as to whether he was actually removed by Rash Behari Bose or by the Japanese. For my own part I do not mind the suggestion that my learned friend made that the Japanese arrested him. That is precisely the point, that the first I.N.A.,

was at a stage at which there was a trial of strength between those Indian nationals who were members of the I.N.A. and the Japanese. Later on when the Japanese realised that the Indian National Army and those who were likely or wanting to join it were not prepared to become tools in their hands, that there was a break, and hence when you come to the second I.N.A., when Subhas Chandra Bose took command of the Indian National Army, the second time you find an association between the two armies—may be very unwilling on the part of the Japanese. Very often one has to make a choice when one finds a strong man on the otherside; and hence it is that I wish to insist before this Court that throughout the dealings between the I.N.A. and the Head of the Provisional Government of Free India at this time, the position taken up by them was not of an instrument of the Japanese, but a body formed with the object of liberating themselves, no doubt getting all the assistance that they could from the Japanese as an allied army. And that, I submit, is the key to the bonafide of the belief of every individual man who at all events thinkingly—if I may use that expression—joined the I.N.A. I dare say it often happens in the world that once you find a thinking and leading man taking a course, other people bonafide believe it to be the true course and join it. Therefore, I submit there is ample evidence on record, evidence emanating from witnesses which in ordinary courts and tribunals is the best to be relied upon by the defence, evidence from prosecution witnesses, not all willingly given, that they fought their own ground, they fought their own cause, and, therefore, there was no question whatsoever of their breaking any duties which they owed as prisoners of war. But you have to remember all the time and again and again that there is no such charge in the trial before you. There are only two charges before you which I need not repeat. But I want to be quite careful because it will be my duty to deal with the material, lest it might be suggested that I did not deal with it, and I wish to point out its relevancy and its significance to the extent to which these points bear on the conduct of the men on trial before you. I have no desire to shirk an inquiry; in fact I am here as far as I can—apart from any questions of private opinions on political issues—to impress upon you the truth, integrity and sincerity of men which after all is a 'bigger asset sometimes that the legal technical issue'. There is also the evidence of Lt. Col. Loganadan, D.W. 7 with reference to the question; and I am obliged to refer to it particularly because of the pamphlet called "Our Struggle" which was placed before you. There is just one point which I must make before I read the evidence, that all that is proved is that the pamphlet was issued. But I hope and trust that my learned friend will not suggest that the mere fact that a pamphlet is issued, that by itself proves the truth of the statements made

therein. Let me, therefore, begin by saying that I am not obliged to explain why Rash Behari Bose said what he did. It will be an error on the part of the Court to say that because Rash Behari Bose said something about Mohan Singh, therefore, it is true. At the same time I wish to call attention to this evidence with a view to pointing out the terms on which Mohan Singh and Rash Behari Bose stood, with a view to point out that any allegations emanating from the disappointed Rash Behari Bose at that time are not to be taken as words of truth. Secondly, in any case an allegation made by A against B, neither of whom has appeared in Court as a witness, is no proof of the allegation made by him.

With this observation I now call attention to the evidence of D.W. 7 (Lt.-Col. Loganadan).

"I know Captain Mohan Singh. When I joined the Indian National Army, he was G.O.C. The relations between Captain Mohan Singh and Rash Behari Bose were not very happy. Of my own personal knowledge I know that Rash Behari Bose, having lived so long with the Japanese was inclined to be guided and controlled by them. Whereas Mohan Singh said he felt the Japanese should be dealt with a firmer hand than what Rash Behari would be able to do."

I then come to D.W. 12 (Captain Arshad). The passage to which I call attention is this :-

"I was in the first Indian National Army Headquarters, then as General Staff Officer in 'G' Branch. The first I.N.A. was dissolved in December 1942. The I.N.A. had been raised after the Bangkok resolutions were forwarded for ratification to the Japanese Government. The Bangkok resolutions were the result of a Conference held in Bangkok in June. There were many resolutions in that and they were passed by the Conference and then sent to the Japanese Government for ratification, and we hoped that the ratification would come quickly; but as the days went by, Captain Mohan Singh, who was then G.O.C. of the Indian National Army, felt that the Japanese were delaying the ratification of the Bangkok resolutions and he asked the Japanese liaison body which was attached to us, called the Iwakuru Kikan to expedite the ratification of the resolutions. They were not very clear in their replies. They tried to delay them as much as possible. I was present : Captain Mohan Singh kept his Headquarters informed of all the correspondence and the arguments which he was having with the Japanese. Captain Mohan Singh told us his doubts of the intentions of the Japanese. He said that he noticed that the Japanese were not playing the game, and he said that if the Japanese continued with that attitude of theirs he would dissolve the Indian National Army, and we all agreed with him because we felt that unless and until there was a clear understanding between the I.N.A. and

the Japanese we would not continue the Indian National Army. Besides that, there was another main point of dissension between the Japanese and Captain Mohan Singh. At the Farrar Park meeting the Japanese had handed over all the Indian prisoners of war to Captain Mohan Singh. Until that time the members of the I.N.A. as well as those prisoners of war who had joined the I.N.A. were under the command of Captain Mohan Singh. But in December the Japanese wanted to take those people away from Captain Mohan Singh who had not joined the I.N.A. Captain Mohan Singh felt that the Japanese were not keeping to their word and he refused to part with the prisoners of war. These main reasons as well as the other minor reasons forced us to dissolve the I.N.A.

And, Sir, the Bangkok Resolution No. 13 which is referred to, reads thus :

"(13) Resolved that the Indian National Army shall be made use of only.

(a) For operations against the British or other foreign powers in India.

(b) For the purpose of securing and safeguarding Indian National Independence, and

(c) For such other purpose as may assist the achievment of the object, viz., Indian Independence."

Lt. Nag (P.W. 1) refers to the same subject in these terms :

Capt. Mohan Singh left written instructions that if he was arrested, the I.N.A. should be dissolved. 'In the event of my arrest the I.N.A. will be dissolved and all the I.N.A. badges of rank and records will be destroyed'. There was a general feeling from the beginning that the I.N.A. should not be subordinated to the Japanese and that we would not allow it to be subordinated to the Japanese. There was no question of dissolving it at any time during those days. The predominant motive was to free India for the sake of Indians.

"After the 2nd I.N.A. was formed the same feeling was there, until Subhas Chandra Bose arrived in July 1943. After that everybody thought that they had got a leader who could guide them on proper lines without being subordinated to the Japanese. Thereafter the two armies fought as Allies, i.e., the Indian National Army and the Japanese".

This, Sir, is the evidence which has been placed before this Court. As I said, my submission before the Court is that it was when the I.N.A., which was formed on the second occasion, felt confident that they would not be subordinated to the Japanese that they really fought as Allies And hence it is that I submit to the Court that in so far as relations between the I.N.A. and the Japanese Army were concerned, it has been established by evidence that they were of the character which I claim for them,

namely as allies. So far as the I.N.A. was concerned, it was actuated by only one motive and one business, and that was to secure the freedom of India. That is the issue. which as I have said, does not actually arise, but was bearing on the integrity of purpose of those who are on trial as members of the Indian National Army.

Then the next point to which I wish to call attention is the evidence before the Court that the Indian National Army was completely officered by Indian Officers. True, an attempt was made by my learned friend in cross-examination as to the question of the High Command. I do not deny for a moment, though I do not understand or profess to understand very much the organisation of armies when they fight together for apparently the same purpose in any case, but knowing what you do about the last but one war and the last war, when any question arises of unified command it serves very little purpose to suggest that in so far as the higher strategy is concerned, it was no doubt in the hands of the Japanese. No doubt probably they claimed at all events that they understood the art of war better, and that after all the Indian National Army consisted of men of not that standing. But apart from accepting better judgement on what should be the proper strategy, when it came to a question of internal administration of the I.N.A. it has been amply proved before the Court that the I.N.A. was entirely independent in its composition, including every officer. The evidence of Lt. Nag is in these terms :

"The whole of the Indian National Army was trained by Indian Officers and not by the Japanese. It was entirely and throughout officered by Indian officers and not by Japanese officers.

The colours of the Indian National Army were the Indian National Congress colours i.e., saffron, white and green. Their badges were distinct from the Japanese badges".

And then he answered other questions which are immaterial, namely, that among the colours in the middle of one of the badges there was a brown star and it was resented by the personnel of the I.N.A. as it might be mistaken for the Rising Sun.

P.W. 19 gave the following evidence :

"So far as I am concerned, I took instructions from our own Indian officers only and not from the Japanese. As far as I am aware, there were no Japanese in command in our area or otherwise in the I.N.A. I was Assistant to Lt. Abdur Rahman who was left in charge of the rations at Falam. There was a long carry of 48 miles for rations. The rations consisted of rice; salt, oil and sugar. Sugar was very scarce. The rations were very short consisting of rice. salt and a little oil. The Indian National Army was fighting under great hardship on that front. Whilst I was in the I.N.A. I carried out my duties faithfully".

The next point which I wish to make is that apart from what you may call the general higher strategy, the Indian National Army was completely independent. And though I am not anticipating a point which it will be my duty to argue, namely, whether or not the question arose that people joined the I.N.A. because they might be worse off as prisoners of war, the less said about it the better. The evidence clearly shows, that the only ration that the I.N.A. had, apart from sugar and oil which was nominal, was rice, and that was the luxury which attracted men to the I.N.A. My learned friend will consider twice over before trying any such argument. The question really is that one set of men believed in a cause and the other set of men either from supineness or otherwise did not, and nobody ever gave thought to the question as to whether one would be better off or not. One thing is quite certain : that apart from what actually happened by the conduct of the Japanese, those who joined the I.N.A. were certainly facing the possibilities which every soldier has to face, unless he wishes to avoid it, which prisoners of war could, namely, fighting with the opponent army. And, therefore, my submission to the Court is that this idea of contrasting the comforts of the I.N.A. and the comforts of the prisoners of war under the Japanese, is entirely overdone. It is entirely a question as to what points of view appealed to one or the other sets of men, and therefore, Sir, my submission is that in so far as that is concerned, we have been able to place before the Court the actual evidence on the question.

The next point is that the I.N.A. was a purely voluntary army, and notwithstanding the attempt made, the Prosecution entirely failed to prove that it was not voluntary, because from time to time it has been proved before this Court by the speeches made by the accused and Sri Subhas Chandra Bose, which indicate that at every stage opportunity was given to every member of the I.N.A. to withdraw if he chose to do so. But the strongest evidence is this : It is common ground, apart from actual principles which have not been accurately proved, that only a portion of the volunteers could be armed, equipped and trained, because of the paucity of material, and that there was a large number of people who could not be trained and could not be armed for want of resources, what is called the surplus volunteers. But I put it to you, Sir, as men of commonsense that it would require very much effort on the part of my learned friend to say that when they had more than enough men already, that they coerced more people to join the I.N.A. Or, in the language of Lord Shaw, I think it is a statement that stultifies itself because it is stated that 'we have enough men and we cannot arm them, and yet it is alleged that you go on coercing people to join. I think it is a folly of which no decent human being would be guilty if he had a grain of commonsense. What has actually happened

is that people have been punished for crimes of their own and in order to appear glorious before this Court, they attributed it to pressure by the I.N.A. It is a very clever half-truth, which is not uncommon.

You get a fact which occurred. Then in order to appear virtuous he would say that he was punished to be coerced to join the I.N.A. A more ludicrous story could not have been presented to the Court, because in one case the witness admitted the reason why that took place. They were sent to the Detention Camp. Having been sent there, they were asked to surrender their ringleaders. When they did not, ten people came and there was a free fight — 300 on one side and 10 on the other. And for the Government to put forward this sort of half-baked story in order that the Court may swallow it passes one's understanding.

This is Lt. Nag : "I heard Subhas Chandra Bose state at a meeting held soon after the meeting of the 21st October, 1943, that anyone who wished to leave the I.N.A. was permitted to do so".

P.W. 5 : "Prior to my arrival at Port Dixon in Kuala Lumpur—at that time I was in the custody of the Japanese—the bad conditions were due to the Japanese. In January-February 1943, I saw Capt. Shah Nawaz for the first time when he came to collect volunteers. I am quite clear that Capt. Shah Nawaz Khan left it open to everybody to join the I.N.A. or not as they chose. I remember that he wanted staunch men who were prepared to lay down their lives for the freedom of India. I never saw Capt. Shah Nawaz after that lecture".

P.W. 24 : "I reached Popa on the 25th or 26th February. Col. Sahgal said at Popa that those who did not wish to stay in the I.N.A. and wished to go over to the enemy should tell him today. He will then make arrangements to send them in one party to the enemy, but they will not be permitted to take any arms or papers with them. 'I do not want that men should desert in driblets. 'As far as I understand it was Sahgal's intention that after the party went over, men should not go over in driblets and so cause demoralisation."

D.W. 6 : "The recruitment was absolutely voluntary. We had surplus volunteers whom we could not train or arm".

D.W. 7 : "The National Army was purely voluntary. As far as I am aware no coercive methods were used in recruiting. I am aware as a member of the Provisional Government that we declared war on Britain and America".

Then Sir, there is one more statement referring to Lt. Dhillon, to which I wish to call attention. My submission to the Court is that in so far as the accused before the Court are concerned, they by their open speeches gave everybody to understand that it was entirely their own choice whether to join the I.N.A. or not.

That brings me next to the evidence about the alleged coercion for the purpose of compelling men or inducing men to join the I.N.A. The position, Sir, is this with reference to that. At the time when the question arose as to the admissibility of the evidence, it was candidly stated by the Advocate-General that he did not rely on Sec. 10 but the way in which it is sought to make it relevant is this. He said that the accused did not participate in it, did not do it, did not encourage it. But that they knew about it.

The matter did not rest there. When they asked other people to join the I.N.A., they gave a veiled threat : "Remember if you do not join, what hardships exist". And the matter was further strained before this Court by saying — meaning thereby among other things —that there would be personal coercion. It was on that statement that this honourable Court was pleased to admit the evidence. The attempt was made to show that the accused made this veiled suggestion. That attempt has completely failed because Capt. Dhargalkar who was called to give evidence in support of this, fell through. I shall read that part of his evidence to show that he completely collapsed in what he came to prove. He came to prove that the three accused, or some of them, went with the other officers. He came to support what the Advocate-General was instructed to put forward, namely, that he was given the alleged veiled threat. When we came to cross-examine Capt. Dhargalkar, he said : "I was never asked by anybody. I was never addressed by anybody" and the more significant thing is, he ended by saying : "I cannot state to the Court who said what to anyone". The net result of his evidence amounts to this that the Government having undertaken to this Court to prove that the veiled threat was given in that form, and that meant evidence possibly relevant in the eyes of the court, the evidence was allowed to be given. But in the light of the evidence of Capt. Dhargalkar, there is none in which any allegation of veiled threat exists. I, therefore, ask the Court to hold evidence as completely irrelevant because it was admitted on this provisional promise, namely, that it would be proved that there was a veiled threat given by the accused, because there is no other way in which it could be made relevant. There is no charge against the accused of any personal cruelty of any kind. There was no charge that they encouraged it, and the mere fact that they had knowledge would not be anything— even that, they have failed to prove. When I pointed out that mere knowledge was not enough, my learned friend added a further point, which I presume induced the Court to allow that and that is when they used the words which they are alleged to have used —"If you do not join remember the hardships--meaning thereby that in as much as they know that wrong methods were being adopted, they threatened the men by

saying wrong methods would be adopted in their case. That I submit is the only process of reasoning by which he attempted to make his evidence relevant. My learned friend has completely failed to establish either the knowledge or alleged threat and for these reasons, Sirs, I submit that this evidence should not be excluded, and I have prepared a petition so that it may remain on record for my submission.

The learned Judge-Advocate told the Court on the occasion of the question of admission of the evidence :

The learned Advocate-General really bases his case on the speeches of the accused which he will prove showing, as he says, that the accused referred to the hardships which would be inflicted on prisoners of war unless they joined, and thereby implying that they had knowledge of the methods by which he alleges that recruiting for the I.N.A. was being carried on.

At the same time, now we have arrived at a stage when I respectfully ask that the Court should rule that evidence should be entirely disregarded, because there is no proof of the promise on which that evidence was submitted. That is the formal application I make to the Court.

Judge Advocate : Do you mean that you are asking us to make a decision on this now?

Counsel for Defence : On this point.

Judge Advocate : I am afraid it is not at all the procedure to make piecemeal decision on parts of the case, without hearing the learned Advocate-General and without hearing me. That decision will be made in due course. But I must ask the Court that they should go on now without making any piecemeal decision at this present stage.

Sri Desai : I shall leave it at that. I thought that I would save the Court, and perhaps incidentally myself, the necessity of having to go through that evidence to show how utterly useless it is. But that being the view of the Court I will not pursue it.

That brings me to the next question. My submission is that the basis on which that evidence was admitted has completely disappeared; and in as much as it has disappeared it should not be taken into consideration in this case at all.

The only reason why I thought it my duty to call the attention of the Court at this stage was that you might have to go through the evidence and think if it is relevant.

The first witness, to whose evidence I think it necessary to call the attention of the Court, is Capt. Dhargalkar. This is what Captain Dhargalkar said in his examination in chief.

"I do not remember Lt. Dhillon being there, but I remember Capt. Shah Nawaz Khan and Capt. Sahgal coming there. I recognise both these

officers as accused before the Court. Neither of the two accused ever spoke to me, but discussions usually took place and nearly all the discussions were concerned with our joining the I.N.A. I was present at these discussions. It is very difficult for me to quote the exact word which Capt. Sahgal and Capt. Shah Nawaz Khan said, but the gist of the thing was : 'Why don't you all join the I.N.A. rather than waste yourselves living under these conditions."

That is really the whole point. Let me examine whether the promise is fulfilled even in the examination-in-chief. If "conditions" merely meant conditions as prisoners of war, whether for the time being under the I.N.A. or the Japanese, that is not a matter of charging the accused. But I suppose my learned friend will use the word "conditions" to mean almost anything, meaning thereby that "some people did something to somebody else that will be your condition." I submit it does not carry the matter far enough.

I would then call attention to the cross-examination of this witness. He says :

"I saw all the three accused on several occasions. I saw them anything between 20 to 50 times. I only spoke to Capt. Sahgal a couple of times; I do not remember having spoken to Capt. Shah Nawaz Khan or Lt. Dhillon. I spoke to Capt. Sahgal in Col. Bhonsle's house. I cannot remember any other occasion. I was present at fifteen occasions at which discussions took place. Capt. Shah Nawaz may have been present about twice and Capt. Sahgal was present about the same number of times. This was in a Separation Camp at Bidadari. There was one huge camp at Bidadari and also a Separation Camp. I was in the Separation Camp. The whole of the Bidadari Camp was the Indian National Army Camp. We were taken there by Capt. Mohan Singh. There were about sixteen of us living in the room. I did not take part in the discussion nor was I addressed by Capt. Shah Nawaz or Capt. Sahgal. That is all that happened during the discussion".

Then he goes on to say.

"Capt. Shah Nawaz Khan came there, but I do not know whether he came to see Capt. Sher Dil Khan. I was not invited to a discussion, I was living in the room and I overhead certain conversations. I cannot remember the words of these discussions accurately but I remember the gist of them. The gist of the conversation included many other subjects other than the Indian National Army. I was addressed but not any of the officers present there. Capt. Shah Nawaz Khan was speaking to 16 other people. The gist of his conversation was : "Why do you not join the Indian National Army?" I remember that occasion to the Best of my Knowledge. It may have been any time in the month. I cannot remember all that he said. I cannot say exactly what he said".

(You will see, Sirs, a change in the gist. There was no question of what consequences would follow.)

"I cannot remember exactly what he said. I cannot single out from the others what Capt. Shah Nawaz Khan said. My answer is the same with regard to Capt. Sahgal. What I told the Court is the general impression without knowing who said what."

This is the evidence of Capt. Dhargalkar, and I respectfully and emphatically submit to the Court that the promise on which that evidence was admitted remains unfulfilled : and in as much as it remains unfulfilled, my submission is that the evidence should be disregarded completely.

Now, with that submission and in view of the record, it is my duty very briefly to examine the evidence which has actually been given, and I will preface the examination with this remark. This is a case where in some instances what is called a half-truth implies an untruth : e.g., there was a Detention Camp where people were taken if they were guilty of acts of insubordination or any other act contrary to the discipline of an army. Having been taken there, there was no doubt a certain amount of tasks and fatigues they were asked to do. That is perfectly true, but that having been done, the man wants to make a martyrdom of it. I will tell you why. He says he was taken there and he was asked to join the I.N.A. It is all, I submit, embroidery of the case, and I will ask the Court to examine that evidence in that light and in one or two instances. I shall be able to show that reluctantly he almost admitted the case I put to him, that he was sent there because he was guilty of insubordination. People very picturesquely said they were asked to pick up one end of a pole and every time a man followed them or hit them— I think the very exaggeration defeated its own purpose. I do not think any Court will believe such an absurd story. True he was taken there, and no doubt he had to do a certain amount of fatigue. No doubt it may be that a non-commissioned officer thought it was below his dignity to pick up things which were necessary. In fact you might remember with what amount of reluctance the witnesses gave the kind of evidence before the Court— I would recall a picture of one of the witnesses when I told him that this was only for the purposes of manure and there was the evidence of a garden — it almost taxed one's patience to be able to get out of him that evidence, and get him to admit those facts; and even then he kept on saying, "Oh, there was a road there and in between there was something and if you call it a garden it is wrong and so on". The fact remains that the witness was taken there for some act of insubordination he was put to a certain amount of task, but then in order to glorify himself as a martyr, he now comes forward before this Court and says, "I was taken there bcause I

did not join the I.N.A." and when I cross-examined him as to what particular position he held with particular distinction, and what distinguished career he had, he ultimately collapses and admits he was an ordinary soldier. To think, therefore, that stories of this kind would pass muster before a Court composed of men of affairs and experience, I submit, will not do.

I call attention first to Wolit Bahadur, P.W. 14. The kind of picture he gave this method of carrying baskets at the end of a pole— I do not suppose it is any great innovation or torture, unknown in India. The way in which he described it, and if he was not giving evidence before men of experience in this country, was almost insulting to one's intelligence. After all it is a common method of carrying a load on bars with a man at each end; and if he objects to carrying a load like that I am very sorry for him; but I am afraid he has to labour, and if he has to work, he has to work; and the more we learn to do manual labour, I think, the better for men of my country.

And then he said—it was a ridiculous story—he carried out the order and picked up the cow-dung. There came a road. There were six men who stood just for the purpose of giving a stroke as he lifted the load. That I submit defeats itself. In cross-examination—that is where I wish to call attention to a few passages—this is what he says : "He said that we had now fallen from the English into the Japanese hands and we have to carry out their orders and do their fatigues. He told us that the British had run away and left us there. He said that our home was in India and we have to join with other Indians to fight for India. He also said that for this reason we should join the I.N.A. He also said that the I.N.A. was being formed to set India free. He said that for this reason we should join the I.N.A. About one or two men said that they did not know anything about the I.N.A. and they were not going to join it. At that time we did not know what this I.N.A. was. I know Jamadar Til Bahadur Adhikari." This is a very important thing. They are the people who are said to have come in this party to attack this gentleman and his friends in order that they may be coerced to join the I.N.A. It would be fortunate if one can think a little in advance. He admitted that every single one of them who took part in this raid to induce this gentleman and his friends to join the I.N.A. were all men respected in their Regiment and respected in the parts of the country from which they came. If he had only realised what it involved, he would probably not have admitted it. "I came to know that the I.N.A. was being formed. I know Jamadar Til Bahadur Adhikari. Jamadar Puran Singh Khawas was a man who was respected by our unit and so was Jamadar Til Bahadur Adhikari. Jamadar Til Bahadur delivered only one lecture at which I was present. He also told us about the

object of the I.N.A. which was the same as Puran Singh had told us. When Til Bahadur delivered the lecture there were about 600 men present". He admitted to me that they were being asked in the ordinary course to join the I.N.A., asked by people whom he admitted to be respectable and the point in asking for the admission is this, that those were among the people who came armed with a view to attack these innocent men in order that they may join the I.N.A. I make a present of that kind of story for your acceptance.

Then, Sir, comes in very common parlance the cat out of bag. "Those who did not join the I.N.A. were required to do fatigues for the Japanese. Those who joined the I.N.A. were not required to do fatigues for the Japanese."

Prosecution Counsel : I am afraid my learned friend is under a misapprehension. He gave no names.

Defence Counsel : In this examination-in-chief he gave the names of the people who formed the party of attackers. It comes in cross-examination.

Prosecution Counsel : He does not say that these were the people who came to assault him. I know my learned friend put those names to him. No such questions were asked that these were the people who were in the firing party.

Judge Advocate : That certainly was not said, Mr. Desai.

Mr. Desai : The point of the argument will be perceived, name or no name. "Those who did not join the I.N.A. were required to do fatigue for the Japanese. There was dispute when we refused to do fatigue duties for the Japanese. The leaders whom I have named told us not to object to the fatigue. In spite of their persuasion, some of us did not obey, we reported that we will do fatigues for the Japanese but we have nothing to do with the I.N.A. The guard was sent because some of us did not obey". That is the point. The point is that it was not because they were to be persuaded to join the I.N.A. that the guard was sent. On his own admission they did not obey to do the task they were sent on and that destroys the whole of the evidence, names or no names. His whole purpose was that these people came on their own with a view just to educate them, because they would not join the I.N.A. If my learned friend will follow the process of cross-examination and the admission made by Wolit Bahadur, I only point out that it was up to the witness to say that they were not in the firing party.

Judge Advocate : It is you here who is in the wrong. You have said that these men were in the firing party, whereas it was pointed out that they were not.

Mr. Desai : There is the evidence in chief. I took the names from

the summary of evidence. Because of that ruling the names were not allowed to be given. Whether the witness proved or failed to prove that the attack took place, because they would not join the I.N.A. that is the true issue, and remembering that to be the true issue, I beg leave to read where I left, and that is this:

"There was a dispute when we refused to do fatigue duties for the Japanese. The leaders whom I have named told us not to object to do fatigue. In spite of their persuasion some of us did not obey. We reported that we will do fatigues for the Japanese but we have nothing to do with the I.N.A. The guard was sent (that is the material point) because some of us did not obey." You cannot get out of that. In other words the story that the guard was sent with a view to shoot them because they did not join the I.N.A., is entirely destroyed by this evidence. "The guard was sent because some of us did not obey. The guard came to seize the ring-leaders". That is precisely my point. I said they were all guilty of one or other offence against discipline, and hence action was taken against them, and this is the best illustration. Of course people get warned : after one man has been cross-examined you may not get the same type of actual admission. But here you have the clearest possible admission, the negation, the complete negation that any attack was made on them because they did not join I.N.A. Of course, they always repeat like parrots, when it becomes necessary : that is what happens. But occasionally there are lapses. "The guard was sent because some of us did not obey. The guard came to arrest the ring-leaders. We were about 350 men. Some of the men had a dispute with the guard. The guard stopped us from doing this and then fired in the air." What possible course forsooth it was sent for purpose of asking them to join the I.N.A. and they should have fired in the air. The whole point is that these were recalcitrants, a disobedient crowd, they were asked to surrender. As a learning they fired in the air. They would not obey. Of course the trouble took place." When we did not obey the order of the guard, they fired. The guard did not prevent us from doing fatigue but they spoke to us about I.N.A. which we did not obey". All this rubbish is difficult to understand. "First they fired in the air, and when we did not obey ultimately they fired at us. About two to three men were injured after the firing. Then we pursued the guard. The dispute between the guard and ourselves was that we resented the appearance of the guard during the lecture time". I do not know what it means. Whatever that means, they know better. As I said here, it is a complete demolition and the best illustration of how the false is mixed up with the true. There is no doubt that there was a scuffle. That is not denied. But they want to annex the scuffle to something else. That is a piece with all the evidence with which I am familiar also. My submission

to the court is that this evidence alone is sufficient to discredit the kind of evidence the Government has put forward with a view to show that atrocities were inflicted for the purpose of joining the I.N.A. As to the tortures, they were of two kinds. Regarding one, I have got definitely out of the mouth of the witness himself that they objected to the fatigue. They were persuaded not to do it. The very leaders whom they respected, persuaded them not to object to do fatigue. They were again asked to surrender their ring-leaders. These people would not. They fired in the air and ultimately they fired at us. Three people died and there were 550 of them. Such evidence, can my learned friend or any gentleman in his very high position ever place before the Court, name or no name?

Prosecution Counsel : I only corrected a statement which was not justified by the record.

Mr. Desai : I admit that I was in the wrong. I say the point of the argument is really this that the witness who came to swear false to the fact that the party was sent armed with a view to fire at them, in order to compel them to join the I.N.A. here stands on his own evidence self-condemned. He admits that the purpose was different. The occasion was different, and that disobedience was the only cause. My case is that the cases which they have selected are cases of a similar kind where people undoubtedly were dealt with for breach of discipline, but which they now attribute to a false cause, namely, their refusal to join the I.N.A. The next is the case of Mohammed Hayat. That is the case in which we said that because they killed some cows, a quarrel arose and hence a scuffle. It is true a scuffle took places. The question is-was it with a view to compel them to join the I.N.A. that is where I say they get hold of an admitted event, or a more or less admitted event, and annex it to a false cause. He said :

"The Camp Commandant was Captain M.Z. Kiani, who was succeeded by Col. Shah Nawaz Khan. I heard Col. Shah Nawaz lecturing to the Camp. I was not present at the lecture he delivered in the camp, but I was present at the lecture he delivered in the mosque. He said that Sikhs and Hindus have already volunteered, and that the Mussalmans should also join. He said : "Muslims must join the I.N.A. because when the Hindus go, they will trouble you in your homes in India. He did not threaten us with force but he said that we would join the I.N.A. He did not say that he only wanted sincere men. He said : "I will not give any sort of trouble to you but you should volunteer. I want true volunteers. After Dua Khair, we said that we will not join the I.N.A. We meant by that none of us who were present there had a right to join the I.N.A. There was no charge against the men of my units of having committed theft of seven cows belonging to civilians, and of having slaughtered and eaten them. I deny that. That charge is a lie and that the cows were eaten is

also a lie. I am shown my additional statement. In the summary of evidence I admit that I said in the summary of evidence that Major Aziz Ahmed told us that we were to go to the concentration camp because we had killed a cow".

That was at the time they were sent. Remember what was the contemporaneous statement made. I want you to remember that. The Court would have no doubt that was the real cause of the dispute, and that joining the I.N.A. or not joining the I.N.A. was not the cause.

"No skins or bones were found, and no investigation was made. I never volunteered for the I.N.A. The Bidadari camp was a mixed camp of volunteers and non-volunteers in July 1942. Neeson Camp was also a mixed camp. There was no difference in rations for the volunteers and non-volunteers. In July 1942 there was no separate treatment for volunteers in the Bidadari Camp. I was carrying on anti I.N.A. propoganda. There was no charge against me of killing or stealing a cow when I was removed from the Bidadari Camp to the Concentration Camp. Aziz Ahmed never told us that we were being sent to the Concentration Camp because we killed a cow. I am again shown my statement in the summary of evidence. I signed my statement. It was read over to me. I made this statement about Major Aziz Ahmed having told us that we were all to go to the Concentration Camp because we had killed a cow."

In other words, at the time when he was taken it was proved from his own mouth that he was definitely told that the reason for his being sent was the killing of the cow.

"On the day I went to the Concentration Camp there were approximately 60 or 70 men there. I said that after two or three days men of my unit were sent away from the Concentration Camp. I and 11 other men were kept there. After our people went away, there were approximately 60 or 70 people left. They were all non-volunteers. I am talking of the month of July 1942".

Then comes the most tell-tale thing which any man of commonsense will understand.

"I was released from the Concentration Camp after 21 days because I had become very weak."

The whole point is this. Any man reading between the lines will be able to see that these people were taken to the Concentration Camp because they were charged with having stolen and killed a cow. He himself admits that it was a charge made at the time. Major Aziz Ahmed said 'you have to go to the camp, because this is the charge against you'. After investigation, he was released after 21 days. Is that the real story, or what he now says is the real story? It does not show that they were oppressed or coerced to join the I.N.A.

There is one ordinary canon of reasoning and commonsense. Is the Court to accept the story he said at that-time or is it to accept the story told now? I submit that at that time nobody imagined that anybody was going to make anything out of this incident for the trial against some people in future. The question is, which of the two stories is likely to be true, and I respectfully submit to the Court that there can be only one conclusion. The story he told then is the true story, and not the story he tells now. That is my submission with respect to this witness.

The next witness I take is Ahmed Nawaz. P. W. 10. Every man has to undergo some sort of punishment for an offence. This witness is taking the story as it occurred, and adding to it so as to make out that what was done to him was a punishment to induce him to join the I.N.A. The only grievance of this gentleman is that he was asked to carry cowdung. It was not after all such a serious punishment as he tried to make out. When I asked him whether he was asked to mix cow-dung with soda-ash, he said that in his part of the country they did not do so. The time has not yet come in this country for the use of every kind of mineral manure, of any other kind of manure except cowdung. I asked him whether it was not intended to be used for the purpose of manuring the garden, and it took a very long time before we could get anything at all from this witness. The demeanour of this witness and his behaviour to the court stand condemned.

I am now reading part of the cross-examination.

I do not know what the cowdung was taken for, I only know we were made to take it as a punishment. We stacked the cowdung near a road in the camp and on both sides of the road was the garden. We were never told to powder the cowdung for manure. It is correct that I said that we mixed ash with the cowdung but I do not know for what purpose it was used. I only did it as a punishment.

To this man everything is a punishment. When this gentleman was asked to mix some soda-ash with cowdung for manure, he thinks it is by way of punishment. He is indignant when he is asked to do something and thinks he was asked to do it as a punishment. he says:

"As a farmer, in our own home, we only use cow-dung as manure and we do not mix ash with it. Only for three hours on the first day I did this work of carrying cow-dung and stacking it near the garden. It was stacked at a distance of about 10 or 12 yards from the garden. For the remaining five days we were digging and levelling earth and preparing garden plots."

When you come to analyse the facts, the indignity this witness was subjectd to comes to nothing. He was asked to do the ordinary work of preparing garden beds for the vegetable garden and mixing some manure.

So far as the manuring is concerned, it only lasted three hours of his life time. If this is what is called an atrocity, I submit to the Court, it is ridiculous type of atrocity. A man is asked to make beds in a garden and prepare some manure, and he imagines it to be a punishment. He may think so, but it is for the Court to say whether it is so. Does the Court believe that it was an ordinary piece of work or it was an oppression, coercive methods, and I do not know what other language is used to prepare manure? I submit with great respect it is a ridiculous kind of evidence which is put forward as an item of torture, and for what purpose? –for the purpose of making this gentleman join the I.N.A. Does this stand to reason and commonsense? I submit with great respect that, in spite of the picturesque language used, the Court will not accept the version of the witness. It is a ridiculous thing. He was asked to do ordinary fatigue. This is legitimate work which ought to have been done willingly and it is ridiculous to suggest that this was a kind of torture used to induce or coerce the witness to join the I.N.A. That, is the evidence of Ahmad Nawaz.

Then, take the next witness, Havildar Mohammed Sarwar. He said: "Everybody refused to join the I.N.A. The Jamadar and Subedar were armed with pistols and they took them out and started firing on us, and ordered the guard also to fire on us. The guard consisted of approximately 14 men. They started firing. Two of us were killed. Everybody said Allah-o-Akbar:" Now, I will read from the cross-examination of this gentleman. He said: "I was for three weeks in No. 4 hospital. It was a very big hospital. There were patients of all kinds there. I was taken to the hospital. I do not know who took me, because I was unconscious. There was an officer to whom I said that I was willing to join the I.N.A. The only force that made me join the I.N.A. was that I wanted to escape this bad treatiment and bad food. When I joined the I.N.A. I came to know that they were trying to free India." And this is the gentleman who says that there was a regular firing in order to make him join the I.N.A. He goes on: "I knew I was expected to go and fight. I know it was a question of life and death. I thought that death was better than these troubles. I had no faith that they would set India free. I had every faith that if I went to the front, I might be able to get to the other side, because we had so many hardships otherwise. At the place where we were first, there were numerous other people besides the 300. I do not know the Camp Commander's name. The Unit Commander was Lt. Purshotam Dass. That was the Japanese Prisoners of War Camp. We were split up into parties for the purpose of fatigues. On the day prior to the firing accident, we were not divided into parties of 323 for fatigue purposes. We were not asked to form a party of 323 men. We were not given an order, I do not know anything about being asked to surrender our leaders. I never heard of it.

It is not true that Lt. Purshotam Dass advised us not to resist. In the party which came to the Camp there was one Mohammedan Jamadar. He was second-in-command of the guard. There was a scuffle between the men of my unit and the guard after the firing had taken place. Only one man of the guard was killed. The guard consisted of about 300. The name of the guard who was killed was Sardar Singh we belonged to the Kapurthala Regiment." That will show who attacked first. I leave it to you Genglemen, to judge who was the attacker and who was the attacked. And remember this that they were in a party of a few hundred, whereas the guard consisted, as he puts it, of 300 men. "Because we refused to join the I.N.A., they started firing." That is the picture which we are asked to accept. I submit with very great respect that the story is a most incredible story. There was no conversation and they at once started firing.

Now, Sirs, that is the story which is presented to you for acceptance, and I ask the court not to accept it because it is a ridiculous story. What is the idea of firing at the men whom they ask to join the I.N.A. ? What do you gain by it? You gain this kind of soldiers with a view to fight? My submission to the Court is that there was this scuffle which he reluctantly admits, and evidently they were first attackers. But they have employed a little story by means of which they say that there was firing on them. If the Counsel thinks that he can walk away with this story, I submit he is mistaken. But when you came to torture, I ask, is it supposed to be torture? It was an ordinary fatigue duty. In this connection, I would like to call the attention of the Court to the Geneva Conventions, Articles 27 to 34 with reference to the work of the prisoners of war on page 298. I am talking of 1929. "They should be kept according to their rank and if they are physically fit they may be employed by private individuals, but the captors must assume entire responsibility for their maintenance."

Prosecution Counsel: I am afraid I must interrupt. The evidence is not as my learned friend reads it. The evidence is not that the guard was killed first.

Mr. Desai: What he said was: "The name of the guard who was killed was Sardara Singh. There was no other member of the guard who died before Sardara Singh was killed." I have not the least doubt about it.

The point that I submit to the Court is this. The witnesses fall into three types of classes. The first category belongs to the cow-killing incident. The second that the incident was with reference to refusal to do fatigues. The third relates to the incident of refusing to form parties for fatigues as required by the Japanese, whose prisoners they were. As a result of these three incidents certain accidents occurred. I submit to the Court that the Government had definitely failed to prove any for the purpose of joining the I.N.A. Each of these accidents is attributable-in-

two cases almost-to an admitted fact. In one case it is due to the form which the attack took. With reference to the other witnesses, the less said the better. All that they have said was that they were asked to do certain duties which they thought was an indignity, which they were asked to do, which I submit, is ordinary decent labour. I know many men of higher rank who do gardening as a matter of honourable occupation, and as a change of occupation from ordinary work. What these gentlemen were really asked to do was gardening and they seriously come here and say what an indignity it was to ask a soldier to do gardening. And that is why he refused to join the I.N.A. The counsel has entirely failed to prove what he set out to prove and I feel the Court should hold if it were necessary-according to my submission it is not necessary at all-that it has not been proved, apart from what is read or stated or alleged, beyond any reasonable doubt that any torture was inficted in order to join the I.N.A. That, Sir, is my submission on that count.

That is all that I wish to say about the evidence on the subject of atrocities alleged to have been committed on these men to join the I.N.A. With reference to the point that I mentioned in the morning as regards cases which might possibly be relied on I will give you a list of the three cases which may be relied upon and give you my remarks on them. Before that I wish to make a submission. I will make a request at a later stage but I wish to mention to the Court in so far as any new authority is cited by my learned friend I do not want a general right of reply but I will ask the Court in the end that on any new law that may be cited I may be allowed to give a reply-because I could have no opportunity even by anticipation of doing it. I will make that request more formally towards the end The three cases which may be relied upon are Regina vs. Lynch (1903) : King's Bench Regina vs. Jaegrae (1907) Appeal Court p. 236 and Regina vs. Casement (1917) : King's Bench. I do not wish to address you as if you were a high court, and therefore what I will do is this. There are two points which distinguish these which I will briefly state. They are cases of an individual being charged under the English law for an act of treason; they were not cases of men who were members of an organized army and of an organized Government. The second distinguishing ground is that in these cases there was no question of what I have submitted shortly as double allegiance. Therefore my submission will be that if these cases are relied upon this is the answer that I have got with reference to them. I will now go on with the regular trend of my argument.

The next point which I have to deal with before the Court is the evidence relating to the charges of murder, but I will take all together without attempting to distinguish them. But I distinguish them under two heads : one is with reference to the four persons alleged to have been

shot on one occasion and Mohammed Husain, the person shot on the second occasion. I will first briefly state the case as I desire to present to the Court, and then deal with the evidence. It is a matter in which with due submission I probably will call attention in some greater detail to the evidence of three or four witnesses. As to the others, I will only make a submission as to what they said.

The position with reference to that is this. As regards the four persons there is a crime report and therefore up to the point of punishment there is evidence before the Court. As regards Mohammed Husain there is no crime report. In fact as regards Mohammed Husain there is no document whatever relating either to the sentence being passed or the sentence being carried out. Further, there is not even a casualty record in either case that I find on the record. As to Mohammed Husain the only answer given by one of the witnesses as to why a casualty report was not made was that they were moving from Popa that day, and then when I further cross-examined him-which you will find in the cross-examination when I come to it-has given no adequate explanation for the absence of the casualty report. There is this further evidence–I am only anticipating it-that in the case of Mohammed Husain there are three persons who are alleged to have shot-Jagiri Ram and two others, whom Jagiri Ram himself did not know. I do not wish to enter into details at this moment except when I read it, but I wish to point out the salient features. It is said in the evidence that Mohammed Huiian had three shots on his heart or near threabout. It is further said in the evidence-he said this-that there was a tear in the shirt, and further in answer to the Court which is a most material point, he said there was no blood of any kind or sort. That is the state of evidence with reference to Mohammed Husain.

And now I will deal with the two sets of cases. There is one other ruling which I should have mentioned and that is there is in evidence before the Court that Lt. Dhilon who is said to have signed and watched the sentence carried out was in a state of complete collapse of health and on that the document before the Court is Exhibit VVV. And the date of documents is 6th March 1945, the date on which it is alleged this execution was carried out. I am reading this relevant part of that document which is at the bottom.

"Jai-Hind — I think most of your queries have been answered in the order. Others I will answer when I come tomorrow. I ought to have come today but last night I went to check certain defences and on my arrival back I felt very weak, so weak that I have never felt before throughout my life. Major Shankar gave me an injection today though for a complete course I must get 12 here when there are none available. I will get one tomorrow."

My case is that so far as the carrying out the sentence on the four persons is concerned, though in fact the order was passed, it was never carried out. Not only that, but I will be able to point out from the evidence on record that there are many other similar instances, sworn to and admitted by the witnesses for the Prosecution. That is in outline why I submit that the case in so far as the execution of the sentence is concerned, is not proved. I may go a little further and state to the Court that there is no presumption that because sentences were passed they were therefore carried out. The charge of murder has got to be proved by proving completely what is called the corpus delicti of that particular person. And I will say that if there is a reasonable doubt in your mind that the Prosecution has failed to prove the actual execution of the sentence, my clients are entitled to the benefit of that doubt.

That is the position with reference to the executions. There are four witnesses with reference to Mohammed Husain. As regards the first witness Havildar Ghulam Mohammed the evidence need not be read to the Court because all that he says is that he was brought up before Capt. Shah Nawaz, which in fact is not denied. There is this in Ghulam Mohammed's evidence :

"I know Havildar Ganga Saran. The First Battalion Commander reported that he (Ganga Saran) had refused to obey his orders. He was a sub-officer in the I.N.A. He was produced before Col. Sahgal for this offence and was tried and sentenced to death. He was afterwards pardoned and released." Havildar Ganga Saran himself in his cross-examination has admitted that as a fact.

The next witness is Sepoy Allah Ditta (P.W. 24) He deals with the earlier part of the story, namely, his intention to desert. This is what he says.

"Mohammed Husain said: I had a few difficulties and therefore I intended to desert". But no inquiries were made into his complaints. Mohammed Husain was told by Col. Shah Nawaz: "You are sentenced to death by shooting because you intended to desert yourself and were persuading others to do the same. Therefore you are not pardoned". I heard Col Shah Nawaz say: 'Put up the case to the Regimental Commander'. (Note by Court: Witness used the words in English). Then we all three of us were sent out. I recognise Col. Shah Nawaz Khan as an acused before the Court. We waited there for ten minutes and were brought back to Brigade Headquarters. Mohammed Husain, Jagiri Ram and myself came together back to Brigade Headquarters. Mohammed Husain and myself were put back in the same cell in which we were before and Khazin Shah took away Jagiri Ram. The same day at about 5 p.m. Sardar Mohammed, Adjutant to our Battalion and Aya Singh took away Mohammed Husain. I have never seen Mohammed Husain since then."

Then, Sir, in cross-examination he said:

"No decision was arrived at either in my case or in the case of Jagiri Ram."

The Court will remember that there were three people and it is common ground that as regards two the sentence was not carried out.

It is true that all that Col. Shah Nawaz Khan said was: 'You deserve to be shot.' Col. Shah Nawaz Khan said that rebels like you will be sentenced to death by shooting. Col. Shah Nawaz Khan told Mohammed Husain: 'You yourself wanted to escape; secondly, you have tried to persuade others to escape; therefore, you are a rebel to the I.N.A. and sentenced to death by shooting.' 'I saw Col. Shah Nawaz Khan write something on the crime report. How could I read the crime report without picking it up from the table. I do not understand English.'

I come to the part of the story which in itself has not the same importance as what it indicates, showing that the witness was a completely factual witness. The man does not know English and yet he says "he was writing a crime report", and the object of the cross-examination is to show that he told a set story which he himself could not have possibly seen or done, and that is the kind of witness he is. That is the object of that part of the cross-examination.

"I saw Col. Shah Nawaz Khan write something on the crime report".

The man says he does not know what is crime, but he was told what is a crime report. Yet he is asked to tell a set story that there was a crime report which Col. Shah Nawaz Khan was actually writing, because he was called upon to prove that it was a crime report that sentence was written on it.

"I saw Col. Shah Nawaz Khan write something on the crime report How could I read the crime report without picking it up from the table? I do not understand English. I do not know what he wrote and where, because I do not know English and I was not reading the crime report at that time".

And the only re-examination is :

"The crime reports were lying on the table and Col. Shah Nawaz Khan read them out as he spoke to us individually. He wrote on the crime report which had already been drawn up."

That is his part of the story. Then we come to the actual evidence of persons by whom sentence is said to be carried out, –Jagiri Ram. You have seen him in the witness box. He is in the Nursing Department. He admitted to the Court that he had never handled a gun in his life, or a rifle, or any shooting instrument. But in order to give the colour of truth Jagiri Ram is made to say this: "I was unwilling, I do not know how to shoot; I have never handled a shooting instrument, but a gun was put on

my shoulder. . ." I ask you, Sirs, to give me the benefit of any description on his part rather than attempt to construct the story for him as if he did so. Then he put the gun here and the trigger was pulled and it seems that this untutored rifleman was extraordinarily accurate, that along with the others all the three shots lodged in the chest of the deceased. Sirs, it will be for you to judge the story. I am going to read out only that part of it which is material :

"I knew Mohammed Hussain and Allah Ditta. Mohammed Hussain, myself and a Garhwali talked about escape when we were in Popa Hill area. While we were talking of escape, Khazin Shah sent an orderly and ordered us to report to Battalion Headquarters.

Mohammed Hussain said that he had mentioned to Jagiri Ram and Alla Ditta jokingly about an escape. Khazin Shah questioned me and asked if they mentioned this jokingly. I replied that I had no proof of his intention to escape, but he mentioned it jokingly to me. Mohd. Hussain and myself were tied to a tree near the Battalion Headquarters, while Khazin Shah was questioning us. Khazin Shah questioned me as to who was trying to escape and I said that I did not know the name of any one who was trying to escape. Then Mohd. Hussain was questioned. He also said that he did not know anything. After sunset Khazin Shah took Mohd. Hussain and myself to Brigade Headquarters. When I was taken to Brigade Headquarters Mohd. Hussain, Khazin Shah and one sentry was with me. Brigade Headquarters were near a nullah. On arrival at Brigade Headquarters, Khazin Shah went to a telephone and after that Allah Ditta also arrived at the nullah. After that all three of us, Mohd. Hussain, Allah Ditta and myself, were put in the Quarter Guard and our hands were tied. On the following day, we were brought before Col. Sahgal. Col. Sahgal questioned me as to whether I intended to escape. I said "no". I did not intend to escape. During this conversation with Col. Sahgal, other people present were Major Negi and Khazin Shah. Col. Sahgal, asked me if I had reported to any one after Mohd. Hussain had mentioned to me about escape. I said I did not know anything about Mohd. Hussain, and I did not reply to any N.C.O. I worked with my Medical Officer. Then we came out of the room and went back to the Quarter Guard. Then Lt. Aya Singh of Brigade Headquarters gave each one of us a beating and said that he would release us if we would tell him the names of the people who intended to escape. I contined to say that I did not know. Next day we were taken to Divisional Commander, Shah Nawaz Khan. We were accompanied by Major Negi, Khazin Shah and a sentry. All three of us, myself (Jagiri ram), Allah Ditta and Mohd. Hussain were lined up before the Divisional Commander. The Divisional Commander asked me to speak the truth whether I intend to escape. I said "no". I did not intend

to escape. Capt. Shah Nawaz Khan asked us why we did not report the matter. I said that I did not know anything about it, and I did not intend to escape. He asked if there was any officer or N.C.O. near me. I said no, I was working with my medical officer. Then Captain Shah Nawaz Khan asked Allah Ditta: "When Mohammed Hussain had talked to you about escaping, did you report to any one?" Allah Ditta said: 'I do not know anything about Mohd. Hussain's escape; I thought it was a joke, I do not know anything about it". Capt. Shah Nawaz Khan then said to Allah Ditta; "You are an N.C.O. Why did you not report?" Allah Ditta begged his pardon and said that he did not know anything about Mohd. Hussain. Then Capt. Saha Nawaz Khan questioned Mohd. Hussain and Mohd. Hussain replied that he was in difficulties and that he intended to escape and asked to be forgiven. Capt. Shah Nawaz Khan then told him, "you are not for our country. You are our enemy. I will give you death by shooting." Then Mohd. Hussain asked for forgiveness and said that he was prepared to go anywhere he was ordered. Capt. Shah Nawaz said nothing to this.

The whole importance of the question is, whether in fact any sentence was actually pronounced. But whether or not it was pronounced, the ultimate issue is, whether it was carried out. Like the case of the other two co-accused-Jagiri Ram and the other man-he said that nothing was decided, and "all three of us were then sent out, and taken to Brigade Headquarters accompanied by Major Negi and Khazin Shah."

I need not read the rest of it.

Then comes the next material part of the story ;

"I moved towards the Battalion with Khazin Shah and Sub-Officer Barfi Singh. When I reached Battalion Headquarters, Khazin Shah told Barfi Singh to take me to Company Headquarters. In the evening an orderly took me to Battalion Headquarters. Mohd. Hussain was there. Khazin Shah and Aya Singh were also there when I arrived".

The most important point is-and which appears from the evidence of witness-that both Khazin Shah and Aya Singh are alive, and they are the only real proper witnesses to that particular transaction Neither of them has been produced. The story continues:

"Khazin Shah told me, 'You will shoot Mohd. Hussain, because you are one of the men who were trying to escape with him. I declined and said I will not shoot him."

I have understood psychological problems but this particular one is curious, namely, that a man who does not know how to shoot and cannot shoot, is made to shoot just as a sort of punishment, which I do not understand, and which I trust you will not be able to understand even if you set a problem to yourself.

Khazin Shah told me: 'You will shoot Mohammed Hussain, because you are one of the men who were trying to escape with him.' I declined and said I will not shoot him and that I did not know how to fire a rifle. Khazin Shah told me again. "If you do not shoot Mohammed Hussain, you will be shot yourself. I still refused and he drew his pistol."

I can only express my inability to understand this particular psychology except a very foolish invention.

"I refused again and Aya Singh got hold of a rifle. He put the rifle to my shoulder and put my finger round the trigger. Khazin Shah told Aya Singh to give the order to fire. There were three of us, one Singh, one Tamil and myself. Mohd. Hussain, was blindfolded by Aya Singh. He was made to sit on the ground with his back against a tree stump and his hands were tied behind his back. Aya Singh ordered me to fire and all three fired. Mohammed Hussain died there.

Khazin Singh ordered Aya to give the order to fire and Aya Singh gave it. Khazin Shah told me to report to my company and not to come to the Battalion Headquarters. That evening we marched off to Legyi. Then we stayed at Legyi two or three days. Then I went over to the British".

The cross-examination is further continued :

"After I had made the statement it was read over to me and I was asked whether it was the correct version of my statement and I said: 'Yes', it was. I was again shown my statement day before yesterday and I was asked if the contents were correct and I said: "Yes'. It was translated to me in Hindustani and read over to me, and I also repeated my statement once again and they both tallied. I have had no training in the use of weapons. I joined the army, I worked as a servant and a labourer. On joining hospital, I was trained in the work of bandaging patients and making their beds. I had nothing to do with the fighting part of the army. Except when the patients were sent to the hospital I had nothing to do with the men of the fighting units."

The point which I wish to make is that not one of the persons is able to identify any of them by even the remotest possible description, and you cannot prove the death of "A" by saying that I saw somebody shoot someone whom I cannot identify. Continuing he said :

"Mohd. Hussain and the Garhwali I have referred to were members of the fighting units. At the time of the conversation they were not sick. I did not know them. before but when they came to my company I was in company headquarters. When this conversation took place I was in Popa-Camp. I had never been to Burma before. Before joining the I.N.A. we were given very hard fatigues by the Japanese in connection with the leading of coal at the ports day and night. I do not know the name of the Garhwali to whom I have referred."

The test is whether the other alleged conspirators were known to him.

"I know he was a Garhwali because he lived with us and he spoke Garhwali. I had never talked either to the Garhwali or to Mohammad Hussain before the day Mohd. Hussain joined company headquarters. I had never spoken to the Garhwali before that day in the nullah; and from that day's conversation I say that he was a Garhwali. I do not know any language or dialect beyond the dialect which I speak.

"I came to know Mohammed Hussain in company. He used to live with me at headquarters. He used to sit in my company. I know he was a Mohammedan. I do not know anything more about him. He used to speak in Punjabi with me. He used to live with me, surely I know him. I cannot give a long description of him except his physical description. I do not know anything else about him. It was by chance that Mohd. Hussain and I got together and the Garhwali arrived in the meantime.

"When I was arrested I said that I intended to run away because I would have been also shot otherwise. I know Lt. Aya Singh because he was in my company. I know he is alive. I saw him in Jigargarcha and Chittagong. The last time I saw him was Chittagong where he arrived two three days after my arrival there in about May last.

"I saw Capt. Shah Nawaz Khan at Divisional Headquarters. There were other orderlies and sepoys there. I do not remember having seen any officers other than Capt. Shah Nawaz Khan. I do not know the English word 'crime' I know the word "report" in the sense of making a report to somebody. I do not understand the words "crime report" which are written on a piece of paper now shown to me. There was no need for anybody to teach me the meaning of crime report when I was about to be produced."

I put it to him to ascertain if he understands the explanation. There cannot be any other explanation except tutoring.

"I was told that a crime report would be put up against me and that we three men would be brought before Capt. Shah Nawaz Khan. No announcement was made before me in respect of anybody except Mohd. Hussain being ordered to be shot. Capt. Shah Nawaz Khan did not say anything about myself and Alla Ditta. Alla Ditta was not present with us when we conferred in the nullah.

"Mohd. Hussain admitted that he had intended to run away, that he wanted to run away because he was in trouble; and asked to be forgiven and said that he was prepared to go anywhere that he was ordered to. After that Capt. Shah Nawaz Khan said that he (Mohd. Hussain) was not for his country; that he was an enemy, and that he would give him death by shooting. We were then marched out. I am quite clear that nothing else happened.

"I was given a rifle at the time of the shooting of Mohd. Hussain. I do not know any weapons other than a rifle. The rifle was put on my shoulder in the aiming position by Aya Singh. I do not know the names of the Tamil and the Sikh who were present at the shooting of Mohd. Hussain, but they were both present on the scene when I arrived. I do not know anything else about them or what they did. I do not know their names but I have seen them in Battalion Headquarters. I cannot say anything more about them than what I have said. I was not in myself then. The rifle was put into position and I was told to hold it. I held it with the help of Aya Singh. The rifle was pointed to Mohd. Hussain. He was sitting on the ground about five yards away. I pressed the trigger when one, two, three was said. Three shots were fired but I do not know which shot shot him down. I did not go to Mohd. Hussain's body to see how many shots had penetrated it. I did not go near Mohd. Hussain's body after the firing. The last time I saw it, it was lying there".

This is the account given by Jagiri Ram and the most important points are these : First, that he did not know his fellow shooters and he cannot identify them, he admits that Khazin Shah and Aya Singh are both alive. The third thing that he says is that I do not know Mohammed Hussain and there is no intelligible ground given why a man who did not know how to shoot was made to go through this process and it is for the Court to give some explanation. I can only submit that I can find none, and under these circumstances, I ask you to say that this witness's evidence is evidence which falls short of proof of the death of a particular individual otherwise not described, and in the absence of two persons who have not been produced before this court.

Then, Sir, there is one more witness on this point, and that is witness Naik Sardar Mohammed. I will read the evidence which relates to this matter.

"I know Mohammed Hussain. On the 27th March, Lt. Khazin Shah sent for the runners. On arrival of the runners he ordered them to bring the following men to the Battalion Headquarters: Sepoy Mohammed Hussain, Lance Naik Mohammed Shafi, Sepoy Jagiri Ram and Sepoy Gobbru Singh. . .Khazin Shah told me that these men intended to run away. He further told me that he was going to Brigade Headquarters that evening to talk about these men, and he went away. . . I met Lt. Khazin Shah on the way and I handed over these men to his charge. He let off Lance Naik Mohammed Shafi on the spot, because his platoon commander had recommended him, and I came back. He said that Mohammed Hussain had been sentenced to be shot".

I submit with due respect that it is not good evidence.